সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

এখনও ষড়যন্ত্র

প্রমাণ কই

কাজী আনোয়ার হোসেন

দুটি বই একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেনের
মাসুদ রানা
[দুটি বই একত্রে]

এখনও ষড়যন্ত্র

বাংলাদেশ আজ স্বাধীন। তবু কেন এখানে সেখানে
খুন হচ্ছে অসংখ্য বাঙালী আজও?
তবে কি এখনও তৎপর রয়েছে সেই কুখ্যাত
আল-বদর, আল-শামস ও রাজাকারের দল?
এখনও চলছে ষড়যন্ত্র?

প্রমাণ কই?

সিনেমা দেখতে যাচ্ছিল সোহানাকে নিয়ে, সাহায্য চাইল যুদ্ধক্ষেত্রে পরিচিত এক সহচর। বিপদের কথা চিন্তা না করেই কথা দিয়ে দিল রানা, সাহায্য করবে। সহকারী সোহানা।

তারপরই শুরু হয়ে গেল ভয়ঙ্কর সব ঘটনা। বন্ধু বেশে ঘুরছে শত্রু আশেপাশেই। চেনা যায় না তাদের। কখন বসাবে বিষাক্ত ছোবল বোঝার উপায় নেই।

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা - ২৫, ২৬

এখনোও ষড়যন্ত্র + প্রমান কই ?

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

BanglaPDF.net (বাংলাপিডিএফ.নেট)
facebook.com/groups/Banglapdf.net

বইয়ের পোকা ♦ (The INSECT of books)
facebook.com/groups/we.are.bookworms

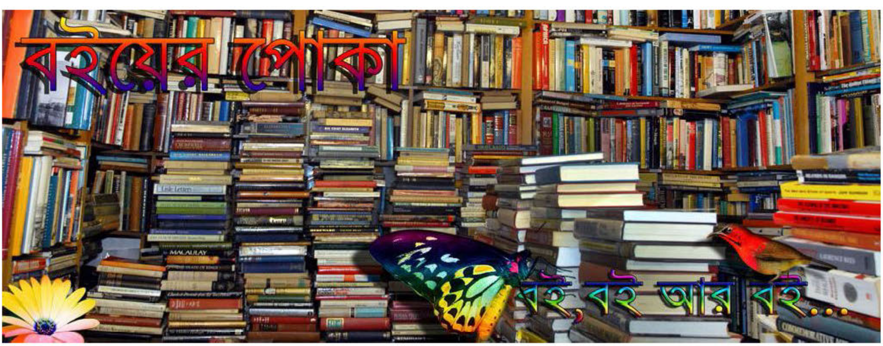

মাসুদ রানা

এখনও ষড়যন্ত্র

প্রমাণ কই?

(দুটি বই একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

সাতাশ টাকা

ISBN 984-16-7607-9

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৭২
পঞ্চম প্রকাশ: ১৯৯৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
EKHONO SHADAJANTRO

PROMAN KOI
Two Thriller Novels
By: Qazi Anwar Husain

এখনও ষড়যন্ত্র ৫—৮১
প্রমাণ কই? : ৮২—১৪৪

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় *ভারতনাট্যম *স্বর্ণমৃগ *দুঃসাহসিক *মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা দুর্গম দুর্গ *শত্রু ভয়ঙ্কর *সাগরসঙ্গম *রানা! সাবধান!! *বিস্মরণ *রত্নদ্বীপ নীল আতঙ্ক*কায়রো *মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র *মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র রাত্রি অন্ধকার *জাল *অটল সিংহাসন *মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক শয়তানের দূত* এখনও ষড়যন্ত্র *প্রমাণ কই? *বিপদজনক *রক্তের রঙ অদৃশ্য শত্রু *পিশাচ দ্বীপ *বিদেশী গুপ্তচর *ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা তিন শত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত *সতর্ক শয়তান *নীলছবি *প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক *এসপিওনাজ *লাল পাহাড় *হৃৎকম্পন *প্রতিহিংসা হংকং সম্রাট *কুউউ!*বিদায় রানা *প্রতিদ্বন্দ্বী *আক্রমণ *গ্রাস *স্বর্ণতরী *পপি জিপসী *আমিই রানা *সেই উ সেন *হ্যালো, সোহানা *হাইজ্যাক আই লাভ ইউ, ম্যান *সাগর কন্যা *পালাবে কোথায় *টার্গেট নাইন বিষ নিঃশ্বাস *প্রেতাত্মা *বন্দী গগল *জিম্মি *তুষার যাত্রা *স্বর্ণ সংকট সন্ন্যাসিনী *পাশের কামরা *নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য *উদ্ধার *হামলা প্রতিশোধ *মেজর রাহাত *লেনিনগ্রাদ *অ্যামবুশ *আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর *নকল রানা *রিপোর্টার *মরুযাত্রা *বন্ধু *সংকেত *স্পর্ধা চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ *চারিদিকে শত্রু *অগ্নিপুরুষ *অন্ধকারে চিতা *মরণ কামড় মরণ খেলা *অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন *বিপর্যয় *শান্তিদূত *শ্বেত সন্ত্রাস ছদ্মবেশী *কালপ্রিট *মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত *আবার উ সেন বুমেরাং *কে কেন কিভাবে *মুক্ত বিহঙ্গ *কুচক্র *চাই সাম্রাজ্য অনুপ্রবেশ *যাত্রা অশুভ *জুয়াড়ী *কালো টাকা *কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা *আক্রমণ '৮৯ *অশান্ত সাগর শ্বাপদ সংকুল *দংশন *প্রলয় সঙ্কেত *ব্ল্যাক ম্যাজিক *তিক্ত অবকাশ ডাবল এজেন্ট *আমি সোহানা *অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান *গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ *শত্রুবিভীষণ *অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ *কালো ছায়া *নকল বিজ্ঞানী *বড় ক্ষুধা *স্বর্ণদ্বীপ *রক্তপিপাসা অপচ্ছায়া *ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন *সাউদিয়া ১০৩ *কালপুরুষ *নীল বজ্র মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট *অমানিশা *সবাই চলে গেছে * অনন্ত যাত্রা রক্তচোষা *কালো ফাইল *মাফিয়া *হীরকসম্রাট *সাত রাজার ধন শেষ চাল।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

এখনও ষড়যন্ত্র

প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ১৯৭২

এক

রাঙার মার খুশি আর ধরে না। ফিরে এসেছে রানা দশমাস পর। দন্তহীন মিষ্টি হাসিতে ভরিয়ে রেখেছে বুড়ি সারাটা রান্নাঘর। যখন তখন করুণা বর্ষণ হচ্ছে মোখলেসের উপর। অথচ এই গতকালও দাঁত খিঁচুনি, থুড়ি, বুড়ির তো একটা দাঁতও নেই; মাড়ি খিঁচুনি খেতে হয়েছে মোখলেসকে উঠতে বসতে। গত দশমাস রানার খোঁজ খবর নেই, সেটা যেন মোখলেসের দোষ; পাক সেনাদের ভয়ে এ বাড়ি ছেড়ে নয়টা মাস লুকিয়ে থাকতে হয়েছে ওদের, সেটাও যেন মোখলেসের শয়তানি; স্বাধীনতার পর এ বাড়িতে ফিরে এসে একমাস কেটে গেল তাও রানা ফিরছে না, সেটাও নাকি মোখলেসের বদমাশি; রানার জন্যে মীরপুরের মাজারে যে একটু ধর্ণা দেবে, বিহারীদের জ্বালায় যাওয়া যাচ্ছে না সেখানে, এটাও নাকি মোখলেসেরই হারামিপনা। অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল এতদিন বেচারা অবুঝ বুড়ির অত্যাচারে। রানা যে দয়া করে মারা যায়নি, দয়া করে বাড়ি ফিরে এসে বুড়ির হাত থেকে উদ্ধার করেছে ওকে সেজন্যে রানার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছে বারবার মোখলেসের বুক। হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে সে। বুড়ি এখন হামান দিস্তায় ছেঁচা পান মুখে ফেলে রানার জন্যে বত্রিশ ব্যঞ্জন তৈরি করতে ব্যস্ত, হাসি এসে যাচ্ছে খালি খালি, মোখলেসের বাজারটাও নেহায়েত অপছন্দ হয়নি, কিংবা দোষ ত্রুটি মাফ করে দিয়েছে নিজগুণে। মাঝে মাঝেই কাছে ডাকছে বুড়ি আদর করে, এটা ওটা খাওয়াচ্ছে। যেন মানুষটাই বদলে গেছে একেবারে, যেন এ বুড়ি সে বুড়িই নয়। একেবারে দয়ার সাগর। মেজাজ বলতে কিছুই নেই।

অবাক হয়ে ভাবে মোখলেস, কি যেন একটা যাদু আছে সাহেবের মধ্যে। কথা নেই, চুপচাপ মানুষ, কিন্তু আত্মা আছে একটা। সেটার ছোঁয়া পাওয়া যায় মাঝে মাঝে। এই যে রাঙার মা, নিজের বাড়ি আছে, ঘর আছে, ছেলে-বউয়ের সাথে ঝগড়াঝাঁটিও মিটে গেছে সেই কত বছর আগে—কই, যেতে পারল মায়া কাটিয়ে? আর সে নিজে? বারো বছর বয়সে সৎ-মা-খেদানো ছেলে, এসেছিল সে ঢাকায়, এখানে ওখানে ঠোকর খেয়ে ফিরছিল, কেউ ভিক্ষা দেয় না, কেউ কাজও দেয় না, কেউ বিশ্বাসও করে না যে সে চোর নয়—সেদিন সাহেব জায়গা না দিলে মারাই যেত সে না খেয়ে। এই তার প্রথম ও শেষ চাকরি। কি যেন একটা আছে সাহেবের মধ্যে। বিদেশ থেকে কত জিনিস এনে দিয়েছে সাহেব ওদের। কিছু নেই। ন'মাসে

দুই দুইবার লুট করেছে খান সেনারা, যা অবশিষ্ট ছিল, চুরি হয়ে গেছে গত পরশু রাতে। কিন্তু দুঃখ নেই সেজন্যে মোখলেসের। ও জানে, জিনিসটা কিছুই না, সাহেবের স্নেহটাই আসল। বিদেশে গিয়েও যে সাহেব ওর কথা মনে রেখেছে, ওকে খুশি করার জন্যে ওর পছন্দসই জিনিস খুঁজেছে দোকানে দোকানে—সেটাই আসল। অশিক্ষিত হতে পারে, কিন্তু হৃদয় বুঝতে না পারার মত মূর্খ সে নয়।

সত্যি, মস্ত দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল ওর। দশ মাস পর গতকাল সন্ধের সময় সাহেবের দরাজ কণ্ঠের চেনা ডাক শুনে চমকে উঠেছিল সে। লাফিয়ে উঠেছিল আস্ত কলজেটা। এই কণ্ঠস্বর ভুলবার নয়। ভুল হতেই পারে না, তবু ছুটে গিয়ে দরজা খুলে নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত নিজের কানকে বিশ্বাস করতে ভরসা পায়নি ও। কাঁধের ওপর সাহেবের চাপড় খেয়ে ঘোর কেটেছে, ছুটে গিয়ে খবর দিয়েছে রাঙার মাকে।

রাতে খেতে বসে গত দশ মাস ওরা কিভাবে কাটিয়েছে জিজ্ঞেস করেছিল সাহেব রাঙার মাকে। ও বাবা! বুড়ির সে কি প্রশংসা! সে নাকি বুড়িকে মায়ের মত ভক্তি করে মাথায় তুলে রেখেছিল, একটুও কষ্ট করতে দেয়নি এই দশমাস, মোখলেসের মত লক্ষ্মী ছেলেই হয় না। সে যে রাঙার মাকে বাঁচাতে গিয়ে বেদম মার খেয়েছিল আর্মির হাতে, তিনদিন প্রলাপ বকেছিল জ্বরের ঘোরে, ফলাও করে বলেছে সে গল্প। বটবৃক্ষের মত নাকি সে ছায়া দিয়েছে, দায়িত্ব পালন করেছে, অসুখে-বিসুখে পেটের ছেলের চাইতেও বেশি করেছে, আরও কত কি! আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনেছে মোখলেস, বুক ভেসে গেছে চোখের পানিতে, মনে মনে বলেছে, ওরে বুড়ি, তাই তুই সর্বক্ষণ বকেছিস আমাকে এই দশটা মাস।

যাক, সাহেব ফিরে এসেছে, দায়িত্ব নেমেছে মোখলেসের কাঁধ থেকে। রাঙার মাকে সামলানো চাট্টিখানি কথা নয়। বুড়ির মেজাজ সাংঘাতিক। শুধু যখন আদর করে, তখন স্নেহ-কাঙাল মনটা ওর ভরে যায় কানায় কানায়। কেমন যেন কান্না পায় ওর।··· কিন্তু হাসি নেই কেন সাহেবের মুখে? দেশ স্বাধীন হয়েছে, শরীরের কয়েকটা নতুন দাগ দেখে বোঝা যাচ্ছে গত নয়মাস যুদ্ধ করেছে সাহেব, তবে হাসি নেই কেন? কাউকে টেলিফোন করেনি কাল সন্ধে থেকে। কোথাও বেরোয়নি বাড়ি ছেড়ে। এরকম দেখেনি সে আগে কোনদিন। চুপচাপ বসে বসে কাল থেকে কি যেন ভাবছে সাহেব। মাঝে মাঝে খাঁচায় বন্দী বাঘের মত পায়চারি করছে সারা ঘরে একবার এদিক, একবার ওদিক।

'মোখলেস।' হঠাৎ ডাক এল ড্রইংরুম থেকে। মোখলেস গিয়ে পর্দা সরাতেই জিজ্ঞেস করল রানা, 'বাজারে যে গিয়েছিলি, কেউ আমার কথা জানতে চেয়েছিল তোর কাছে?' মাথা নাড়তে দেখে বলল, 'আভাসে বা ইঙ্গিতেও কেউ জিজ্ঞেস করেনি আমি ফিরে এসেছি কিনা?'

'না তো।' একটু ভেবে উত্তর দিল মোখলেস।

'ঠিক আছে, তুই যা।' একটু যেন আশ্বস্ত দেখাল রানাকে। টেলিফোন তুলে নিয়ে কার সাথে যেন কথা বলল কয়েক মিনিট। তারপর হাঁক ছাড়ল, 'মোখলেস।' আবার এসে দাঁড়াল মোখলেস। 'শোন্, আমি একটু বেরোব। তুইও যাবি আমার সাথে। আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি, তুই যা, গাড়িটা বের করে নিয়ে আয় গ্যারেজ থেকে।'

'কোন ভাল জায়গায় যেতে হবে নাকি, স্যার?' খানিক ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল মোখলেস কাঁচুমাচু হয়ে।

'কেনরে?'

'মানে জামা-টামা নেই কিনা। চুরি হয়ে গেছে। একমাত্র আপনার সুটকেসটাই বাঁচাতে পেরেছি। এই লুঙ্গি আর গেঞ্জিটা ছাড়া কিছুই নেই আমার।'

'ও।'

নিজের এক সেট শার্ট প্যান্ট আর একজোড়া জুতো দিয়ে দিয়েছে রানা মোখলেসকে। চাবির রিঙটা আঙুলের মাথায় ঘোরাতে ঘোরাতে চলল মোখলেস গ্যারেজের দিকে। জামা-কাপড় প্রায় ঠিকই হয়েছে ওর গায়ে, জুতোটা একটু আঁটা হয়েছে। অবশ্য বেশি না, সামান্য আঁটা। আয়নায় দেখেছে ও নিজেকে—বেশ মানিয়েছে কিন্তু! গুন গুন করে গান ধরল মোখলেস, জয় বাংলা বাংলার জয়।

কুয়াশা পড়েছে আজ। রাতে দারুণ শীত পড়েছিল। শীত শীত লাগছে বেলা নয়টাতেও। সজনে ডালে বসে শালিকগুলো কিচির মিচির করছে, কুয়াশা মাখা রোদ পোহাচ্ছে, আলস্য কাটিয়ে উঠে খাবার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েনি এখনও। লনের ঘাসগুলো শিশিরে ভেজা। গুলশানের এই এলাকাটা নির্জন। আশপাশের অনেকগুলো প্লট খালি।

গ্যারেজটা খুলে গর্বের সঙ্গে চেয়ে রইল সে কয়েক সেকেন্ড দুধ সাদা ডাটসান সিক্সটিন হাডরেডের দিকে। সকালে ধুয়ে মুছে মোম-পালিশ করেছে সে নিজ হাতে। চিকচিক করছে নতুন গাড়িটা। ঘর আলো করে বসে আছে যেন সুন্দরী এক রাজকন্যা।

জয় বাংলা বাংলার জয়। বারবার ঘুরে ফিরে চলে আসছে এই গানের সুরটা মনের মধ্যে। ভোলা যাচ্ছে না।

দরজার হ্যান্ডেলটা খুব ঠাণ্ডা। চাবি ঘুরিয়ে টান দিতেই খুলে গেল দরজা। ভিতরটা গরম। নতুন গাড়ির গন্ধ। ড্রাইভিং সীটে উঠে বসে দীর্ঘ একটা শ্বাস টানল মোখলেস। রিয়ারভিউ মিররটা অ্যাড্জাস্ট করে চাবি ঢোকাল ইগ্নিশনে। আবার গুনগুন করে উঠল নিজের অজান্তেই, জয় বাংলা বাংলার জয়। গিয়ারটা নিউট্রাল আছে কিনা দেখে নিয়ে সুইচ অন করল মোখলেস।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হলো। চুরমার হয়ে গেল গাড়িটা। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল মোখলেসের দেহ। বাম পাশের দেয়ালটা ধসে পড়ল গ্যারেজের। চারদিকে ইট-

পাথর ছুটল বুলেটের মত। ঝন ঝন করে ভেঙে গেল রানার বাসার সবকটি জানালার কাঁচ। ভয় পেয়ে সব পাখি উড়ে গেল সজনে ডাল থেকে। দাউ দাউ করে আগুন ধরে গেল সারা গ্যারেজে।

কেঁপে উঠল রানা বিস্ফোরণের ধাক্কায়। দরজাটা ধরে টাল সামলে নিল। ল্যুগারটা বেরিয়ে এসেছে হাতে। পর মুহূর্তে দৌড় দিল সে শব্দের উৎস আঁচ করে নিয়ে। কোমর থেকে শরীরের উপরের অংশটুকু সামনের দিকে বাঁকা করে দৌড়াচ্ছে সে। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছে আরেকটি বিস্ফোরণের। গ্যারেজের কাছে থমকে দাঁড়াল রানা। মোখলেসের অর্ধেকটা শরীর পড়ে আছে মাটিতে জ্বলন্ত একটা চাকার পাশে। বাকি অর্ধেকটা ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে আছে চারদিকে। মশালের মত জ্বলছে অর্ধেক শরীর। পুড়ে গেছে সমস্ত মাথার চুল, বিকৃত হয়ে গেছে মুখের চেহারা, বীভৎস দেখাচ্ছে। চেনার উপায় নেই।

দুই সেকেন্ড। তারপরই আবার ছুটল রানা বাড়ির ভেতর। রান্না ঘরে বটির পাশে পড়ে আছে রাঙার মা। দরদর করে রক্ত পড়ছে কপাল থেকে। মুখের কশায় রক্ত। দশ ইঞ্চি এক ইটের আধখানা ছুটে এসে লেগেছে কপালে। নাড়ী পরীক্ষা করে দেখল রানা। বেঁচে আছে।

ছুটল রানা শোবার ঘরের দিকে। ঝটপট খুলে ফেলল কোট- প্যান্ট-শার্ট-জুতো। মানিব্যাগ আর পিস্তলটা হাতে নিয়ে জাঙ্গিয়া-গেঞ্জি পরা অবস্থায় দৌড়ে গিয়ে ঢুকল মোখলেসের ঘরে। লুঙ্গিটা পড়ে আছে চৌকির উপর। লুঙ্গি পরতে পরতে লক্ষ করল রানা, মোখলেসের সাইকেলে তালা নেই। বাজারের থলেতে পিস্তল ও মানিব্যাগ পুরে নিয়ে সাইকেলে চাপল রানা। সাঁ করে বেরিয়ে গেল সাইকেলটা খোলা গেট দিয়ে। একবার পিছন ফিরে চাইল। কাঁচা রোদ বিছিয়ে রয়েছে বাড়ির সামনের লনে।

রানার বাসা থেকে আধ মাইল দূরে জনশূন্য একটা তেতলা বাড়ির ছাতে দাঁড়িয়ে এইদিকে চেয়ে ছিল দুইজন লোক। একজনের হাতে একটা শক্তিশালী বিনকিউলার। গভীর মনোযোগের সাথে কি যেন দেখছে সে।

'দেখতে পাচ্ছেন, জনাব হরমুজ আলী, একজন সাইকেলে চড়ে পালিয়ে যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে খালি চোখে?'

'জ্বি হুজুর, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। লুঙ্গি পরা লোক। ওই লোকটার নাম মোখলেস, মাসুদ রানার চাকর।'

'হুম্! সবাই তাই মনে করবে। নিজের চোখে না দেখলে আমিও আপনার রিপোর্ট বিশ্বাস করতাম। কিন্তু আমি দুঃখিত, আপনার সাথে একমত হতে পারছি না।... নিন, এটা দিয়ে গওর করে দেখুন।'

আগ্রহের সাথে বিনকিউলারটা চোখে লাগাল হরমুজ আলী। পরমুহূর্তে অস্ফুট

কণ্ঠে বলে উঠল, 'ইয়া আল্লাহ্! এ কী দেখছি! এ-ই তো মাসুদ রানা! পালাচ্ছে!' ফ্যাকাসে হয়ে গেছে হরমুজ আলীর মুখ। ব্যর্থ হয়েছে সে।

দ্রুতপায়ে সিঁড়ি ঘরের দিকে রওনা হচ্ছিল হরমুজ আলী।

তার কাঁধে হাত রাখলেন মাওলানা ইকরামুল্লাহ। 'ব্যস্ততার কিছু নেই জনাব হরমুজ আলী। দ্বিতীয়বারও কামিয়াব হতে পারলেন না আপনি। এর ফলে ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে আমাদের, তবু স্থির করেছি আরও একটা সুযোগ আপনাকে দেব। এবারও যদি বিফল হন, তাহলে আপনাকে অযোগ্যতার জন্যে শাস্তি পেতে হবে।'

'হাজার শুকরিয়া, হুজুর।' ব্যস্ত হয়ে উঠেছে হরমুজ আলী রানাকে অনুসরণ করবার জন্যে।

'মাসুদ রানা লুঙ্গি গেঞ্জি গায়ে সাইকেলে চড়ে পালাচ্ছে কেন বুঝতে পারছেন?' কোন ব্যস্ততা নেই মাওলানার কণ্ঠস্বরে।

'জ্বি হুজুর, পারছি। আমরা যেন মনে করি মাসুদ রানা মারা গেছে, তার চাকরটা ভয়ে পালিয়ে গেছে। মারা গেছে আসলে ওর চাকর। পালিয়ে যাচ্ছে সে নিজে।'

'হুম! দুটো কথা স্মরণ রাখবেন। আমরা যে ধরা পড়িনি বা আত্মসমর্পণ করিনি এবং পূর্ণোদ্যমে তৎপর রয়েছি একথা জানা হয়ে গেল মাসুদ রানার। কাজেই আঘাত হানার জন্যে তৈরি হবে সে এবার, আমাদের খুঁজে সে বের করবেই। আর দ্বিতীয় কথাটা হচ্ছে, আমরা একটু সুবিধাজনক অবস্থায় আছি। ও জানে না যে আমরা জানি যে ও মরেনি। ও মনে করছে ধোঁকা দি তে পেরেছে আমাদের চোখে। ফলে অসতর্ক মুহূর্তে ওকে বাগে পাওয়া আপনার পক্ষে সুবিধা হবে। তবে সাবধান, আপনাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি, ভয়ঙ্কর ধূর্ত লোক এই মাসুদ রানা। ভীষণ হুঁশিয়ার লোক। সাবধানে কাজ করবেন। যান, এতক্ষণে বেশ খানিকটা দূরত্বে চলে গেছে সে, মনে করছে বড় বাঁচা বেঁচে গেছে, এইবার পিছু নিন আপনি।'

আধ মিনিট পর নিচ তলা থেকে একটা ভেস্‌পা জি.এস. স্টার্ট নেয়ার শব্দ এল।

ক্রূর এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল মাওলানার ঠোঁটে।

দুই

রানার টেলিফোন পেয়ে মাথা থেকে মস্ত একটা বোঝা নেমে গেছে সোহেলের।

ফিরে এসেছে রানা। গুলশানের বাসা থেকে ফোন করেছিল একটু আগে।

বলল আসছে। ফেউটাকে খসাতে বলেছিল, ওটাকে ধরে বেঁধে রাখা হয়েছে জিমনাশিয়ামের একটা সেলে। অপেক্ষা করতে করতে অস্থির হয়ে উঠেছে সোহেল। আধঘণ্টার মধ্যে আসছি বলল, অথচ পৌনে একঘণ্টা পার হয়ে গেছে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আশা করছে সোহেল রানাকে। প্রথম কথাটি কি বলবে ভেবে রেখেছে সে; দু'কাপ কফির অর্ডার দিল সে ইন্টারকমে। যে করে হোক গছাতে হবে রানাকে চীফের পোস্টটা।

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ নেই। চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার হিসেবে কাজ চালাচ্ছে সোহেল। ভয়ানক চাপ পড়েছে ওর ওপর। মুক্তিযুদ্ধের পর অপারেটারদের মধ্যে কে কে বেঁচে আছে এখনও নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। স্বাধীনতার পর মাত্র ছয় সাত জন যোগ দিয়েছে কাজে। হপ্তা খানেক আগে সলীল ও জাহেদের খবর পাওয়া গেছে, বেঁচে আছে। রানার ব্যাপারেই সবচেয়ে বেশি সন্দেহ ছিল, টেলিফোন পেয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। নাসের নেই। ওকে নিজ হাতে গুলি করে মেরেছিল রানা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়, সোহেলের সামনেই। বিশ্বাসঘাতক ছিল ব্যাটা, অথচ ঢাকা থেকে পালাবার সময় বাঙালী দরদী সেজে জুটে গিয়েছিল ওদের সাথে। হাতে-নাতে ধরা পড়েছিল ব্যাটা, নইলে ব্যারোটা বেজে যেত ওদের।

মোটেই শান্তিতে নেই সোহেল স্বাধীনতার পর। সবকিছু নতুন করে গড়ে নিতে হচ্ছে। আত্মসমর্পণের ঠিক দু'দিন আগে অফিসের সমস্ত জরুরী কাগজ, মূল্যবান নথি-পত্র-ফাইল আর যন্ত্রপাতি ধ্বংস করে দিয়ে গেছে ওরা। সব গুছিয়ে নিয়ে আবার কাজ শুরু করবার দায়িত্ব পড়েছে সোহেলের উপর। রানার অনুপস্থিতিতেই ওর অনুমতি সাপেক্ষে রানাকে করা হয়েছে বি. সি. আই. চীফ। একটি মাস অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে ধীরে ধীরে হাল ছাড়তে শুরু করেছিল সোহেল। ভাবতে শুরু করেছিল, মারাই গেল নাকি রানা শেষ কালে?

ছাব্বিশে মার্চ সকালে রওনা হয়েছিল ওরা ঢাকা থেকে একসাথে। কিন্তু সীমান্ত অতিক্রম করার পর নয়টা মাসে ওদের ন'বার দেখা হয়েছে কিনা সন্দেহ। ছিট্‌কে গিয়েছিল দু'জন দু'দিকে। যোগাযোগ ছিল, কিন্তু রানাকে শত চেষ্টা করেও অস্ত্র ছাড়িয়ে প্ল্যানিং-এর মধ্যে আনতে পারেনি সে। কেমন যেন অস্বাভাবিক রক্ত পিপাসু হয়ে উঠেছিল মানুষটা।

রানা সম্পর্কে সর্বশেষ খবর পেয়েছিল সোহেল ষোলোই ডিসেম্বর ঢাকায় পৌঁছে। একটা ভয়ঙ্কর খেলায় নেমেছিল রানা। একটা সঙ্ঘবদ্ধ ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে ভিড়ে গিয়েছিল সেই দলে। সাতই ডিসেম্বর ধরা পড়েছিল এবং চোদ্দই ডিসেম্বর পালিয়েছিল সে মীরপুরের একটা ক্যাম্প থেকে দু'জন বন্দীকে সাথে নিয়ে। কিন্তু খবরটা কনফার্ম করা যায়নি। উড়ো খবর। পলাতকদের কেউই আত্মপ্রকাশ করেনি এখন পর্যন্ত। বুঝতে পেরেছে সোহেল, হয় মারা গেছে, নয়তো কিছু একটা ঘোরতর ব্যাপার আছে এই আত্মগোপনের পিছনে। হিতে বিপরীত হতে পারে মনে

করে এতদিন কোন অ্যাকশন নেয়নি সে ফেউগুলোর উপর। অফিস চালু করার পর থেকেই টের পেয়েছিল সোহেল ফেউ লেগেছে পিছনে, সর্বক্ষণ অনুসরণ করা হয় ওকে। কিন্তু যেন টেরই পাচ্ছে না এমনি ভাব দেখিয়েছে এতদিন। ওর বিশ্বাস ব্যাপারটা রানার সাথে জড়িত। তার সত্যতা বোঝা গেল আজ টেলিফোন করে ফেউটাকে আটকাবার নির্দেশ দিল যখন রানা।

ছোট্ট একটু নক্ করে দু'কাপ কফি সাজানো ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল সোহেলের সেক্রেটারি। ঘড়ি দেখল সোহেল। তাই তো! দশটা বাজতে পাঁচ। কিছু ঘটল নাকি? হঠাৎ চমকে উঠল সোহেল। নয়টা দশে একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ পেয়েছিল সে। গুলশানের দিক থেকেই এসেছিল শব্দটা। পাক-আর্মির পুঁতে রাখা কোন মাইন ফাটল হয়তো ভেবেছিল সোহেল। রানার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই তো!

একটা বাতি জ্বলে উঠল ইন্টারকমে। বোতাম টিপে সোহেল বলল, 'ইয়েস?'

'এইমাত্র একটা টেলিফোন পেলাম, স্যার,' রিসেপশনিস্টের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। 'মাসুদ রানা মারা গেছেন। বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে ওঁর গাড়ি।'

'কে টেলিফোন করেছিল?' মুহূর্তে কুঁচকে গেল সোহেলের মুখটা।

'বলতে পারব না স্যার। খবরটা দিয়েই লাইন কেটে দিল।'

'ট্রেস করবার চেষ্টা করোনি?'

'পাবলিক টেলিফোন, স্যার।'

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সোহেল। ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল অফিস থেকে।

গেট দিয়ে বেরিয়েই রাস্তার দু'পাশে চাইল রানা। তিনচারজন লোক হন্তদন্ত হয়ে আসছে এইদিকে। এখনও দু'শো গজ দূরে আছে। উল্টো রাস্তায় ছুটল রানা। মোখলেসের বীভৎস বিকৃত চেহারাটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। রাঙার মার জ্ঞানহীন দেহটা লুটিয়ে পড়ে আছে রান্নাঘরে মেঝেতে, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে। মাথাটা ঝাঁকিয়ে দূর করে দেয়ার চেষ্টা করল রানা ছবিগুলো। এখন ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে হবে চিন্তা ভাবনা করে।

সাইকেলটা খসাতে হবে প্রথম। টেলিফোনে খবরটা জানাতে হবে বি. সি.আই.-কে। তারপর হারিয়ে যেতে হবে ওকে, মিশে যেতে হবে জনসমুদ্রে। আধ ঘণ্টা এদিক ওদিক ঘুরে বুঝতে পারল রানা, হয় কেউ অনুসরণ করছে না, নয়তো এমন নিপুণ ভাবে করছে যে টের পাওয়া যাচ্ছে না। নিশ্চিত হবার উপায় নেই। জি. পি. ও.র দিকে চলল রানা।

জি. পি. ও. পৌঁছে তালা ছাড়া সাইকেলটা স্ট্যান্ডে রেখে চারদিকে চাইল রানা একবার। সিঁড়ির উপর বসে নিরুৎসুক, অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে একজন। ব্যাগটা হাতে নিয়ে পোস্ট অফিসের ভিতর ঢুকল রানা। খানিকক্ষণ টিকেট

কাউন্টারের লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে এল বাইরে। নিরুৎসুক ভদ্রলোক সাইকেলটা নিয়ে ততক্ষণে বড় রাস্তায় উঠে গেছে, সাঁই সাঁই ছুটেছে এবার জিন্না এভিনিউয়ের দিকে। হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যাওয়ার ভান করে আবার ঢুকে পড়ল রানা পোস্ট অফিসে। পাবলিক টেলিফোন থেকে রিং করল বি. সি. আই-এর নাম্বারে। তারপর ধীর পায়ে বেরিয়ে এল জি. পি. ও.-র অন্য একটা গেট দিয়ে।

বায়তুল মোকাররমে কিছু শপিং করে রিকশায় চেপে চলে গেল সে গুলিস্তান সিনেমা হলে। ল্যাভেটরি থেকে যখন বেরোল তখন রানার চেহারা মফঃস্বলের মহাজনের মত। জিন্নাহ এভিনিউয়ে কিছুক্ষণ শপিং করে বাসে উঠে চলে গেল সে স্টার সিনেমা হলে। সেখানকার ল্যাভেটরি থেকে বেরিয়ে এল একজন শহুরে টাউট। তারপর নিউমার্কেট, বলাকা, স্টেডিয়াম, জোনাকী, মতিঝিল, মধুমিতা অভিসার ঘুরে যখন হোটেল পূর্বাণীর সামনে এসে ট্যাক্সি থেকে নামল তখন সে ভারতের কোন একটা বিরাট ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির সেল্স্ ডাইরেক্টর। বাজার পরীক্ষা ও মন্ত্রী মহলে লবিং-এর উদ্দেশে সদ্য পৌছেছে ঢাকায়। নাম অমিতাভ ব্যানার্জী। রানার চিহ্ন মাত্রই নেই মিস্টার ব্যানার্জীর চেহারায়।

ছ'তলায় একটা স্যুইট ভাড়া নিল রানা। দুটো সুটকেস পৌছে দিল পোর্টার রানার ঘরে। মোটা বকশিশে পোর্টারকে খুশি করে দিয়ে দরজা বন্ধ করল সে। দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা পর একটু বিশ্রামের সুযোগ পাওয়া গেল। নরম ফোমের সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে হাঁফ ছাড়ল রানা।

ঠিক সেই সময় পূর্বাণী হোটেলের রিসেপশনিস্টের কাছ থেকে আই. বি. আইডেন্টিটি কার্ড দেখিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিল একজন লোক। টেলিফোনে জরুরী সংবাদ দিল কোথাও। বিশ মিনিট অপেক্ষা করল লাউঞ্জে। দু'জন লোক এসে বসল লোকটার দু'পাশে। কিছুক্ষণ একটানা কথা বলল লোকটা। তারপর বেরিয়ে গেল হোটেল থেকে। সঙ্গী দু'জন রয়ে গেল হোটেলেই। একটা ভেসপা জি. এস. চলে গেল পূর্বাণীর সামনে থেকে দ্রুতবেগে।

তিন

মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে সোহেল। গভীর চিন্তায় মগ্ন।

আত্মহত্যা করেছে সোহেলের বেঁধে রাখা লোকটা। সোহেল যখন জিমনাশিয়ামে পৌছেছে তখন শেষ অবস্থা। কোন কথা বের করা যায়নি ওর কাছ থেকে।

রাঙার মাকে হাসপাতালে দিয়ে আসা হয়েছে। একটু আগেও খবর নিয়েছে, জ্ঞান ফেরেনি। ডাক্তারের ধারণা অন্তত তিন দিন অজ্ঞান থাকবে। তারপর জ্ঞান যদিও বা ফেরে স্মৃতি-ভ্রংশের সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ রাঙার মার কাছ থেকে কোন তথ্য পাওয়ার আশা খুবই কম। কিন্তু ঘটনাটার কয়েকটা ব্যাপারে অদ্ভুত অসামঞ্জস্য লক্ষ করছে সোহেল। মোখলেস কোথায় গেল? দুর্ঘটনার সময় সে বাড়িতে ছিল, বিস্ফোরণের পর সাইকেল নিয়ে পালিয়ে যেতে দেখেছে ওকে আশেপাশের বাড়ির কয়েকজন বাসিন্দা। সাইকেলটা উদ্ধার করা হয়েছে দুপুর আড়াইটায় একজন জেনুইন সাইকেল চোরের কাছে। ও বলছে জেনারেল পোস্ট অফিসের সামনে থেকে চুরি করেছে সে ওটা। অনেক চেষ্টাতেও আর কোন তথ্য পাওয়া যায়নি তার কাছ থেকে। মোখলেসের কোন পাত্তাই নেই। কি পোস্ট করতে এসেছিল সে পোস্ট অফিসে? কি এমন জরুরী খবর? কার কাছে পাঠানো হলো খবরটা? চুরি হতে পারে জেনেও তালা না দিয়ে সাইকেলটা বাইরে রেখে জি. পি. ও-র ভিতর গেল কেন সে? তারপর সেখান থেকে কোথায় গেল? পুলিসের সাহায্য নিল না কেন? সে-ও কি জড়িত এই হত্যাকাণ্ডের সাথে?

উহ্! ভয়ঙ্কর সে দৃশ্য! রানার এই পরিণতি হবে কল্পনাও করা যায় না। কিছু চিনবার উপায় নেই। বীভৎস। শত্রুরও এরকম মৃত্যু কামনা করে না সোহেল।

'ভেতরে আসুন।' দরজায় টোকা পড়তেই হাঁক ছাড়ল সোহেল।

ঘরে ঢুকল ফরেনসিক ল্যাবোরেটরির এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট আলী আহমেদ। হাতে একটা ফাইল, কাঁধে ঝুলানো একখানা ব্যাগ। 'অত তাড়াহুড়ো করলে হয় নাকি স্যার?' আলী আহমেদের কণ্ঠে অনুযোগ। 'রিপোর্ট তৈরি হয়নি এখনও, কাল বিকেলের আগে টাইপ করিয়ে সারতে পারব না।'

'বসুন, আলী আহমেদ সাহেব।' সোহেল বলল। তাড়াতাড়ি করবার জন্যে চাপ দেয়ায় খেপে গেছে লোকটা। পারফেকশনিস্ট মানুষ, যা-তা একটা ভুলভাল রিপোর্ট দেয়াটা ওর নীতির বাইরে। ফাইলটা টেবিলের উপর, আর কাঁধের ব্যাগটা চেয়ারের পাশে কার্পেটের উপর নামিয়ে রেখে বসল। কয়েক পর্দা নামিয়ে ফেলল সোহেল কণ্ঠস্বর, 'মাসুদ রানা আমার একমাত্র বন্ধু ছিল।' অবাক হয়ে চাইল আলী আহমেদ সোহেলের মুখের দিকে। 'তাই বড় অস্থির লাগছে, বিরক্ত করছি আপনাকে।'

'আরে, তাতে কি হয়েছে।' সপ্রতিভ সসব্যস্ত হয়ে উঠল আলী আহমেদ। 'বিরক্তির কি আছে, কিচ্ছু না, স্যার।...আপনার বন্ধু ছিলেন...আমি দুঃখিত, স্যার। বড় করুণ মৃত্যু। তা স্যার, রিপোর্ট লেখা হয়নি ঠিকই, কিন্তু নোট তৈরি হয়ে গেছে আমার। সবকিছু মুখস্থই আছে, মুখে মুখেই রিপোর্ট দিতে পারি।'

'তাহলে বড় ভাল হয়। কি বোমা ছিল ওটা?'

'সেটা হলপ করে বলা যাচ্ছে না স্যার। খুব সম্ভব জেলিগনাইট। প্লাস্টিক বম্ব

হতে পারে। যদ্দূর মনে হয় ডিনামাইট নয়। কিন্তু দারুণ শক্তিশালী বোমা। ষাট-সত্তুর গজ দূরেও গাছের গায়ে গাড়ির টুকরো অংশ পাওয়া গেছে—গেঁথে ছিল একেবারে। ডাটসানের টু ব্যারেল ডাউন-ড্রাফ্‌ট্‌ ভেঞ্চুরি কার্বুরেটারটা পাওয়া গেছে একশো গজ দূরে ড্রেনের মধ্যে, ট্যান্ডেম মাস্টার সিলিন্ডার পাওয়া গেছে ডানদিকের দেয়ালে ইটের ভিতর, আর ভিনাইল লেদারের আপহোলস্টারির টুকরো পাওয়া গেছে শালিক পাখির বাসায়।'

'টি. এন. টি. নাকি?'

'না স্যার। টি. এন. টি. ডিটোনেট করা কঠিন। দুটো জিনিস থেকে আন্দাজ করা যাচ্ছে বোমাটি কি ভাবে ফাটানো হয়েছিল।' ব্যাগ থেকে একটা দুমড়ানো লোহার বাক্স বের করল আলী আহমেদ। বাক্সটার গায়ে লেগে থাকা একটি চুম্বকের পাত টেনে খসাল। 'দেখছেন স্যার কি পাওয়ারফুল ম্যাগনেট? এই বাক্সের ভিতর ছিল বিস্ফোরক। এটাকে ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছিল গাড়ির নিচে ঠিক ড্রাইভিং সীটের তলায়। এখন দরকার শুধু কয়েক হাত লম্বা একখানা রশির। বাক্স থেকে রশিটা বেরিয়ে এগজস্ট পাইপের কাছাকাছি এলেই হলো। রশির অপর মাথায় বাঁধা ছিল এই চুম্বকটি। এগজস্ট পাইপের গায়ে এমন ভাবে চুম্বকটা লাগানো ছিল যাতে একটু নাড়া পেলেই পড়ে যায়। যেই ইঞ্জিনটা স্টার্ট দেয়া হবে, কেঁপে উঠবে এগজস্ট পাইপ, ঝাঁকি খেয়ে পড়ে যাবে চুম্বকটা, টান লাগবে রশিতে; ওমনি ঘটবে ডিটোনেশন এবং সাথে সাথেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ।'

'আইডেন্টিফিকেশন?'

'আইডেন্টিফিকেশনের একমাত্র উপায় হচ্ছে জামা কাপড় ও জুতোর যেটুকু অংশ পাওয়া গেছে তাই। ডেডবডি আপনি নিজেও দেখছেন স্যার, চেনার উপায় নেই। জামা, কাপড়, জুতো মাসুদ রানা সাহেবের, এটা প্রমাণিত হয়েছে। এমন কি প্যান্টের একটা বোতামে জানুয়ারি সেভেনটি ওয়ানে আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করা সায়ানাইড পিলও পাওয়া গেছে। ব্লাড গ্রুপও মিলে গেছে। ও থেকে যতটা সম্ভব আন্দাজ করে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই স্যার। সেন্ট পার্সেন্ট শিওর হওয়ার কোন উপায় নেই।'

আলী আহমেদকে বিদায় দিয়ে আবার ভাবতে বসল সোহেল। ডাক্তারদের রিপোর্টের কথা মনে পড়ল। মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞেস করায় সহজ ভঙ্গিতে বলেছিল ডাক্তার, 'শরীরটা পেটের কাছে থেকে ছিঁড়ে দু'টুকরো হয়ে গিয়েছিল, মাথার খুলি কয়েক জায়গায় ভাঙা পেয়েছি, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ডজন খানেক হাড় ভাঙা, ঘাড়টা মটকানো, স্টিয়ারিং হুইলের রডটা ঢুকে গিয়েছিল হৃৎপিণ্ডে। এতসবের মধ্যে ঠিক কোনটা যে মৃত্যুর কারণ বলা মুশকিল। মৃত্যুর জন্যে এগুলোর যে কোন একটাই যথেষ্ট। তবে একটা কথা নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি, এর চেয়ে দ্রুততর মৃত্যু আর সম্ভব নয়। খুব কুইক মারা গেছেন ভদ্রলোক। টেরই পাননি যে উনি মারা

গেছেন।'

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোহেল। সিগারেট ধরাল একটা। নাহ্, রানাকে হত্যা করে মোখলেস পালিয়েছে, এটা হতেই পারে না। ব্যক্তিগত ভাবে চেনে সে মোখলেসকে, বহু বছরের পুরানো লোক সে রানার। কিন্তু তাহলে গেল কোথায়? বাড়িতে বোমা ফেটে কেউ মারা গেলে জামা কাপড় নিয়ে সাইকেল চেপে পালায় না কেউ। কেমন যেন গোলমাল ঠেকছে। মিলছে না। বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চিন্তা করল সোহেল, কিন্তু খট্‌কা গেল না। কোথায় যেন একটা কিন্তু থেকে যাচ্ছে।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত একটা চিন্তা খেলে গেল সোহেলের মাথায়। তাই তো। রাঙার মার পরনে একটা নতুন শাড়ি ছিল, আরেকটা পুরানো শাড়ি শুকোচ্ছে রোদে। বাকি কাপড় চোপড় কোথায় গেল? মোখলেসেরও কাপড় নেই। এর মানে কি হতে পারে? নিশ্চয়ই চুরি হয়ে গিয়েছিল ওদের সব কাপড়-জামা।

রিসিভার তুলে চিবুক দিয়ে কাঁধের সাথে আটকে ডায়াল করল সোহেল তেজগাঁ থানার নাম্বারে। তিন মিনিটেই এফ. আই. আর. নাম্বার পাওয়া গেল, অভিযোগকারীর নাম মোখলেসুর রহমান। পুরো ডায়রীটা পড়ে শোনানো হলো ওকে।

পূর্ণোদ্যমে নতুন করে ভাবতে বসল সোহেল। পুরো ছকটা উল্টে নিয়ে ভাবতে শুরু করল। রানার জায়গায় নিল মোখলেসকে। এবার ধীরে ধীরে ধাপের পর ধাপ মিলে যাচ্ছে অঙ্কটা। মোখলেসের জামা কাপড় পাওয়া যায়নি কেন তা বোঝা যাচ্ছে—কাপড় ছিল না, রানার কাপড় পরেছিল সে এই জন্যেই। মোখলেসকে পাওয়া যাচ্ছে না, তার কারণ সে মারা গেছে। ধ্বংসাবশেষ থেকে রানার পিস্তলটা পাওয়া যায়নি কেন বোঝা যাচ্ছে সহজেই। সাইকেল হারানোর কারণও পাওয়া যাচ্ছে—ইচ্ছে করে চোরের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে ওটা। জি. পি. ও. থেকে ফোন করে খবর দেয়া হয়েছে বি. সি. আই-কে এবং এই টেলিফোন নম্বর মোখলেসের জানার কথা নয়।

আধঘণ্টা পর মৃদু হাসি ফুটে উঠল সোহেলের ঠোঁটে।'

'শালা, উল্লুকে পাট্‌ঠা!' গাল দিল সে খুশিমনে। এক চুমুকে সাবাড় করে দিল ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া কফিটুকু।

তিনজন দুঃসাহসী অপারেটারকে ডেকে পাঠাল সোহেল। কাজ বুঝিয়ে দিল ওদের। যে করে হোক খুঁজে বের করতে হবে রানাকে আজই রাতে, শত্রুপক্ষের পাওয়ার আগেই। তারপর খুশি মনে বেরিয়ে গেল অফিস থেকে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মুখের হাসি উবে গেল সোহেলের। ফেউ লেগেছে পিছনে। রানার মৃত্যুর পরও আবার ফেউ কেন? রানাকে খুঁজে বের করে হত্যা করার জন্যে সোহেলের পিছনে লেগে ছিল ওদের লোক। ওদের জানা আছে, আক্রমণের আগে সোহেলের সাথে দেখা রানা করবেই। রানাকে হত্যা করবার

পরও ওকে অনুসরণ করার মানে কি? ওরা কি জানে যে রানা মারা যায়নি?

রানা কি জানে যে ওরা টের পেয়ে গেছে ইতিমধ্যেই?

দিক পরিবর্তন করল সোহেলের গাড়ি। গিলটি মিঞাকে খুঁজে বের করতে হবে।

চার

ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল রানার। কিছু স্ন্যাক্স আর কফির অর্ডার দিয়ে ঢুকল বাথরুমে। পনেরো মিনিট শাওয়ারের নিচে ভিজে আবার পেইন্ট করল নিজের মুখটা যত্নের সাথে। আবার পুরোদস্তুর সেলস ডাইরেক্টার ব্যানার্জী হয়ে বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। টেবিলের উপর ট্রে-টা নামিয়ে রেখে চলে গেল বেয়ারা।

আপাতত গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে ক'দিন। কিছু তথ্য জানতে হবে রানাকে। তারপর যোগাযোগ করবে সে কয়েকজন বিশ্বস্ত বন্ধুর সাথে। অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে শত্রুর উপর। বুঝে নিয়েছে সে, এখনও তৎপর রয়েছে সেই দলটা। ঘাপটি মেরে রয়েছে ঠিকই, কিন্তু পুরো শক্তি নিয়ে বিরাজ করছে ঢাকারই বুকে। এদের ধ্বংস না করতে পারলে রানাকে ধ্বংস হয়ে যেতে হবে। নিয়তির মতই অমোঘ এ লিখন। হয় রানা, নয় ইকরামুল্লাহ। যে কোন একজনকে মরতেই হবে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে। বোঝা যাচ্ছে বিদেশী মিশনটার সক্রিয় সাহায্য পাচ্ছে ইকরামুল্লাহ। নইলে এতবড় সাহস হত না ইকরামুল্লাহর।

দুটো পেস্ট্রি, একটা চিকেন প্যাটিস আর তিনটে স্যান্ডউইচ খেয়ে কফি ঢালল রানা। দু'কাপ কফি খেল সে ধীরে সুস্থে, তারপর একটা ইন্ডিয়ান গোল্ডফ্লেক ধরাল। ওযে মারা পড়েনি সেটা কি টের পেয়েছে ওরা? টের না পেয়ে থাকলে ভাল, কিন্তু যদি টের পেয়ে থাকে এবং ওকে অনুসরণ করা হয়ে থাকে তাহলে আজই রাতে আশা করা যায় আরেকটা আক্রমণ। কি ধরনের হামলা আসবে বলা যায় না, তবে এটা যে গোপন হামলা হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হচ্ছে লোকজনের ভিড়। সন্ধেটা পূর্বাণীর জলসাঘরে ড্রিঙ্ক করে কাটাবে স্থির করল রানা।

ঠিক সাড়ে ছয়টায় বেরোল রানা ঘর থেকে। গা থেকে ভুরভুরে গন্ধ ছুটছে কনক সেন্টের। লিফটের দিকে এগোল রানা। বিশ কদম গিয়েই থমকে দাঁড়াল। হুটোপুটির শব্দ এল বাঁ দিক থেকে। ছয়শো বত্রিশ নম্বর রুমের দরজা বন্ধ। দড়াম করে একটা চেয়ার উল্টানোর শব্দ হলো ঘরের ভিতর।

'হেল্প্!'' অস্পষ্ট ক্ষীণ, কিন্তু তীক্ষ্ণ নারী কণ্ঠ।

কি করা উচিত চট্ করে বুঝতে পারল না রানা। এমনি সময় খুলে গেল দরজা। পরমুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল আবার। এইটুকু সময়ের মধ্যেই দেখে নিয়েছে রানা যা দেখবার। সুন্দরী এক বিদেশিনী। ধস্তাধস্তি করছে দুইজন বলিষ্ঠ লোকের সাথে। ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে মেয়েটির চোখ জোড়া। তৃতীয় ব্যক্তি মেয়েটির দামী ক্যামেরা, ট্র্যানজিস্টার রেডিও আর একটা রেক্সিনের সুটকেস নিয়ে কেটে পড়ার তালে ছিল, রানাকে দেখেই দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজাটা।

বল্টু লাগানোর আগেই দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা দিল রানা কাঁধ দিয়ে। চিত হয়ে পড়ে গেল লোকটা, সুটকেস পড়ল ওর বুকের উপর, ক্যামেরাটা ছিটকে পড়ল কার্পেটের উপর। একলাফে ঘরে ঢুকল রানা। পিছন থেকে কলার ধরে দুই পা টেনে আনল রানা সামনের লোকটাকে, তারপর দড়াম করে রদ্দা মারল পাশ থেকে ঘাড়ের উপর। 'কোঁৎ' একটা আওয়াজ করে ঢলে পড়ল লোকটা একটা সোফার উপর। সুটকেস চাপা পড়া লোকটা ততক্ষণে ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সামলে ওঠার আগেই প্রচণ্ড এক ঘুষি পড়ল ওর নাকের উপর। চৌকাঠের উপর আছড়ে পড়ল সে। ক্লিক করে একটা শব্দ হতে ঘুরে দাঁড়াল রানা। মেয়েটির গলা পেঁচিয়ে ধরে থাকা লোকটার অপর হাতে একটা ছোরা। জোরে এক ধাক্কা দিল সে মেয়েটাকে রানার দিকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে রানার বুকের ওপর। চট্ করে দু'হাতে ধরে সোজা ভাবে দাঁড় করিয়ে দিল ওকে রানা। এগিয়ে আসছে লোকটা ছোরা হাতে। সঙ্গী দু'জনকে সংক্ষিপ্ত আদেশ দিল, 'বাইরে গিয়ে দাঁড়া। শুয়োরের বাচ্চাকে খতম করে আসছি আমি।'

ছোরা ধরার ভঙ্গি এবং পায়ের স্টেপিং দেখেই বুঝল রানা লোকটা ছোরাতে এক্সপার্ট। কয়েক সেকেন্ড মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নাচল ওরা দু'জন গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে। সঙ্গী দু'জন করিডরে। রানা একটা ফল্স্ স্টেপ ফেলল। সাথে সাথেই ফাঁদে পা দিল লোকটা, একলাফে এগিয়ে এসে ছোরা চালাল। গোক্ষুর সাপের ছোবলের মত বাম হাতে ধরে ফেলল রানা ছোরা ধরা হাতের কব্জিটা। জুজুৎসুর প্যাঁচে বেকায়দায় পড়ে গেল বেচারা। শূন্যে উঠে গেল লোকটা, ছুঁড়ে দিয়েছে ওকে রানা দরজার দিকে, ছোরা ধরা হাতটা এখনও রানার হাতে ধরা। আর এক সেকেন্ড ধরে রাখলে মড়াৎ করে ভেঙে যাবে লোকটার কব্জি। দ্রুত চিন্তা করল রানা—ছেড়ে দেবে, না ধরে রাখবে? ধরে রাখারই সিদ্ধান্ত নিল সে। পরমুহূর্তে কড়াৎ করে ভাঙল হাড়। এবার ছেড়ে দিল রানা হাতটা, উড়ে গিয়ে করিডরে পড়ল অজ্ঞান দেহটা। দরজার দিকে রানাকে এগোতে দেখেই ঝট্ করে দরজা বন্ধ করে দিল বিদেশিনী। চাবি লাগানোর শব্দ পাওয়া গেল। টেনে দেখল রানা দরজা বন্ধ।

দেয়ালের গায়ে সেঁটে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে মেয়েটি রানার দিকে।

মুখটা হাঁ হয়ে আছে, দুই হাত মুখের কাছে, যেন চিৎকার চেপে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। গলার কাছে নখের দাগ লাল হয়ে ফুটে উঠেছে। রানা লক্ষ্য করল অপরূপ সুন্দর ফিগার বিদেশিনীর।

'চাবিটা কোথায়?' হাত বাড়াল রানা মেয়েটির দিকে।

'এই যে!' এগিয়ে গেল মেয়েটা বেড-সাইড টেবিলের কাছে। ড্রয়ার ধরে টান দিল। তারপর এগিয়ে দিল চাবিটা।

তালা খুলে সাবধানে একটু ফাঁক করল রানা দরজাটা। কেউ নেই করিডরে। সাবধানে মাথা বের করে দেখল. ছোরা এক্সপার্টকে চ্যাংদোলা করে তুলছে ওরা লিফ্টে। রানাকে দেখেই দ্রুত ঢুকে পড়ল ওরা লিফটের ভিতর।

'চলে গেছে?' এগিয়ে এল মেয়েটা কয়েক পা। 'উহ্, কি ভয়ঙ্কর লোক সব! আপনি এসে না পড়লে কি যে হত! আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মিস্টার...'

'না, না। ধন্যবাদ দেয়ার কি আছে। আমার নাম ব্যানার্জী। অমিতাভ ব্যানার্জী। লাভ এ্যান্ড গ্রীন ফার্মাসিউটিকাল কোম্পানী (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের সেলস ডাইরেক্টার।'

'আমি মিস পলিন ব্রাউন। জার্নালিস্ট। ঘণ্টা খানেক আগে মাত্র পৌঁছেছি, এরই মধ্যে এই বিপদ। আপনি খুবই সাহসী মানুষ মি. ব্যানার্জী। খালি হাতে তিন তিনজন দস্যুকে যেভাবে...উহ্! আপনার সাহায্য না পেলে যে কী হত ভাবতেও শিউরে উঠছি। নিশ্চিন্তে বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম...'

'ঢুকল কি করে ওরা? টের পাননি?'

'না, মোটেই টের পাইনি। দরজায় চাবি লাগিয়ে দিয়েই নিশ্চিন্তে ছিলাম, ভাবতেও পারিনি যে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে ঘর খুলে ঢুকতে পারে কেউ।'

'হোটেলের কর্মচারী বলেই মনে হচ্ছে।'

'হতে পারে। কিংবা কর্মচারীর সাথে যোগাযোগ আছে এমন কোন গ্যাং-এর লোক।'

'এ নিয়ে হুলস্থুল করতে পারেন আপনি ইচ্ছে করলেই।'

'সেটা চাই না আমি। আমি, মানে ঠিক আইন সঙ্গত পথে এদেশে ঢুকিনি। গোলমাল এড়িয়ে থাকতে চাই।'

'বেশ। থাকুন। বিশ্রাম করুন আপনি, আমি চলি এখন।'

ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল রানা। দ্রুত কয়েক পা এগিয়ে এসে রানার বাহুতে হাত রাখল পলিন। বলল, 'বাইরে কোথাও যাচ্ছেন?'

'না। বারে যাচ্ছি সময় কাটাতে।'

'আপনি একা? নাকি কোন বান্ধবী থাকছে সাথে।'

'না। আমি একা।'

'আমাকে সঙ্গে নিতে আপত্তি আছে?' রানাকে দ্বিধা করতে দেখে যোগ করল, 'একা বড্ডো ভয় লাগছে!' মিনতি ফুটে উঠল বিদেশিনীর আয়ত দুই চোখে।

'বেশ তো আসুন না, গল্প করে সময়টা কাটবে ভাল। ডিনারটাও সারা যাবে একসাথে।' বেহুদা ঝামেলায় ফেঁসে যাচ্ছে বুঝতে পারল রানা।

'অনেক ধন্যবাদ। আপনি একটু বসুন, আমি এক্ষুণি আসছি কাপড় পরে।' সুটকেস থেকে নতুন একসেট কাপড় নিয়ে বাথরুমে ঢুকল পলিন। পাঁচ মিনিটেই তৈরি হয়ে বেরিয়ে এল। চমৎকার ম্যাচ করা চোখ ধাঁধানো ব্লাউজ, স্কার্ট, কার্ডিগান। ঠোঁটে টকটকে লাল লিপস্টিক। নেমে এল ওরা তেতলায়।

শ্যাম্পেনের বোতল আধাআধি হতেই সহজ হয়ে এল ওদের কথাবার্তা। কথার খৈ ফুটেছে পলিনের মুখে। বিস্তর কথা, অনর্গল অপ্রয়োজনীয় কথা। অনর্থক হাসি। মাঝে মাঝে কোণের একটা টেবিলে বসা দুজন লোককে লক্ষ করছে রানা আড়চোখে। সাত কোর্সের ডিনার অর্ডার দিল রানা। চতুর্থ কোর্স যখন দেওয়া হচ্ছে ঠিক তখন বিল মিটিয়ে দিয়ে উঠে গেল লোক দু'জন। নিমগ্ন চিত্তে খেতে খেতে একবার ঘড়ি দেখল রানা। রান্নার প্রশংসা করল পলিন। বাংলাদেশে এই তার জীবনের প্রথম ডিনার। প্রচুর কথা বলছে ঠিকই, কিন্তু সন্ধ্যার সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা ভুলতে পারছে না সে কিছুতেই। ভয়ানক ভয় পেয়েছে। বারবার বলছে সেকথা।

ডিনারের পর এল আরেকটা বোতল। অনেকটা ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছে পলিন। রানার হাত দেখে ভূত ভবিষ্যৎ বলে দিল সে। টেবিলের তলায় পায়ে পায়ে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেল একবার। ইচ্ছে করেই আবার স্পর্শ করল সে রানার পা। রানার আপত্তি প্রকাশ পেল না, বরং ধীরে ধীরে সক্রীয় হয়ে উঠছে ওর পাও। কিছুক্ষণ চলল পায়ে পায়ে খেলা। চোখে চোখ পড়তেই চোখ নামাচ্ছে পলিন। কেটে যাচ্ছে সময়।

'সন্ধ্যের সময়ই যা ভয় পাচ্ছিলে, এখন রাতটা কাটাবে কি করে একা?' জিজ্ঞেস করল রানা মৃদু হেসে।

'একা কে কাটাচ্ছে রাত? পাগল নাকি? মরে যাব না ভয়ে।'

'সারারাত এখানে বসে থাকবে বুঝি?'

'তুমি থাকলে থাকব।'

বেয়ারা বিল নিয়ে এল। বিলটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করল রানা। হাত নেড়ে বিদায় করল বেয়ারাকে। বলল, 'আরও ঘণ্টা খানেক থাকব।'

সিগারেট ধরাল পলিন রানার প্যাকেট থেকে একটা বের করে।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল রানার। 'ওহ্হো, একটা জরুরী

টেলিফোনের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। পাঁচ মিনিটের জন্যে মাফ করতে হবে আমাকে পলিন। লক্ষ্মী মেয়ের মত বসে থাকো, ভয় পেয়ো না, আসছি আমি এক্ষুণি।'

শ্যাম্পেনের ভরা গ্লাসে ছোট্ট একটা সিপ করে টেবিলে নামিয়ে রেখে চলে গেল রানা টেলিফোন বুথের দিকে। মোড় ঘুরে পলিনের চোখের আড়াল হতেই দ্বিগুণ হয়ে গেল রানার চলার গতি। সুইপারের সিঁড়ি দিয়ে কয়েক লাফে পৌঁছুল রানা চার তলায়। করিডর ধরে সিঁড়ি ঘরের দিকে চলল এবার সে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ছয় তলায়। রাত পৌনে এগারোটা।

প্রথমে পলিনের ঘরের দরজায় কান পাতল রানা। আধ মিনিট নিবিষ্ট চিত্তে কি যেন শোনার চেষ্টা করল। তারপর পা টিপে চলে এল নিজের ঘরের সামনে। কান পাতল দরজায়। মৃদু স্বরে কথা বলছে দুজন লোক ঘরের ভিতর। তৃতীয় কণ্ঠস্বরের জন্যে এক মিনিট অপেক্ষা করল রানা। নাহ্ ঝুঁকি নিতেই হবে। তৃতীয় কেউ না থাকারই সম্ভাবনা বেশি।

নিঃশব্দে তালা খুলল রানা। ঘরের ভিতর একজন বলল, 'কাম খতম। চল এবার কেটে পড়ি।'

পিস্তলটা চলে এল রানার হাতে। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল রানা। বন্ধ করবার সময় খট করে আওয়াজ হলো। চমকে উঠল দুজন লোক একই সাথে। ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল দরজার দিকে। কোণের টেবিলের সেই দুজন। কার্পেটের উপর একটা অ্যাটাচী কেস। মৃদু আলো জ্বলছে ঘরে। বাম হাতে উজ্জ্বল বাতির সুইচটা অন করল রানা।

'খবরদার! চোখের পাপড়ি ফেলবে না কেউ। গুলি করতে দ্বিধা করব না একবিন্দুও।'

কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল ওরা খাটের পাশে। রানার প্রতিটা কথা বিশ্বাস করেছে ওরা। নড়াচড়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না ওদের মধ্যে।

'গুড। এবার তুমি, গোঁপওয়ালা, বিছানার চাদরটা ছিঁড়ে লম্বালম্বি টুকরো বের করো কয়েকটা।' আদেশ পালিত হলো অক্ষরে অক্ষরে। 'এবার তোমার সঙ্গীর হাত-পা বেঁধে ফেল শক্ত করে।' হাত দুটো সামনের দিকে রেখে বাঁধতে যাচ্ছিল, বাধা দিল রানা, 'উঁহু, ওভাবে না। হাত দুটো পিছমোড়া করে শক্ত করে বাঁধ। এক্ষুণি পরীক্ষা করে দেখব আমি নিজে, যদি ঢিল পাই, তোমার কপালে খারাবি আছে।'

বাঁধা হয়ে গেল হাত-পা। সরে দাঁড়াতে বলল রানা গোঁপওয়ালাকে। বাঁধন পরীক্ষা করে দেখল রানা। যথেষ্ট শক্ত। সার্চ করে পিস্তল পেল না ওর শরীরের কোথাও। সার্চ করতে গিয়ে একটু নিচু হয়েছিল রানা, ঠিক সেই সময়েই ঝাঁপ দিল

গোঁপওয়ালা। ঝট করে সোজা হয়ে মাথা লক্ষ্য করে পিস্তলের নল দিয়ে আঘাত করল রানা, কিন্তু এক ঝাঁকিতে মাথা সরিয়ে নিল লোকটা, আঘাতটা লাগল ওর কাঁধের উপর। রানাকে নিয়ে হুড়মুড় করে পড়ল লোকটা খাটের উপর। পিস্তল ধরা হাতটা চাপা পড়ল রানার নিজের শরীরের নিচে। বাম হাতে কারাতের কোপ মারল রানা লোকটার ঘাড়ে। বিদঘুটে একটা শব্দ বের হলো ওর মুখ থেকে। ঘুষি চালাল লোকটা এলোপাতাড়ি। প্রচণ্ডবেগে উঠে এল রানার হাঁটু লোকটার তলপেট লক্ষ্য করে। 'হুঁক' করে বাঁকা হয়ে গেল ওর শরীরটা। ডান হাতটা মুক্ত হয়ে গেছে রানার ইতিমধ্যেই।

ঠকাস্ করে পিস্তলের বাঁট পড়ল লোকটার জুলফির ওপর। জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ে গেল সে খাট থেকে। এদিকে হাত-পায়ের বাঁধন খুলতে না পেরে ব্যাঙের মত লাফিয়ে চলে গেছে গোঁপহীন লোকটা দরজার কাছাকাছি। ঠকাশ্। ধুড়ুম করে মেঝেতে পড়তে না দিয়ে ধরে ফেলল রানা ওর জ্ঞানহীন দেহটা। টেনে এনে ফেলল খাটের উপর।

দ্রুত বেঁধে ফেলল রানা গোঁপওয়ালার হাত-পা। একজনের উপর আরেকজনকে শুইয়ে দুজনকে বাঁধল এবার খাটের সাথে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে যদি জ্ঞান ফিরে আসেও বাঁধন খুলতে পারবে না কেউ। দুজনেরই মুখের মধ্যে টুকরো চাদর ভরে চিৎকারের পথ বন্ধ করল। এতক্ষণ পর নিচু হয়ে ঝুঁকে খাটের তলাটা পরীক্ষা করল রানা। বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে কিছুক্ষণ অদ্ভুত বস্তুটার দিকে। ক্লক মেকানিজম নয় বোঝা গেল সহজেই। অ্যাসিড ক্যাপসুলের সাহায্যে ডিটোনেশনের ব্যবস্থা।

পিস্তলটা গুঁজে দিল রানা বালিশের তলায়। তারপর আয়নায় চেহারাটা পরীক্ষা করে নিয়ে কাপড় ঝেড়ে মুছে, উজ্জ্বল বাতিটা নিবিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বাইরে থেকে দরজায় চাবী লাগিয়ে ফিরে এল সে জলসাঘরে। ঘড়িতে তখন এগারোটা বাজতে দশ মিনিট। সিগারেট টানছে পলিন। রানাকে দেখতে পেয়ে হাসল। পরিত্যক্ত চেয়ারটায় বসল রানা আবার। গ্লাসের অর্ধেকটা শেষ করল এক ঢোকে। পকেট থেকে বিলটা বের করে ডাকল, 'বেয়ারা।'

'কাজ হলো?' জিজ্ঞেস করল পলিন।

'হ্যাঁ। কালকে দেখা হচ্ছে মন্ত্রীসাহেবের সাথে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ফেললাম।' পলিনের খালি গ্লাসটা ভরে দিল আবার রানা।

বুঝতে পেরেছে রানা ওর উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিল শত্রুপক্ষ। ও যে মারা যায়নি, জানে ওরা। চেহারা পাল্টাবার এতসব কৌশলে কোন কাজই হয়নি। ওরা ঠিকই চিনে নিয়েছে ওকে। এবং একই দিনে দ্বিতীয়বার পেতেছে মৃত্যুর ফাঁদ। দ্বিতীয়, না তৃতীয়বার? সেই প্রশ্নটার একটা মীমাংসা হওয়ার দরকার। এবং দ্রুত

কেটে পড়া দরকার এখান থেকে।

'কি ভাবছ?' রানার হাতে হাত রাখল পলিন।

'ভাবছি, কোথায় ছিলে তুমি, আর কোথায় ছিলাম আমি। আমাদের একে অপরকে চিনবার কথা না, অথচ এখন একই টেবিলে বসে গল্প করছি...'

'সত্যিই আশ্চর্য! এখন ভাবছি গুণ্ডাগুলো ভাগ্যিস আক্রমণ করেছিল। তা নইলে দুজন দুঘরে একা একা নিরানন্দ রাত কাটাতাম।'

'ধরেই নিয়েছ যে আমরা একসাথে রাত কাটাচ্ছি?'

'নিশ্চয়ই। ডোন্ট বি সিলি! তোমার ঘরে ঘুমাচ্ছি আমি।'

'কেন?'

'ভয়ে।'

'তোমার ঘর কি দোষ করল?'

'আমার ঘরটা চেনে ওরা। রাতে আবার আসতে পারে।'

'সেই জন্যেই তো তোমার ঘরে থাকা দরকার। জিনিসপত্র আছে...'

'জিনিসপত্র চুলোয় যাক। আমার শরীরটা চেয়েছিল ওরা। ব্যস্, আর কোন কথা নয়। তোমার ঘরে থাকছি আমি।'

'সেই একই তো কথা হলো তাহলে।' মৃদু হাসল রানা। 'গুণ্ডারা কি দোষ করেছিল?'

'ঠিক একই কথা হলো কি? ভিলেন আর হিরোর তফাতটুকু চোখে পড়ল না তোমার?'

'এতক্ষণে পড়ছে।' হাসল রানা। 'কিন্তু হিরোইনকে দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে যে তাকে আমার ঘরে আমন্ত্রণ করতে পারছি না।'

অবাক চোখে চাইল পলিন। 'কেন? ব্রহ্মচারী নাকি?' ঘড়ি দেখল সে।

'না, ব্রহ্মচারী নই।'

'বিবাহিত?'

'না।'

'তবে আপত্তি কিসের? চলো উঠে পড়া যাক।' খামচে ধরল সে রানার ডান হাতের মাউন্ট অব ভেনাস।

বিল মিটিয়ে দিয়ে উঠে পড়ল ওরা। খালি হয়ে এসেছে হলঘর। একটু টলছে পলিন। একহাতে কোমর জড়িয়ে ধরল রানা। লিফট জনশূন্য। রানার চোখে মদির চোখ রাখল পলিন। লাল ঠোঁট ফাঁক হলো একটু। হাত দুটো পেঁচিয়ে ধরল রানার গলা। নেমে এল নিষ্ঠুর এক জোড়া ঠোঁট। ছয় তলায় থেমে দাঁড়াল লিফট, খুলে গেল দরজাটা। তিন মিনিট পর মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে সরে গেল পলিন ছয় ইঞ্চি। লিপস্টিক জাবড়ে গেছে ঠোঁটে, আয়ত চোখ দুটো ভেজা ভেজা, দ্বিগুণ হয়ে

গেছে হার্টবিট।

করিডর জনশূন্য। ছয়শো বত্রিশ নম্বর রুমের সামনে থামল রানা।

রানার হাত ধরে টানল পলিন। 'তোমার ঘরে চলো।'

নড়ল না রানা। নেমে এসেছে নিষ্ঠুর ঠোঁট জোড়া, আবার।

চুম্বনরত অবস্থাতেই ভ্যানিটি ব্যাগের ভিতর খানিকক্ষণ দ্রুত হাতড়ে বের করল পলিন ঘরের চাবীটা। ছেড়ে দিল ওকে রানা। কী হোলে চাবি ঢোকাতে পারছে না পলিন। হাঁপাচ্ছে হাপরের মত। ওর হাত থেকে চাবিটা নিয়ে দরজা খুলল রানা।

পাঁচ

ঠাশ করে চড় লাগাল রানা। জোরে।

আচমকা চড়ে থতমত খেয়ে গেল পলিন। চারটে আঙুলের দাগ লাল হয়ে ফুটে উঠল বাম গালে। বাম হাত তুলল রানা আরেকটা চড় মারার জন্যে। স্বাভাবিক আত্মরক্ষার তাগিদেই হাত তুলল পলিন আঘাত ঠেকাবার জন্যে। হাতের উপরেই পড়ল চড়টা। টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল সে সোফার উপর। চেয়ে রয়েছে সে রানার মুখের দিকে। দুই চোখে রাজ্যের বিস্ময়। হঠাৎ কি হলো বুঝতে পারছে না সে রানার নির্বিকার মুখ দেখে। হঠাৎ খেপে গেল কেন লোকটা!

'চমৎকার অভিনয়ের জন্যে এই পুরস্কার। তোমার প্রেমিক সাহেবকে দেখিয়ো গালের দাগটা।' বলল রানা জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে।

'কি বলছ তুমি ব্যানার্জী…'

'ব্যানার্জী নয়, মাসুদ রানা। ন্যাকামী রাখ। তুমি ভাল করেই জানো আমার নাম।'

কয়েক সেকেন্ড অপলক নেত্রে চেয়ে রইল পলিন রানার চোখের দিকে। তারপর বলল, 'আমার নামও তোমার জানা আছে নিশ্চয়ই?'

'মিস্ সোফিয়া হারলিং। বাংলাদেশের কোন একটা বিদেশী মিশন-প্রধানের একমাত্র কন্যা। মিশনের নাম্বার টু-ম্যানের প্রেমিকা। মাসুদ রানাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে সহায়তার জন্যে নিয়োজিতা।'

'প্রথম থেকেই চিনতে পেরেছিলে আমাকে?'

'না। যথেষ্ট চিন্তা করে বের করতে হয়েছে। দশটা ত্রিশে চিনেছি। তোমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছি আরও পরে। পৌনে এগারোটায়।'

চোখ দুটো একটু ছোট করে বাম গালটা একহাতে ঘষতে ঘষতে চিন্তা করল

সোফিয়া কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'হত্যার ষড়যন্ত্র ছাড়া বাকি সব কথাই সত্য। কিন্তু তোমার কোন প্রশ্নের জবাব দেব না আমি...'

'তোমাকে কে প্রশ্ন করছে? যা সত্য বলে জানি, কেবল তাই বলেছি। তোমার কাছে আমার জানার কিছুই নেই। বোমাটা না ফাটা পর্যন্ত এই ঘরে বসে থাকব আমি, তোমাকেও ওইখানে বসে থাকতে হবে ওইভাবে। ওটা ফেটে গেলেই মহা হৈ-হট্টোগোল হবে সারা হোটেল জুড়ে, সেই সময় টুপ করে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাব আমি।' মুখোমুখি একটা সোফায় বসল রানা।

মন দিয়ে শুনল সোফিয়া রানার কথা। চুপচাপ বসে রইল সে মিনিট দুয়েক কার্পেটের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। তারপর মুখ তুলল, 'তুমি তো প্রশ্ন করবে না, কারণ তোমার ধারণা, সব উত্তরই তোমার জানা আছে। জানা থাকলে ভাল কথা। কিন্তু আমি প্রশ্ন করলে জবাব দেবে?'

'জবাব দেয়ার মত হলে দেব। সময়টাও তো কাটাতে হবে। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কে জানে। কথাবার্তা বললে সময় কাটবে ভাল। প্রশ্ন করো।'

'বোমার ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।'

'তুমি বলতে চাও, আজ সন্ধ্যের সময় এই ঘরে আমাকে ছোরা মেরে হত্যা করার যে প্ল্যান করেছিলে, সেটাও ঠিক বুঝতে পারোনি?'

'প্ল্যানটা আমার নয়। সাইমনের। তোমার সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যে এই প্ল্যান করা হয়েছিল। সমস্তটা আগে থেকে সাজানো ছিল, অভিনয় ছিল, স্বীকার করি। কিন্তু লোকটা যে ফট্ করে ছোরা বের করে বসবে একথা আমার সত্যিই জানা ছিল না। খুব সম্ভব সাইমনেরও না। বোধহয় রেগে গিয়ে...' রানাকে মাথা নাড়তে দেখে থেমে গেল সোফিয়া।

'না গো সুন্দরী, না। এ লাইনে নির্দেশের বাইরে একটা চুমো খাওয়ারও উপায় নেই। এরা প্রফেশনাল। ছোরাতেই কাজ হয়ে গেলে আর টাইম বম্ব ফিট করার দরকার হত না। যেহেতু সফল না হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল, তাই তৃতীয় অ্যাটেম্প্ট্ স্ট্যান্ড বাই...'

'তৃতীয় কি করে? তোমার কথা যদি সত্যি ধরে নেয়া যায়, তবু টাইম বোমার ব্যাপারটা হচ্ছে দ্বিতীয়।'

'উঁহু। প্রথম আক্রমণ হয়ে গেছে আজ সকালে। আমার গাড়িটা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বোমা মেরে। বহুদিনের পুরানো আমার বাসার কাজের ছেলেটা মারা গেছে। কাজের বুয়া হাসপাতালে।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সোফিয়া বলল, 'আই অ্যাম সরি। কিন্তু বোমাটা ফিট করা হয়েছে কোথায়?'

'খাটের নিচে।' ভয়ে ভয়ে চাইল সোফিয়া খাটের দিকে। হেসে ফেলল রানা,

'তোমার নয়। আমার খাটের নিচে।'

'অসম্ভব।' সোজা হয়ে বসল সোফিয়া।

'কেন?'

'যদি তাই হত, তাহলে আমাকে ও ঘরে রাত কাটাতে বলত না সাইমন।'

'বাহ। এ তো কেঁচো খুড়তে গিয়ে একেবারে জ্যান্ত সাপ বেরিয়ে আসছে! তোমাকে বলা হয়নি টাইম বোমের কথা? কিংবা বিশেষ এক সময় কোন ছুতোয় ওই ঘর থেকে বেরিয়ে আসার কথা বলে দেয়া হয়নি পই পই করে?'

'না। কাজেই বোমা থাকতেই পারে না। আমাকে শুধু বলা হয়েছে ভয়ানক এক জরুরী কারণে রাত সাড়ে বারোটার পর যেন কিছুতেই তোমার ঘর ছাড়া অন্য কোথাও না থাকি। সারারাতই পাহারা দিতে হবে, কিন্তু বিশেষ করে একটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত ছলে বলে কৌশলে যে ভাবে হোক যেন তোমাকে বিছানা ছেড়ে উঠতে না দিই।'

'অর্থাৎ একটা থেকে দেড়টার মধ্যে ফাটবে বোমাটা।' হাত-ঘড়ির দিকে চাইল রানা। বারোটা বাজে। 'উহ্, একটি ঘণ্টা!' আপন মনে কথাটা বলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। 'সময়টা কাটানো কষ্টকর হয়ে পড়বে।'

'বোমা সম্বন্ধে শিওর তুমি?' তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রয়েছে সোফিয়া রানার চোখের দিকে।

'তোমাকে দুঃখ দিতে খারাপ লাগছে সোফিয়া, কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য কথা বলাই ভাল। তোমার প্রিয়তম আমার সাথে সাথে তোমাকেও হত্যা করবার প্ল্যান করেছিল। এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছিল সে। হ্যাঁ, বোমার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। নিজের চোখে দেখেছি আমি।'

'প্রমাণ দিতে পারো?' অভিব্যক্তিহীন সোফিয়ার কণ্ঠ, মুখের চেহারা। বোঝা গেল, বিশ্বাস করেছে সে রানার প্রতিটা কথা। তবু নিশ্চিত হতে চায়।

'পারি, কিন্তু দেব না। প্রমাণ দেয়ার দরকার কি আমার? একটা থেকে দেড়টার মধ্যেই একেবারে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে যাবে তুমি।'

'তার আগেই শিওর হতে চাই আমি।' দ্রুত চিন্তা করছে সোফিয়া। খেলা করতে গিয়ে হঠাৎ কঠোর সত্যের মুখোমুখি পড়ে গেছে সে।

'কেন?'

'নিজের প্রাণ বাঁচাতে। যদি তোমার কথা সত্যি হয়, তাহলে একটার আগেই সবদিক ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাকে। তুমি তো পালিয়ে গিয়ে বেঁচে যাচ্ছ, আমি বাঁচব কি করে? এই হোটেলে নিশ্চয়ই ওদের লোক আছে, বিস্ফোরণের পরও আমাকে জীবিত দেখতে পেলে, বাবার কাছে পৌঁছে সব কথা বলার আগেই খুন করবে ওরা আমাকে। আমাকেও পালাতে হবে। এমন ভাবে পালাতে হবে যেন

কেউ টের না পায়।'

রানা ভেবে দেখল কথাটা উল্টেপাল্টে। রানার মতই সোফিয়ার জীবন বিপন্ন এখন। দুইজন দুই শিবিরের মানুষ হলেও একটা দিকে মিল রয়েছে—ওদের শত্রু এখন একই ব্যক্তি। কোন ঝামেলায় না জড়িয়ে যতটা সম্ভব সাহায্য করবে সে সোফিয়াকে, ঠিক করল রানা। সবার নজর এড়িয়ে এখান থেকে গোপনে বেরিয়ে যাবার উপায় ভেবে রেখেছে সে। বলল, 'তুমি যদি চাও, তাহলে এখান থেকে পালাতে সাহায্য করতে পারি আমি। এমন ভাবে বেরিয়ে যেতে পারবে যাতে ঘুণাক্ষরেও টের পাবে না কেউ। কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। হোটেল থেকে বেরিয়ে নিজের নিরাপত্তার ভার তোমাকেই নিতে হবে।'

'কিভাবে পালাতে চাও?'

হেসে ফেলল রানা। 'বড় বেশি কাঁচা লোক তুমি সোফিয়া। সাইমনের প্রেমিকা হওয়ার যোগ্য নও। পরীক্ষা করে দেখার আগেই বিশ্বাস করে বসেছ আমার কথা। শত্রু পক্ষের লোক, আমার কথা অত সহজে বিশ্বাস করতে নেই, এটাও কি আমাকেই শিখিয়ে দিতে হবে? আমার মুখের কথাতেই নিজের প্রেমিকের ওপর সন্দেহ এসে যাওয়াটা...'

'কাঁচা হতে পারি, বোকা হতে পারি, কিন্তু ভুলে যেয়ো না, আমি নারী। বিপদের সময় কার ওপর নির্ভর করা যায়, কাকে বিশ্বাস করা যায়, সেটা চিনে নিতে নারী কোনদিন ভুল করে না। সহজাত প্রবৃত্তির বলে টের পায় সে সত্য মিথ্যা।'

'তাই নাকি? আমার সৌভাগ্য।'

'হেসে উড়িয়ে দিয়ো না মাসুদ রানা। আমি জানতাম অভিনয় করছি আমি আক্রান্ত হওয়ার, জানতাম আমার কোন ক্ষতি হবে না, মজার খেলা খেলছি—কিন্তু তোমার সেকথা জানা ছিল না। তুমি সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলে অভিনেত্রী সোফিয়াকে নয়, বিপদগ্রস্তা সোফিয়াকে। নিজের জীবন বিপন্ন করার অভিনয় তুমি করোনি, সত্যি সত্যিই বিপন্ন হয়েছিল তোমার জীবন। তোমার মহত্ত্ব ছোট করে দেখতে পারি না আমি। তোমার হাতের মার আমার প্রাপ্য ছিল।'

'বা, বা, বা! চমৎকার মহৎ লোক তো আমি! যে কোন ব্যাপারের আশ্চর্য মন গড়া ব্যাখ্যা বের করতে মেয়ে মানুষের জুড়ি নেই। খানিক বাদে হয়তো আমার চড়েরও একটা মহৎ ব্যাখ্যা বের করে ফেলবে তুমি। হয়তো বলে বসবে, চড় একটি উপকারী জিনিস, এটা খেলে কামনা-তপ্ত নারীর মাথা খুলে যায়, পানির মত পরিষ্কার হয়ে যায় জটিল ষড়যন্ত্র।'

'আমার প্রশ্নের উত্তর দাওনি তুমি। কি ভাবে পালাচ্ছি?'

'সেটা তোমাকে বলব ঠিক রাত একটায়। তার আগে একটা প্রশ্নের জবাব

দাও। যদি বোমাটা ফাটে, এখান থেকে বেরিয়ে কি করবে তুমি?'

'খুন করব সাইমনকে।'

'ওটা একটু কঠিন কাজ হয়ে যাবে তোমার পক্ষে। ওই কাজের ভারটা আমার ওপর ছেড়ে দিতে পারো। এ ছাড়া আর কি করবে?'

'সোজা গিয়ে সব ঘটনা খুলে বলব বাবাকে।'

'তোমার বাবা জানেন না এ ব্যাপারে?'

'কিচ্ছু না।'

'তাহলে শুধু শুধু মারা পড়বেন ভদ্রলোক। তোমার বাবা মিশন-প্রধান হলেও, তাঁর চেয়ে সাইমন অনেক বেশি ক্ষমতাশালী। গোপন অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে তোমাদের সরকারের তরফ থেকে পাঠানো হয়েছে ওকে। তোমাদের বিশ্ব কুখ্যাত স্পাই সংস্থার ও হচ্ছে পঞ্চম ব্যক্তি। কাজেই ওর বিরুদ্ধে নালিশে কিছুই কাজ হবে না।'

'তাহলে কি করতে হবে বলো?'

'বিস্ফোরণের ফলে তুমি, আমি দু'জনেই মারা গেছি। গা ঢাকা দেব দু'জনেই। যার যার মত আলাদা ভাবে। সাইমনের মৃত্যুর পর ফিরে যাবে তুমি তোমার বাবার কাছে।'

'কিন্তু ওই ঘরে যখন আমাদের কোন চিহ্নই পাওয়া যাবে না, তখুনি বুঝে নেবে ওরা যে পালিয়েছি আমরা।'

'আমাদের যথেষ্ট চিহ্ন পাওয়া যাবে ওই ঘরে। ছিন্নভিন্ন, বিকৃত ও পোড়া মৃতদেহ পাওয়া যাবে। চলো দেখাই।' উঠে দাঁড়াল রানা।

কিছুই বুঝতে পারল না সোফিয়া। ঘর থেকে বেরোল ওরা সাবধানে করিডর পরীক্ষা করে নিয়ে। রানার স্যুইটের দরজায় চাবি ঢোকাতেই রানার হাতের উপর হাত রাখল সোফিয়া। ফিসফিস করে বলল, 'এখনি ফেটে যাবে না তো বোমাটা।'

'না। এখনও আধ ঘণ্টা বাকি আছে একটা বাজার।'

ঘরে ঢুকেই আঁতকে উঠল সোফিয়া। ভয়ার্ত চোখে চেয়ে রইল বিছানার দিকে। সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল রানা, 'ওই যে দেখতে পাচ্ছ, উপরের লোকটা আমি, নিচেরটা তুমি। মিষ্টি মধুর সবুজ আলোয় প্রেমের খেলায় মত্ত। ওই যে তোমার কাপড়-জামা, বিছানায় ওঠার আগে এইখানে খুলে রেখেছিলে।' ঘরের কোণে ফেলল রানা হাতে করে আনা সোফিয়ার কার্ডিগান, ব্লাউজ, স্কার্ট।

'মাই গড, ও মাই গড!' ফিসফিস করে বলল সোফিয়া। 'এরা কারা?'

'এরাই ফিক্স করেছিল বোমাটা। এবার খাটের নিচটা একবার দেখলেই সব

সন্দেহ দূর হবে তোমার। দেখে নাও, কুইক।'

এগিয়ে গেল সোফিয়া খাটের দিকে। তিন পা গিয়েই ছুটে এসে আছড়ে পড়ল রানার বুকে। ভয়ে পাণ্ডুর হয়ে গেছে মুখটা। তোতলাতে শুরু করল সে, 'তা-তা-তা-তাকিয়ে আছে। নি-নি-নিচের লোকটা।'

খাটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। সত্যিই বিস্ফারিত আতঙ্কিত চোখে চেয়ে আছে গোঁফওয়ালা। ভয়ঙ্কর সে দৃষ্টি। ওদের সব কথা শুনেছে সে। বুঝতে পেরেছে, নিশ্চিত মৃত্যু এড়াবার কোন উপায় নেই, নিজের হাতে ফিট করা টাইম বোমে নিজেই মারা যাচ্ছে সে কিছুক্ষণের মধ্যেই।

থরথর করে কাঁপছে সোফিয়া। ভয়ে না মাঘের শীতে বোঝা যাচ্ছে না। রানা বলল, 'কই দেখে নাও বোমাটা।'

'থাক্ দেখতে হবে না, চলো বেরিয়ে পড়ি।'

'উঁহুঁ। নিজের চোখে দেখতে হবে তোমাকে। ইনোসেন্ট প্রেম-প্রেম খেলার পরিণতিটা দেখে নিতে হবে স্বচক্ষে।' মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল রানা দেখার জন্যে।

ওপাশ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে খাটের নিচটা পরীক্ষা করল সোফিয়া ভুরু কুঁচকে। বিষাক্ত সাপ দেখার মত ছিটকে সরে চলে এল।

'চলো এবার।'

দরজায় চাবি লাগিয়ে ফিরে এল ওরা সোফিয়ার ঘরে। মিনিট পাঁচেক চিবুকে হাত দিয়ে মাথা নিচু করে বসে থাকল সোফিয়া। আক্রোশ ভরে গাল দিল কয়েকটা। কাকে গাল দিল বুঝতে পারল না রানা। চুপচাপ বসে রইল সে। অবশেষে মাথা তুলল সোফিয়া, 'ঠিকই বলছ তুমি। চড় একটা উপকারী জিনিস। চোখ খুলে গেছে আমার। কিন্তু ওদের কি মরতেই হবে? না মেরে পারা যায় না? বাঁচিয়ে দেয়া যায় না ওদের দু'জনকে?'

'যায়। এখনও সময় আছে, ওদের দু'জনকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে আমরা যদি ওই খাটটা দখল করি, ওরা বেঁচে যাবে। রাজী থাকলে চলো।'

'আমি রাজী হলেই তুমি যাবে আমার সাথে?' লিপস্টিক জাবড়ানো ঠোঁটে হাসির আভাস।

'আগে রাজি হও তারপর দেখো যাই কিনা।' মৃদু হেসে বলল রানা।

ছয়

রাত দেড়টায় ঘুম ভাঙল সোহেলের।

টেলিফোন বাজছে।

'ইয়েস?' হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা কানে তুলে নিয়ে বলল সোহেল ঘুম জড়ানো কণ্ঠে।

'দুঃসংবাদ স্যার। ভেরি সরি টু ডিস্টার্ব ইউ অ্যাট দিস আওয়ার...' উত্তেজিত একটা কণ্ঠস্বর।

'কাট্ ইট্।' ধমক দিল সোহেল। 'কি হয়েছে সরাসরি বলো।'

'মাসুদ রানাকে পেয়েছিলাম, স্যার। পূর্বাণী হোটেলে।' তড়াক করে উঠে বসল সোহেল বিছানায়। 'অমিতাভ ব্যানার্জী নাম নিয়ে উঠেছিল সে হোটেলের ছয়তলার একটা ঘরে। সন্ধে সাতটা থেকে রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত মিস পলিন ব্রাউন বলে একটা জার্নালিস্ট মেয়েকে নিয়ে জলসাঘরে শ্যাম্পেন আর ডিনার খেয়েছে। তারপর মেয়েটাকে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল। কন্ট্যাক্ট করার সুযোগই পাইনি। তারপর...'

'শাট আপ!' অস্থির হয়ে উঠল সোহেল। 'দুঃসংবাদটা কি তাড়াতাড়ি বলো।'

'মারা গেছে, স্যার।'

'কি বললে?' বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সোহেল।

'মারা গেছে, স্যার। খাটের তলায় টাইম বম্ব ছিল। ঠিক সোয়া একটায় ফেটেছে। ভয়ঙ্কর অবস্থা স্যার, মহা হট্টগোল চলছে এখানে।'

'মেয়েটির ঘরে খোঁজ নিয়েছিলে?'

'জ্বি, স্যার। খালি। মেয়েটির কিছু কাপড় পাওয়া গেছে স্যার মাসুদ রানার ঘরে।'

'চিনতে পেরেছ? চেহারা দেখে চেনা যাচ্ছে মাসুদ রানাকে?'

'না, স্যার। আগুন ধরে গিয়েছিল, একেবারে ঝলসে গেছে চেহারা। দু'জনের কাউকে চিনবার উপায় নেই। খাটের উপর মাসুদ রানার ল্যুগারটা পাওয়া গেছে। মোখলেসের লুঙ্গিটা পাওয়া গেছে একটা সুটকেসের ভিতর।'

'আমি আসছি-এখুনি।' খটাং করে রেখে দিল রিসিভারটা সোহেল ক্রাডলে।

নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে এখন ওর। একটুর জন্যে বাঁচাতে পারল না রানাকে। দ্রুত কাপড় পরে নিয়ে ছুটল সে পূর্বাণীর দিকে ওর

অটোমেটিক-গিয়ার ফোক্সওয়াগেন গাড়িতে করে। বারবার চাইল রিয়ার ভিউ মিররের দিকে। মনটা দমে গেল ওর। কেউ অনুসরণ করছে না। কোন ফেউ নেই আজ আর ওর পিছনে।

পরদিন ঠিক বেলা দশটায় ধরা পড়ল রানা। জি. পি. ও-র সামনেই।

রিকশা থেকে নেমে দশ কদমও যায়নি রানা, এমন সময় ঘ্যাচ করে একটা কালো মার্সিডিজ বেঞ্জ থামল ওর সামনে, পথ জুড়ে। আনমনে পাশ কাটাতে গিয়ে চমকে উঠল রানা ভীষণ ভাবে। খপ্ করে হাত ধরল কেউ ওর। নরম স্পর্শ সে হাতের। দামী সেন্টের সুবাস এল নাকে। রানা চেয়ে দেখল, সহকর্মিণী শ্রীমতী সোহানা।

'রানা! তুমি এখানে! তুমি না মারা গেছ কাল সকালে?' অবাক বিস্ময়ে দেখছে সোহানা রানার আপাদমস্তক। হাঁ হয়ে আছে ওর মুখটা।

'নাহ্, যেতে আর পারলাম কই?'

'কোথায় ছিলে এতদিন?'

'জাহান্নামে ছিলাম। কেটে পড়ো এবার। পালাচ্ছি এখন।'

'উঠে পড়ো গাড়িতে।'

'ব্যস, পাগলামি শুরু হয়ে গেল, না? হাত ছাড়ো। ব্যাপারটা সিরিয়াস। গোলমাল কোরো না, সোজা নিজের কাজে চলে যাও।'

'উঁহুঁ। উঠে এসো গাড়িতে।' হাত ছাড়াবার চেষ্টা করায় আরও আঁকড়ে ধরল সে রানার হাত। টানছে। অবাক চোখে দেখছে রাস্তার লোক ঘাড় ফিরিয়ে।

'আহ! রাস্তার মধ্যে সীন ক্রিয়েট কোরো না, সোহানা।' পিছন থেকে হর্ন দিচ্ছে একটা করোনা রাস্তা ছাড়ার জন্যে, কিন্তু সেদিকে খেয়ালই নেই সোহানার। 'বোকামি কোরো না। এখন ঠাট্টার সময় নয়।' চাপা স্বরে বলল রানা। 'দেখতেই পাচ্ছ, ছদ্মবেশে নেই, কেউ চিনে ফেললে মারা পড়ব।'

'উঠে এসো গাড়িতে।' সোহানার কণ্ঠে আদেশ।

আবার হর্ন বাজাল পিছনের গাড়ি। ছোট্ট একটা তীক্ষ্ণ গালি বর্ষণ করল সোহানা পিছনের ড্রাইভারের উদ্দেশে। 'কই এলে না? আমার সাথে যেতে হবে তোমাকে। দেরি করলে চিৎকার শুরু করব।' টানা হেঁচড়া শুরু করল সোহানা এবার।

ভদ্রমহিলা হয় পাগল নয় বদমাইশের পাল্লায় পড়েছে মনে করে করোনার চালক গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে আসছে উদ্ধার করবে বলে।

'আচ্ছা মুসিবৎ! আহ, হাত ছাড়ো তো। বুঝতে পারছ না তুমি···তুমিও মারা পড়বে···তোমাকে জড়াতে চাই না। হাত ছাড়ো, প্লীজ···'

'শাট্ আপ্। কাম ইন। লেট্স্ ফেস ইট টুগেদার।'

করোনার চালক এসে পড়েছে কাছে। স্যুট-টাই পরিহিত ধোপ দুরস্ত সাহেব। এসেই ধাক্কা দিল রানার বুকে। 'অ্যাই ব্যাটা…'

আর কিছু বলবার সুযোগ পেল না বেচারা। ধাঁই করে মাঝারি একটা ঘুসি মারল রানা ওর নাকের উপর। 'বাপ্স্!' বলেই একেবারে পথে বসে পড়ল বেচারা নাকে হাত দিয়ে। কট্মট্ করে চোখ পাকিয়ে সোহানার দিকে তিন সেকেন্ড অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করে এক ঝটকায় দরজা খুলে উঠে এল রানা গাড়িতে। হুশ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা। বাঁয়ে মোড় নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল কৌতূহলী দর্শকদের চোখের সামনে থেকে।

মিনিট পাঁচেক কেউ কোন কথা বলল না। দক্ষ হাতে স্টিয়ারিং ধরে আছে সোহানা। গাড়ি ছুটে চলেছে রমনা রোড ধরে শাহবাগের দিকে। বার কয়েক আড়চোখে চাইল সোহানা রানার গম্ভীর মুখের দিকে।

'মাফ করে দিলেই চুকে যায়।' কথাটা বলে আবার একবার চাইল সে আড়চোখে। 'জানি অন্যায় করেছি, এসপিওনাজ রেগুলেশন ব্রেক করেছি, জোর জবরদস্তি করে বোকার মত কাজ করেছি, ভয়ানক কোন ক্ষতি হয়ে যেতে পারে এই বোকামির জন্যে। কিন্তু ক্ষমা জিনিসটা হচ্ছে মহাপুরুষদের…'

'তোমাকে বিয়ে করব না।' বলল রানা হঠাৎ। 'চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম।'

থমকে গেল সোহানা একটু। পরমুহূর্তে হেসে উঠল খিলখিল করে। হাসি সামলে নিয়ে বলল, 'করতেই হবে। নইলে চিৎকার করে লোক জড়ো করব। একেবারে হুলস্থূল বাধিয়ে দেব বলে দিচ্ছি!'

হেসে ফেলল রানাও। বলল, 'তাহলে করব।'

'সে দেখা যাবে। এখন কোন্ মহিলার বিছানা থেকে উঠে এলে?'

'সোফিয়া হারলিং।' মিররটা বাঁকিয়ে নিজের চেহারা দেখল রানা। কানের লতিতে লিপস্টিকের দাগ লেগে রয়েছে। মুছে ফেলল সে দাগটা।

'আমার চেয়ে সুন্দরী?'

'না।'

'তবু কেন আমাকে তোমার চোখে পড়ে না, বুঝি না। যাক, যাওয়া হচ্ছিল কোনদিকে?'

'ঠিক করিনি। গত রাতে সোয়া একটার সময় আবার খুন করা হয়েছে আমাকে। ভাবছি এখন কোন্দিকে যাওয়া যায়।' গত রাতের ঘটনাটা খুলে বলল রানা সোহানাকে।

হালকা করে শিস দিল সোহানা। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বড় শক্ত

পাল্লায় পড়েছ এবার মনে হচ্ছে। খুবই শক্ত। যাওয়ার চুলো ঠিক নেই যখন, আমার ওখানেই চলো নাহয়।'

'তোমাকে এর মধ্যে জড়াতে চাই না সোহানা।'

'কিন্তু আমি চাই।'

'প্রেম?' টিটকারি মারল রানা।

'বাৎসল্য।' মাতৃ সুলভ মধুর হাসি হাসল সোহানা।

'ডুডু খাব, আম্মা!' আঁচল ধরল রানা।

'অ্যাই পাজী!' কুনই চালাল সোহানা। তারপর বলল, 'ঠাট্টা নয়। আমার ওখানে চলো।'

'কান ধরে বের করে দেবেন তোমার পিতাজী।'

'কেন, মেলাঘরের হাসপাতালে খবরটা দিইনি তোমাকে? ওহ্হো, আহত হয়েছিলে বলে চেপে গিয়েছিলাম। জুলাই মাসে বাবা মারা গেছে। গেরিলাদের আড্ডা ছিল বাড়িটা। টের পেয়ে ক্যান্টনমেন্টে ধরে নিয়ে টরচার করে মেরে ফেলেছে ওরা বাবাকে।' নির্বিকার কণ্ঠ সোহানার।

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে রানা বলল, 'আই অ্যাম সরি।'

'দ্যাট্স্ অল রাইট। অনেক দিনের কথা—ভুলেই গেছি।' পরিবেশটা সহজ করার জন্যে বলল, 'কাজেই বুঝতে পারছ, গার্জেন নেই আমার। দুই বুড়োই খতম। এবার জোয়ান দেখে একজনের ঘাড়ে চাপতে হবে।'

'আমার ঘাড়টাকে দয়া করে নিষ্কৃতি দিলে বাঁচি! তবে হ্যাঁ। বিয়ে করে ফেলো এবার। প্রচুর উৎসাহী যুবক পাওয়া যাবে। একে অপরূপ সুন্দরী, তায় অসম্ভব ধনী। ওরেব্বাপ্রে! লম্বা লাইন হবে। যাক, সামনের মোড়ে নামিয়ে দাও আমাকে, আমি কেটে পড়ি।'

'কোথায় যাবে?'

'বললাম না, ঠিক করিনি এখনও।'

'সোহেল সাহেব বি. সি. আইটাকে আবার রিঅর্গানাইজ করছে। তোমাকে চীফ করা হচ্ছে। জয়েন করছ?'

'না। চাকরি করব না আর।'

'চাকরি না-ই বা করলে, এ ব্যাপারে ওদের সাহায্য নিতে অসুবিধা কি?'

'অসুবিধা আছে। ভয়ঙ্কর এক ষড়যন্ত্র চলছে। ফ্যানাটিক একটা দলকে ব্যবহার করছে বিদেশী এক বৈরী ভাবাপন্ন রাষ্ট্র। দারুণ শক্তিশালী। চারদিকে নজর রেখেছে ওরা। সবখানেই লোক আছে ওদের। সোহেলের ওপরও নজর রেখেছে। আমি যাতে সোহেলের সাহায্য না নিতে পারি তার সব ব্যবস্থা করে রেখেছে ওরা। তিন

তিন বার বিফল হয়েছে—এখন দেখা মাত্র যে কোন জায়গায় যে কোন অবস্থায় সরাসরি স্টেনগানের গুলিতে আমাকে শেষ করে নিজে আত্মহত্যা করতে দ্বিধা করবে না ওদের দলের কোন লোক। ফ্যানাটিক। অখণ্ড পাকিস্তান ফিরিয়ে আনবে ওরা যে কোন মূল্যে! আমার দুর্ভাগ্য, আমি ওদের সম্পর্কে এত বেশি জেনে ফেলেছি যে আমাকে শেষ না করে উপায় নেই ওদের। আর ওরাও পড়েছে মহা যন্ত্রণায়, কিছুতেই মরতে চাইছি না আমি।'

'ওরা তো জানে মারা গেছ তুমি।'

'বলা যায় কিছু? তুমি যা সীন ক্রিয়েট করলে কে জানে হয়তো দেখে ফেলেছে ওদের কেউ। এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না। তাছাড়া দুইতিন দিনের মধ্যেই হয়তো জেনে যাবে ওরা যে সোফিয়া আর আমি নই, মারা গেছে ওদেরই দু'জন লোক। কিছুদিন ঘাপটি মেরে থাকতে হবে আমাকে।'

'আমার ওখানে গেলে অসুবিধা কি? কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পাবে না।'

'কেন টের পাবে না?'

'কেউ ভাবতেই পারবে না তুমি আমার কাছে আছ। সবার ধারণা আমাদের সম্পর্ক সাপে-নেউলে, সর্বক্ষণ ঝগড়া-ঝাঁটি করি, দু'চোখে দেখতে পারি না কেউ কাউকে।'

'আসলে বুঝি আমাদের খুব ভাব?'

'বাজে কথা রাখো। যা বলছিলাম। আমার কাছে থাকলে দু'দিক থেকে লাভ হচ্ছে তোমার। কেউ তো টের পাচ্ছেই না, দ্বিতীয়ত, আমার মত একজন প্রখর বুদ্ধি সম্পন্না অপরূপ সুন্দরী তরুণী সহকারী পাচ্ছ। আর বিপদের কথা বলছ? তুমি তো জানোই, ও আমি কেয়ার কার না, বিপদের মোহেই চাকরি নিয়েছিলাম পি. সি. আই-এ। কাজেই...'

ধানমণ্ডীর দিকে মোড় নিল মার্সিডিস বেঞ্জ।

রানা ভেবে দেখল, একদিক থেকে ভালই হলো। মমতা, শাহেদ আর ইগলুকে খবর দেয়া যাবে সোহানাকে দিয়ে।

সাত

দোতলার জানালা ঘেঁষা একটা ডবল বেড খাটে শুয়ে চেয়ে রয়েছে রানা লেকের দিকে। পড়ন্ত বিকেলের নিস্তরঙ্গ জল, ছিপ ফেলে বসে থাকা বুড়ো লোকটার অটল ধৈর্য, আর কয়েকটা গাঙচিলের অনবরত ঘুরে ঘুরে ওড়া দেখতে দেখতে চোখটা

ঝাপসা হয়ে আসছে বারবার।

নিজ হাতে ঘরটা ঝেড়ে মুছে মশারি, বালিশের ওয়াড়, চাদর বদলে বিছানা তৈরি করে দিয়েছে সোহানা। সোহানার এই রূপটা দেখেনি কখনও রানা। বাইরের সেই চঞ্চল, ওভার স্মার্ট, সৌখিন, বিলেত ঘুরে আসা, ফুটফাট ইংরেজী বুলি ওয়ালা চালু মেয়েটা ঘরে এসেই যে বাঙালী হয়ে যায়, জানা ছিল না ওর। এই মেয়েকে কোমরে শাড়ি জড়ানো, খালি পায়ে, ঝাড়ন হাতে দেখতে পাবে কল্পনাও করেনি সে।

ঘরটা সোহানার বাবার। বড়লোকের সৌখিন শোবার ঘর, দামী আসবাব। দেয়ালের প্রকাণ্ড অয়েল পেন্টিংটা এক মহিলার পোরট্রেট। খুব সম্ভব সোহানার মা। মেজর জেনারেল রাহাত খানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন ভদ্রলোক। কথাটা মনে আসতেই মেজর জেনারেলের কাঁচা পাকা ভুরু জোড়ার নিচে তীক্ষ্ণ দুটি চোখের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠল রানার মানস পটে। এই চোখের সামান্য ইঙ্গিতে কতবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে সে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে। সর্বক্ষণ ধমক আর কঠোর শাসন, আদরের নাম গন্ধ ছিল না বুড়োর ব্যবহারে, মুখ খুললেই কড়া কথা; অথচ কী অফুরন্ত স্নেহের ফল্গুধারা ছিল অন্তরে, নিজের অজান্তেই প্রকাশ পেয়ে যেত রানার কাছে, বোধহয় বুঝতেও পারত না বুড়ো। ঝাপসা হয়ে আসছে রানার চোখ দুটো।

ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠল টেলিফোন। পঁচিশে মার্চ, উনিশ শো একাত্তুর। রাত দশটা।

সারাদিন বাড়িতেই ছিল। কেমন যেন দম-বন্ধ আবহাওয়া ছিল সেদিন। কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছিল না। সব ঘোলাটে, সব গোলমেলে। অস্থির পায়ে অন্ধকার বারান্দায় পায়চারি করছিল রানা। টেলিফোনের শব্দে থমকে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল শোবার ঘরের দিকে।

'রানা বলছ?' গম্ভীর শান্ত কণ্ঠ রাহাত খানের।

'জ্বি, স্যার।' সটান সোজা হয়ে গেল রানার শিরদাঁড়া নিজের অজান্তেই।

'শোনো। এক্ষুণি বেরিয়ে পড়ো বাড়ি থেকে। ভয়ানক গোলমাল হতে যাচ্ছে।' ধ্বক করে উঠল রানার বুকের ভিতরটা। শান্ত কণ্ঠস্বর বলেই চলল, 'একটু আগে জানতে পেরেছি, উন্মাদের মত কাণ্ড করতে যাচ্ছে পাকিস্তান আর্মি আজ রাতে। এটা ঠেকাবার কোন উপায় নেই। ইয়াহিয়া চলে গেছে ঢাকা ছেড়ে। লক্ষ লক্ষ নিরীহ নিরস্ত্র মানুষ খুন করে বাঙালীর মেরুদণ্ড চিরতরে ভেঙে দেয়ার প্ল্যান নিয়েছে ওরা। আজ রাত বারোটায় শুরু হবে নির্বিচার গণহত্যা। ট্যাঙ্ক নামবে আজ ঢাকার রাস্তায়। কল্পনা করতে পারো? আগামী পনেরো মিনিটের মধ্যেই তোমার বাসা ঘেরাও করা হবে। কাজেই বেরিয়ে পড়ো এক্ষুণি।'

দ্বিগুণ হয়ে গেছে রানার হার্টবিট। একী পাগলামি!

'আমি···মানে, কি করতে হবে আমাকে, স্যার?'

'রুখে দাঁড়াতে হবে। এ-ও কি তোমাকে শিখিয়ে দিতে হবে নাকি?' ধমক দিলেন মেজর জেনারেল। পর-মুহূর্তে আবার শান্ত হয়ে গেল কণ্ঠস্বর। 'হার মানবে না। কিন্তু বোকার মত মারা পোড়ো না। বাঙালীকে এভাবে দমিয়ে দিতে পারবে না ওরা। যুদ্ধ করতে হবে তোমাকে। সীমান্ত অতিক্রম করবার চেষ্টা করো, ওরা আমাদের পাশে থাকবে এবার। আরেকটা কথা, অফিসের প্রত্যেককে টেলিফোনে জানিয়ে দিয়েছি আমি, সবশেষে তোমাকে জানালাম, কিন্তু রেহানাকে পেলাম না ফোনে। বোধ হয় ওর টেলিফোনটা খারাপ। যদি পারো, ওকে সাবধান করে দিয়ো। রেখে দিচ্ছি, বেরিয়ে পড়ো বাড়ি থেকে।'

'কিন্তু স্যার···' বাধা দিল রানা, 'আপনার কি হবে? আপনার বাড়িও তো ঘেরাও করবে ওরা···

'আমি ঘেরাও হয়েই আছি। জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, এগিয়ে আসছে ওরা ক্রল করে। রেযিস্ট্যান্স আশা করছে বোধহয়। আর তিন মিনিটের মধ্যেই এ ঘরে পৌঁছে যাবে ওরা। আমি ঠিকই থাকব, আমার জন্যে ভেব না, তুমি বেরিয়ে পড়ো···'

'আমি আপনার ওখানে আসছি, স্যার।' ফোন নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল রানা, রিসিভারে মেশিনগানের আওয়াজ শুনতে পেয়ে ঝট্ করে কানে তুলল আবার। গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছে পাকিস্তান আর্মি।

'না।' শান্ত শীতল রাহাত খানের কণ্ঠ। 'আমাকে বন্দী করবার ক্ষমতা ওদের নেই। তুমি রেহানাকে বাঁচাবার চেষ্টা করো। দিস ইজ মাই লাস্ট অর্ডার।' আবার মেশিন গানের শব্দ। লাইন কেটে গেল টেলিফোনের।

বোবা রিসিভারটা কানে চেপে রাখল রানা দুই সেকেন্ড, কান থেকে সরিয়ে ভুরু কুঁচকে চাইল একবার ওটার দিকে, তারপর দড়াম করে রেখে দিল ক্রাডলে। আধ মিনিটে পরে নিল রানা গাঢ় নেভি ব্লু ট্রপিক্যাল স্যুট, শোলডার হোলস্টারে যত্নের সাথে ভরে নিল নাইন এম. এম. ল্যুগারটা, দুটো এক্সট্রা ক্লিপ রাখল প্যান্টের পকেটে। গোখলেস আর রাঙার মার হাতে এক থোক টাকা তুলে দিয়ে দু'এক কথায় বুঝিয়ে দিল কি করতে হবে, তারপর চোরের মত বেরিয়ে গেল নিজের বাসা থেকে, পায়ে হেঁটে।

কিছুদূর গিয়েই দুটো জীপ দেখতে পেল রানা। হেড লাইট নিভিয়ে ধীর গতিতে আসছে এদিকে। লুকিয়ে গেল রানা একটা বাড়ির সীমানা-দেয়ালের আড়ালে। রানার বাড়ির সামনে থামল জীপ দুটো। চায়নিজ স্টেন হাতে রাস্তায় নামল দশ-বারোজন, নিঃশব্দে ফ্যান-আউট করল, ঘিরে ফেলল বাড়িটা। মিনিট দুয়েক পরই

গুলির শব্দ এল।

দাঁত কিড়মিড় করল রানা। ইচ্ছে হলো ছুটে যায়, যে কটাকে পারে হত্যা করে মনের ঝাল মেটায়। কিন্তু রেহানার ওখানে যেতে হবে। ওরই অফিস সেক্রেটারি নাসরীন রেহানা। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে হাঁটতে শুরু করল রানা দ্রুত পদে।

কি হলো? এরকম হয়ে গেল কেন? কি দোষ করেছে ও পাঞ্জাবীদের কাছে? বাঙালী হওয়াটাই কি অপরাধ? এতদিন স্বদেশ মনে করে যে পাকিস্তানকে সে ভালবেসেছে, দেশের জন্যে একবার নয়, দুবার নয়, বহুবার নিজের জীবন বিপন্ন করেছে, মৃত্যুর মুখোমুখি চলে যেতে ইতস্তত করেনি—সে সবই কি ভুয়ো, মিথ্যে? দেশটা কার? কার দেশকে ভালবেসে জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য করেছে সে বারবার? কার সমর্থনে এতদিন কাজ করেছে সে? এদেশ যদি ওর হবে, ওকে খুন করতে চাইছে কেন পাঞ্জাবীরা?

ধিক্কার এল রানার অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে। পুঁজিপতি আর স্বার্থান্বেষী ক্ষমতাচক্রের হাতে পুতুল নাচ নেচেছে সে এতদিন। খেলানো হয়েছে ওকে। চোখে দেশপ্রেমের ঠুলি বেঁধে দিয়ে ওর সততাকে ন্যাক্কারজনক ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে ক্ষমতাসীন সরকারের কুৎসিত স্বার্থোদ্ধারে। ভুলিয়ে ভালিয়ে কাজ আদায় করে নিয়েছে এতদিন। আজ সমমর্যাদার দাবি তুলতেই চোখ উল্টে নিল কি সহজে।

'শুয়োরের বাচ্চা! মনের আক্রোশে গাল দিল রানা বিড়বিড় করে। কাকে গাল দিল বুঝতে পারল না সে নিজেই। পাকিস্তানকে? ইয়াহিয়াকে? ভুট্টোকে? না নিজেকে?

তন্দ্রা কেটে গেল রানার। একটা ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম সাজিয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকল সোহানা। খাটের পাশে টিপয়ের উপর রাখল ট্রেটা। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে কাছে এগিয়ে বসল। সাদাসিধে করে পরেছে সোহানা। লাল-হলুদ ছাপা একখানা সুন্দর ক্যালি সিল্কের শাড়ী। হলুদ ব্লাউজ। চুলগুলো এলো খোপায় বাঁধা, কয়েকগুচ্ছ চুল কপালে এসে পড়েছে, লাল টিপটা খুব সুন্দর লাগছে তাই। অপরূপ দুই আয়ত চোখ মেলে রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে গাঙচিলগুলোকে দেখল সে কিছুক্ষণ। চুপচাপ। তারপর বলল, 'কি ভাবছ, রানা?'

'ভাবছি, কেবল চাকরির জন্যে যদি চাকরি করতাম তাহলে বড় ভাল হত। আজ এত চিন্তা ভাবনায় জর্জরিত হতে হত না। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করেছি বলে এখন প্রশ্ন আসছে, কি করেছি এতদিন, কোন্ দেশের প্রেমে পড়েছিলাম, এই প্রেমের মূল্য কি? শুধু যদি চাকরি করতাম, আজ নিজেকে এরকম প্রবঞ্চিত মনে হত না।'

'তুমি নিজের ঘাড়ে এভাবে টানছ বলেই এত খারাপ লাগছে। সবাইত এই একই ভুল করেছিল। এখনও এই ভুলেরই মোহে কাজ করছে পাকিস্তানে বিশ্বাসী কিছু লোক, গোপনে ষড়যন্ত্র করছে, বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে চাইছে তোমাকে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ তুমি, প্রবঞ্চনার প্রতিশোধ নিয়েছ, তুমি এত ভাবছ কেন?'

'যুদ্ধ শেষ হয়নি এখনও, সোহানা। পঁচিশে মার্চের পর দেশ স্বাধীন না করে উপায় ছিল না, তাই স্বাধীন করেছি। প্রথম পাট চুকেছে। কিন্তু আসল যুদ্ধ বাকিই রয়ে গেছে আমাদের। এবার আর আগের মত আফিম খাওয়াতে পারবে না আমাকে কেউ। এবার বুঝে গেছি, দেশ মানে শুধু একখণ্ড জমি নয়, মানুষ। দেশপ্রেম মানে শুধু জমিটা রক্ষা করা নয়; অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও শৃঙ্খলের হাত থেকে দেশের মানুষকে রক্ষা করা। দেশটাকে আবার মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সম্পত্তি হতে দেয়া চলবে না। অনেক ঠকেছি, আর ঠকতে চাই না।'

'রাজনীতিতে নামবে নাকি?' কাপে চা ঢেলে এগিয়ে দিল সোহানা।

'রাজনীতি আমার জন্যে নয়। আমার লাইনে কাজ করব আমি।'

'চাকরিতে যোগ দিচ্ছ না তাহলে?'

'না। একটা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি খুলব। মানুষের কাছাকাছি থাকতে চাই আমি। সাধারণ মানুষের সুখে, দুঃখে, সমস্যায় জড়াতে চাই নিজেকে। বি. সি. আই.-এর একটা অনুভূতিহীন যন্ত্র হিসেবে রাজা উজির মারার শখ আর নেই।'

'সোহেল সাহেব ছাড়লে তো!'

'সোহেলের সাধ্য নেই আমার মত পাল্টায়।'

'আমাকে নেবে সাথে?'

'গাছে কাঁঠাল গোপে তেল দিয়ে লাভ আছে কিছু?' চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আড়মোড়া ভাঙল রানা।

'আছে। আমি এখনি জানতে চাই আমাকে নেয়া হচ্ছে কিনা। কথা পাকা করে রাখতে চাই।'

'তোমার মিলগুলো চালাবে কে? বাবা নেই, তার ব্যবসা বাণিজ্য দেখে শুনে বুঝে নিতে হবে না তোমাকে?'

'বারে! তুমি জানো না? ব্যবসা তো আমিই দেখাশুনা করতাম। বাবা থাকতেও।' রানার মনে পড়ল বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বিলেতী ডিগ্রী আছে সোহানার, কার কাছে যেন শুনেছিল।

'কাজেই সময় নেই তোমার।' বলল রানা।

'আমার সময় নেই মানে? পি. সি. আই.-এ চাকরি করতাম না আমি? কাজ

তো চালাবে ম্যানেজার। আমি দিনে একঘণ্টা দেখলেই যথেষ্ট। আজে বাজে না বকে আমাকে নিচ্ছ কিনা বলো।'

'না।'

'কেন?'

'তোমাকে নিলে মহিলা ক্লায়েন্টগুলো হারাব।'

'কিন্তু পুষিয়ে যাবে। পুরুষ ক্লায়েন্ট বাড়বে।'

হাসল রানা। বলল, 'তাতে আমার ক্ষতি। তোমার গুণপনায় মুগ্ধ হয়ে ওদের একজন কেটে পড়বে তোমাকে নিয়ে।'

'না। ঠাট্টা নয়। আমাকে নিচ্ছ না?'

'না। সত্যিই অসুবিধা আছে। তুমি বি. সি. আই.-এ যোগ দাও আবার। ওখানে তোমার প্রয়োজন আছে।'

'ঠিক আছে, তুমি যদি বলো, ওখানেই না হয় যোগ দেব। ভয় হয়, তোমাকে একা ছেড়ে দিলে হারিয়ে যাবে হঠাৎ একদিন।' উঠে গিয়ে বাতিটা জ্বেলে দিল সোহানা।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। লেকের ধারে একজোড়া নারকেল গাছের মাথায় নরম রোদ ছিল এতক্ষণ, আবছা হয়ে মিলিয়ে গেল সেটা। ছিপ্ গুটিয়ে শূন্য হাতে চলে যাচ্ছে মাছ-শিকারী। গাঙচিলগুলো ঘরে ফিরে গেছে।

জানালার পর্দাগুলো টেনে খাটের পাশে এসে বসল সোহানা। 'আজ রাতে কোথাও বেরোচ্ছ মনে হচ্ছে?'

'কি করে বুঝলে?'

'সারাদিন বিছানায় গড়াগড়ি করতে দেখে তাই মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ। যাচ্ছি।'

এ ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন করল না সোহানা। কিছুক্ষণ চুপ চাপ বসে থেকে হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, রেহানা কোথায় বলতে পারো?'

'পারি।'

'কোথায়?'

'পঁচিশ তারিখে আমি যখন ওর বাসায় গেছিলাম তখন রাত দশটা পঁচিশ। দোতলায় থাকত ও। বাড়িটা ঘেরাও হয়ে গেছে ততক্ষণে। সোজাসুজি ঢোকার রাস্তা না পেয়ে পিছন দিকের পাইপ বেয়ে দোতলার জানালা পর্যন্ত উঠলাম। দেখলাম, কিছুই করবার নেই, অনেক দেরি হয়ে গেছে তখন। ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড। চেয়ারটা উল্টে পড়ে আছে। ঘরের ভিতর ছয়-সাতজন পাঞ্জাবী সেনা। সম্পূর্ণ উলঙ্গ রেহানা হামাগুড়ি দিয়ে ওর সাদা ভ্যানিটি ব্যাগটার কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করছে। ছোট্ট একটা পিস্তল রাখত ও ভ্যানিটি ব্যাগে। সারা শরীরে

মারের চিহ্ন। উষ্কখুষ্ক চুল। রক্ত ঝরছে সর্বাঙ্গ থেকে। বুকে কামড়ের দাগ। একটা বুকের চুড়ো কামড়ে তুলে নিয়েছে। রেপ করেছে কয়েকজন।'

'ইশ্‌শ্‌!' কুঁচকে গেল সোহানার মুখটা।

'দড়াম করে লাথি মারল একজন ওর পিছন দিকে। লাথির ধাক্কায় ব্যাগটার কাছে পৌঁছে গেল সে। পিস্তলটা বেরও করল, কিন্তু ঠিক তখনি পাশ থেকে বেয়োনেট চার্জ করল একজন ওর তলপেটে, একটানে চিরে দিল পাঁজরা পর্যন্ত। আরেকজন স্টেনগানের পুরো একটা ম্যাগাজিন নিঃশেষ করল ওর ওপর। তারপর মরা রেহানার মুখের উপর...'

'উহ্‌! থামো, প্লীজ!' রানার মুখ চেপে ধরল সোহানা। দুই গাল বেয়ে পানি পড়ছে অঝোরে। দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল এক মিনিট। তারপর হঠাৎ 'আসছি,' বলে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে দ্রুত পায়ে।

কিন্তু মুখে হাত চাপা দিয়ে তো আর চিন্তা থামানো যায় না। জলজ্যান্ত ভাসছে সব ছবি রানার চোখের সামনে। নাহ্‌, কিছুই করতে পারেনি রানা। কাজ শেষ করার সাথে সাথেই ঘর ছেড়ে চলে গেছে পাক-সেনা। কার্নিস বেয়ে ব্যালকনির রেলিং টপকে যখন ও রেহানার ঘরে পৌঁছেছে, তীব্র করডাইটের গন্ধ সারা ঘরে। তখনও উত্তপ্ত রেহানার মৃতদেহ। রাইটিং টেবিলে একটা অসমাপ্ত দরখাস্ত, কলমটা পড়ে আছে পাশে, খোলা। ছুটির দরখাস্ত। ছুটি চাইছিল নাসরীন রেহানা রানার কাছে।

বিছানার দুধ-সাদা চাদরটা দিয়ে ঢেকে দিয়েছিল রানা রক্তাক্ত মৃতদেহটা। মেজর জেনারেলের শেষ আদেশ পালন করতে পারেনি সে। বাঁচাতে পারেনি রেহানাকে। নয়মাসে অসংখ্য পাক-সেনাকে হত্যা করেছে, তবু মনে হয় উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে পারেনি সে রেহানার মৃত্যুর।

পঁচিশের সারাটা রাত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছে রানা ব্যারিকেডের পর ব্যারিকেড ডিঙিয়ে। নিজ চোখে দেখেছে পাঞ্জাবীদের নির্বিচার গণহত্যা। নিজ চোখে দেখেছে রাজারবাগের পুলিস আর পিলখানার ই. পি. আর. নিধন। খুন চেপে গেছে মাথায় জগন্নাথ হল হত্যাকাণ্ড দেখে। কিন্তু পাকিস্তান আর্মির ক্ষমতা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল সে। এখন বিচ্ছিন্ন ভাবে বাধা দিলেই অনর্থক মৃত্যু। এদের উচিত শিক্ষা দেয়ার সময় আসেনি এখনও।

ভোর রাতে পৌঁছেছিল রানা মেজর জেনারেলের বাড়িতে। রাহাত খানের ভয়ঙ্কর দর্শন কালো হাউন্ডটা মরে পড়ে আছে সিঁড়ির উপর। দেয়ালের গায়ে মেশিনগানের গুলির দাগ। বাড়ির ভিতরটা ধ্বংসস্তূপ। জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে স্টাডিরুমটা। প্রত্যেকটা ঘরে গ্রেনেড ফাটানো হয়েছে। মেজর জেনারেলের ত্রিশ বছরের পুরানো ব্যাটম্যান শমশেরকে পাওয়া গেল ডাইনিং রুমে। হৃৎপিণ্ডের কাছে তিন ইঞ্চি গর্ত এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছে। বেসিনের নিচের ড্রেন পর্যন্ত চলে গেছে

রক্তের স্রোত, শুকায়নি এখনও, থকথকে হয়ে জমে রয়েছে জায়গায় জায়গায়।

মেজর জেনারেলকে পাওয়া গেল না কোথাও। টেলিফোনের কাছে কার্পেটের উপর কয়েক জায়গায় রক্তের ছোপ, ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার চিহ্ন। একপাটি স্লিপার। রানার উপহার দেয়া রনসন লাইটারটা পাওয়া গেল দরজার কাছে পাপোশের কিনারে। আর পাওয়া গেল রক্তে ভেজা দুমড়ানো একটা সাদা রুমাল—রুমালের কোণে সোহানার নিজ হাতে সেলাই করা দুটো ইংরেজী অক্ষর, আর. কে.। জন্মদিনের প্রেজেন্টেশন।

মাথার মধ্যে ঘূর্ণিঝড় চলল কয়েক সেকেন্ড। ঘুরছে মাথাটা। কেমন যেন শূন্য মনে হচ্ছে সবকিছু। সব নিরর্থক।

মিথ্যে কথা বলল কেন বুড়ো? কেন বলল আমার জন্যে ভেব না, আমি ঠিকই থাকব? প্রশ্নটা মনের মধ্যে উদয় হওয়ার সাথে সাথেই উত্তর পেয়ে গেল রানা। শেষ পর্যন্ত নিজের কথা ভাবেনি মানুষটা। রেহানার কথা ভেবেছে। অধীনস্থ কর্মচারীদের প্রতি দায়িত্ব পালন করেছে। তিরিশ জনকে টেলিফোনে সাবধান করে দেয়ার জন্যে অন্তত তিরিশটা মিনিট ব্যয় করেছে মেজর জেনারেল রাহাত খান। পালিয়ে গিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করেনি। টনটন করছে রানার বুকের ভিতরটা। কেন জানি জ্বলছে চোখ দুটো। বালি ঢুকেছে নাকি! টপ্‌টপ্ পানি পড়ছে খালি। ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে সবকিছু।

কাঁধের উপর হাতের স্পর্শ। ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল রানা। সোহেল দাঁড়িয়ে। চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল, পাপড়ি ভেজা। জোর করে মুখে হাসি টেনে আনল সোহেল, 'কাঁদছিস কেনরে শালা। মেয়ে মানুষ নাকি তুই?'

'তুই কাঁদছিস কেন?'

উত্তর দিল না সোহেল। মুখ ঘোরাল। টপ টপ করে দুই ফোঁটা গরম পানি পড়ল রানার বাহুর উপর। না, সোহেলও কাঁদছে না। ওরা কাঁদবে কেন? ওরা তো ট্রেইন্‌ড্ এসপিওনাজ এজেন্ট। মানুষ হত্যা করার নিষ্ঠুর যন্ত্র বিশেষ।

ভোর হয়ে আসছিল। সোহেল বলল, 'চল্ পালাই। এখানে থাকা নিরাপদ নয়।'

'চল্।'

অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে পা বাড়াল অকুতোভয় দুই বন্ধু। প্রতিশোধ নেবে ওরা।

আট

ঢাকার কোন একটি অভিজাত এলাকায় লেকের পাড়ে একটি দ্বিতল বাড়ি। কোন একটি বিদেশী মিশনের কোন একজন অতি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার বাসস্থান। বাড়িটা সুরক্ষিত। উঁচু দেয়াল, দেয়ালের উপর কাঁটা তারের বেড়া। বাইরে থেকে দেখলে বোঝার উপায় নেই যে দু'হাজার ভোল্টের ভয়ঙ্কর বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলেছে ওই তারগুলোর মধ্যে। বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় মাটির তলায় একটি ঘরে রাখা শক্তিশালী জেনারেটার থেকে। নিঃশব্দে কাজ করে জেনারেটার, কাজেই সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

দোতলার একটা লম্বা হল ঘর। জরুরী অধিবেশন চলেছে সে ঘরে। লম্বা লম্বা তিনটি সারিতে সাজানো চেয়ারে বসেছে দশজন করে মোট ত্রিশজন। বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন বয়সের লোক। বেশির ভাগই বাঙালী, কিন্তু অবাঙালীও আছে কয়েকজন। কয়েকজনের শরীরের কাঠামো ও চুলের ছাঁট দেখলেই পরিষ্কার বোঝা যায় পাকিস্তান আর্মির লোক। হলের শেষ প্রান্তে একটা ছোট্ট ডায়াসের উপর চেয়ার টেবিল নিয়ে বসে আছেন সভাপতি মাওলানা ইকরামুল্লাহ। মাওলানা সাহেব বাঙালী। এলোমেলো মাথার চুল, থুতনিতে এক মুঠো দাড়ি, হলদেটে চোখ দুটো উদভ্রান্ত। গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতা ঠিকরে বেরোচ্ছে সে-চোখ থেকে। কিন্তু সেই সাথে প্রকাশ পাচ্ছে বজ্র কঠিন সংকল্পও। একনজরেই বোঝা যায়, এই লোক প্রয়োজন বোধে নিষ্ঠুরতার চরমতম পর্যায়ে চলে যেতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না।

সভাপতির পাশের চেয়ারটিতে উপবিষ্ট বাড়িটির বিদেশী ভাড়াটিয়া। এই লোক পৃথিবীর বৃহত্তম ও হীনতম স্পাই সংস্থার পঞ্চম ব্যক্তি। প্রকাণ্ড শরীরের কাঠামো, তীক্ষ্ণ চোখ দুটি সর্বদাই চঞ্চল, সদা সতর্ক। প্রখর বুদ্ধি ঠিকরে বেরোচ্ছে চোখ দুটি থেকে। একটু যেন বিচলিত দেখাচ্ছে বিদেশীকে।

সভাকক্ষে পিন পতন স্তব্ধতা। চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলো।

ছোট্ট এক টুকরো কাগজ হাতে তুলে নিলেন মাওলানা সাহেব। তারপর একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বিশুদ্ধ উর্দুতে শুরু করলেন বক্তৃতা। ভরাট গমগমে কণ্ঠস্বর।

'আজকের এজেন্ডা হচ্ছে: এক—আমাদের আদর্শ সম্পর্কে সামগ্রিক একটি সাধারণ আলোচনা, দুই—সংস্থার কার্যকলাপের অগ্রগতি পর্যালোচনা, এবং তিন—অযোগ্য ব্যক্তি দূরীকরণ।' কথার তালে তালে থুতনির দাড়িগুলো লাফাচ্ছিল, কথা বন্ধ হতেই সেগুলোও থেমে গেল। এক এক করে সবার মুখের দিকে তীব্র

দৃষ্টিতে চাইলেন মাওলানা ইকরামুল্লাহ। ঝন ঝন করছে মাওলানার বাজখাঁই কণ্ঠস্বর প্রত্যেকটি শ্রোতার কানে। দ্বিতীয় সারির পঞ্চম ব্যক্তিটির কলজেটা কেঁপে উঠল কেন জানি। কিছু গোলমাল হয়ে যায়নি তো?

'আমরা কাজ করছি দুইটি মহান আদর্শের অনুপ্রেরণায়। আমাদের আদর্শ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা, আর টুকরো হয়ে যাওয়া পাকিস্তান আবার কায়েম করা, যে পাকিস্তান আমরা হাসিল করেছিলাম হাজার হাজার শহীদের লোহুর বিনিময়ে, কায়েদ আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নার সেই পাকিস্তান এইভাবে ভেঙে টুকরো করার অধিকার কারও নেই। পাকিস্তান এক এবং অখণ্ড। টিকে থাকার জন্যেই জন্ম হয়েছিল এর। সমস্ত হীন চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছি আমরা, হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ্যবাদের বিষাক্ত প্রভাব থেকে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান ভাইদের রক্ষা আমরা করবই। নির্লজ্জ হিন্দুস্থানী হামলার মুখে আমাদের বীর সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু আমরা বেঁচে আছি, মুক্ত আছি। সারা পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন ভাবে জড়িয়ে আছেন আমাদের কয়েক লক্ষ মুজাহিদ। ঈমান, একতা ও শৃঙ্খলার আদর্শে মহীয়ান। আদর্শের জন্যে প্রয়োজন হলে হাসিমুখে শাহাদত বরণ করবেন তাঁরা, তবু পরাজয় বরণ করবেন না। আমাদের কাজ হচ্ছে তাঁদের সংগবদ্ধ করা, অনুপ্রাণিত করা। আপনারা জানেন, আমাদের বন্ধু রাষ্ট্রের সময়োপযোগী সাহায্যের ফলে অস্ত্রশস্ত্রের অভাব আমাদের নেই। কিন্তু এই অস্ত্রশস্ত্র যথাস্থানে ঠিকমত সরবরাহ করতে হবে। প্রতিটি শহর, প্রতিটি মহকুমা, প্রতিটি থানা, এমন কি প্রতিটি গ্রামে গড়ে তুলতে হবে আমাদের আন্দোলন ও প্রতিরোধ কেন্দ্র। সামনে আমাদের কাজ অনেক। শত্রু অনেক। কিন্তু সময় কম। নাম নেহাদ বাংলাদেশ সরকারকে ভাল করে গুছিয়ে বসবার সুযোগ দিলে চলবে না, শিশু অবস্থাতেই শেষ করে দিতে হবে এইসব হিন্দুস্থানীয় দালালদের। পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের সাথে সরাসরি অয়্যারলেসে যোগাযোগ রয়েছে আমাদের, তাঁরা বুদ্ধি দিয়ে উপদেশ দিয়ে, সাহায্য করছেন। বিদেশের বন্ধু রাষ্ট্রগুলোরও সব রকমের সাহায্য আমরা পাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু নিজেদের কাজ করতে হবে আমাদের নিজেদেরই।

'ভাইসব। আমাদের কাজ বিভিন্নমুখী। প্রথম কাজ নিজেদেরকে শক্তিশালী ও সংহত করা। দুঃখের বিষয়, আমাদের আল-বদর ভাইয়েরা তাঁদের কাজ সম্পূর্ণ করার আগেই হিন্দুস্থানী ফৌজের সাম্রাজ্যবাদী হামলার মুখে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছেন আমাদের বাহাদুর জওয়ানরা। তাঁদের সেই অসম্পূর্ণ কাজ হাতে তুলে নিয়েছি আমরা। খুবই সতর্কতার সাথে কাজ করতে হচ্ছে আমাদের। বাধা আসছে প্রতিপদে। তথাকথিত মুক্তি যোদ্ধাদের জ্বালায় ব্যাহত হচ্ছে আমাদের কাজ প্রতিপদে। ফলে দ্রুত কিছুই করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু দৃঢ় নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা অভীষ্ট সিদ্ধির পথে। কারণ, আল্লাহ্ আমাদের সহায়।

'জনমনে অসন্তোষ সৃষ্টির কাজে নিযুক্ত আছেন আমাদের একটি উপদল। নিপুণভাবে কাজ করছেন এঁরা। সন্দেহ, অনিশ্চয়তা আর বিক্ষোভের বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছেন সর্বস্তরের মানুষের ভিতর। ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে দাঙ্গা ও গোলমাল বাধানোর দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন নিষ্ঠার সাথে। আরেক দল খাদেম নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে তোলার কাজে ব্যাপৃত আছেন—অতিসত্বর চালের দাম একশো টাকায় দাঁড়াবে। আপনাদের এই উপদলের উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে আমাদের আদর্শে বিশ্বাসী নয় এমন সমস্ত নেতৃস্থানীয় দালালদের একে একে খতম করা। বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন সমস্ত শক্তির মূলোৎপাটন করতে হবে আপনাদের। আপনারা কে কতটা সাফল্য অর্জন করেছেন সে প্রশ্নে আসছি আমি একটু পরেই।

'ইতিমধ্যেই অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছি আমরা। বিভিন্ন এলাকা থেকে সাফল্যের খবর আসছে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুঃখজনক ভাবে নিদারুণ ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েছি আমরা। আমাদের বেশ কিছু কর্মী ধরা পড়েছেন তথাকথিত মুক্তি বাহিনীর হাতে। মারা গেছেন অনেকে। মরতে আমরা ভয় পাই না। কওমের জন্যে, ইস্‌লামের জন্যে শাহাদাত বরণ করা গৌরব ও সৌভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু অযথা মৃত্যু আমাদের আদর্শ বাস্তবায়ন পিছিয়ে দেবে। তাই আমাদের এত সাবধানতা। ভুল করার উপায় নেই আমাদের। কারণ আমাদের একজনের সামান্য ভুলে গোটা আন্দোলন বিপর্যস্ত হয়ে যেতে পারে, আমরা সবাই ধরা পড়ে যেতে পারি। সেই জন্যেই ভুলের জন্যে চরম শাস্তির বিধান রয়েছে আমাদের ম্যানিফেস্টোতে।

'আপনাদের প্রত্যেকের হাতে প্রথম কিস্তিতে দশজন করে শত্রুর ভার দেয়া হয়েছিল। প্রত্যেককে আলাদা ভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিল তার দায়িত্ব গত সপ্তাহেই। আপনাদের প্রত্যেকের রিপোর্ট আমি পড়েছি। আপনাদের প্রত্যেকের গতিবিধি ও কার্যকলাপের উপর আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছি গত সাতদিন। আপনারা কেউই পুরোপুরি কামিয়াব হতে পারেননি। গড়পড়তা সাফল্য শতকরা পনেরো ভাগ। কিন্তু তার জন্যে আমি আপনাদের সবাইকে দায়ী করব না, কারণ আপনারা চেষ্টার ক্রুটি করেননি। কিন্তু কেন আপনারা সন্তোষজনক কাজ করতে পারেননি সেটা বিচার করে দেখতে হবে আমাদের। রিপোর্ট দেখে বোঝা যাচ্ছে, আপনারা শতকরা আশিটি ক্ষেত্রেই যাকে হত্যা করার কথা, তাকে খুঁজে পাননি। আত্মগোপন করেছে আপনাদের শিকার। এর কারণ কি হতে পারে? নিশ্চয়ই কোন না কোন উপায়ে টের পেয়ে গেছে লোকগুলো আমাদের উদ্দেশ্য। কেউ সাবধান করে দিয়েছে ওদের। কে সেই ব্যক্তিটি? আপনাদের মধ্যে কেউ বলতে পারেন তার নাম?' দ্বিতীয় সারির পঞ্চম ব্যক্তিটির দিকে সরাসরি চাইলেন মাওলানা। 'জনাব হরমুজ আলী, আপনি বলতে পারেন?'

'মাসুদ রানা, হুজুর।' উঠে দাঁড়াল হরমুজ আলী।

'ঠিক বলছেন। পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের দুর্ধর্ষ এক স্পাই মাসুদ রানা। পঁচিশে মার্চের পর আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছিল। ভয়ঙ্কর ক্ষতি সাধন করেছে সে আমাদের। তার সম্পর্কে পুরো রিপোর্ট পেয়েছি আমরা রাওয়ালপিণ্ডি থেকে গত পরশু। সম্মুখ যুদ্ধে আমাদের অসংখ্য সৈন্যকে নিহত করেছে সে। পাঞ্জাবী ভাষায় অনর্গল কথা বলবার ক্ষমতা থাকায়, এবং সেনাবাহিনীর কোড সম্পর্কে ওয়াকেফ়হাল থাকায়, আমাদের এয়ার ফোর্সের সাথে মিথ্যা অয়্যারলেসে যোগাযোগ করে বোমা বর্ষণ করিয়েছে সে কসবা সেকটারে আমাদেরই দু'হাজার সৈন্যের উপর। আমাদের বাহিনীর অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অভিযান ব্যর্থ করে দিয়েছে সে এসপিওনাজের মাধ্যমে গোপন তথ্য সংগ্রহ করে। বহুবার কৌশলে ফাঁদে ফেলেছে সে পাক-বাহিনীকে, অতর্কিত আক্রমণে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে আমাদের বীর জওয়ানদের। এবং আপনাদের জানা আছে, শেষ কালে আমাদের এই গোপন সংস্থাতেও ঢুকে পড়েছিল সে। আমরা যখন টের পেয়ে ওকে বন্দী করবার চেষ্টা করলাম তখন খালিহাতে তিনজনকে হত্যা করে আমাদের কিছু কাগজপত্র ও তথ্যসহ পালিয়ে যায় সে। সে-ই সাবধান করে দিয়েছে অন্যান্য বিশ্বাসঘাতক দালালদের।' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকলেন মাওলানা ইকরামুল্লাহ। তেমনি দাঁড়িয়ে রয়েছে হরমুজ আলী। তাকে বসতে বলা হয়নি। কেমন এক অস্বস্তিতে ছেয়ে গেল তার মনটা। আবার মুখ খুললেন মাওলানা, 'লোকটা ভয়ঙ্কর। তাই তার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি আমি। এবং হত্যার ভার দিয়েছিলাম জনাব হরমুজ আলীকে। দুইবার ব্যর্থ হওয়ার পরও তাঁকে আমি আর একটি সুযোগ দিয়েছিলাম। জনাব হরমুজ আলী, আপনি কি তাকে হত্যা করতে পেরেছেন?'

'জ্বি হুজুর। কাল রাত সোয়া এগারোটায়...'

'সে সব আপনার রিপোর্টে আমি দেখেছি। আপনি সভার সবাইকে বলুন কিভাবে হত্যা করলেন তাকে। পূর্ণ বিবরণ পেশ করুন এই সভায়।'

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল হরমুজ আলী। অযোগ্য লোক দূরীকরণ বলতে তাকে বোঝানো হয়নি তাহলে। বরং তার সাফল্যকে সবার সামনে তুলে ধরে অন্যান্য সবাইকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতে চান মাওলানা। সম্পূর্ণ প্ল্যানটা খুলে বলল হরমুজ আলী। কিভাবে ফাঁদ পেতেছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিল। এ বাড়ির অধিকর্তা আদর্শের জন্যে কেবল সতীত্ব নয়, প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত, এমন একটি মেয়ে সংগ্রহ করে দিয়ে তাকে, তথা জাতিকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। সোফিয়ার রূহের মাগফেরাত কামনা করে বোমা বিস্ফোরণের বিবরণ দিল সে সবশেষে। সবাই অভিভূত হয়ে গেল এমন একটি সাফল্যের কাহিনী শুনে। হাত তুললেন মাওলানা। সভাকক্ষে আবার পিন পতন স্তব্ধতা।

'মাসুদ রানা ও সেই জানানা একসাথে মারা গেছেন?' প্রশ্ন করলেন মাওলানা।

'জ্বি হুজুর। দেড়টার সময় গিয়ে আমি নিজ চোখে লাশ দুটো দেখে এসেছি।'

'বেশ করেছেন।' একটা বেল বাজালেন মাওলানা। স্টেন হাতে একজন প্রহরী এসে দাঁড়াল দরজার সামনে। হাত নেড়ে কিছু একটা ইশারা করলেন তাকে মাওলানা, মাথা ঝাঁকিয়ে সেলাম জানিয়ে চলে গেল সে। 'কিন্তু যে দু'জনকে বোমাটা ফিট করার জন্যে পাঠিয়েছিলেন, তারা কোথায়?'

'ওদের খুঁজে পাচ্ছি না, হুজুর। আমার সাথে দেখা করার কথা ছিল, কিন্তু কেন যেন গা ঢাকা দিয়ে আছে ওরা। হয়তো দেখা...' থেমে গেল হরমুজ আলী মাওলানা সাহেবকে অসহিষ্ণু ভাবে হাত নাড়তে দেখে।

'ওঁদের সাথে একটু পরেই দেখা হবে আপনার জনাব হরমুজ আলী। ওঁরা বেহেস্তে আছেন। আপনি ওঁদেরই লাশ দেখে এসেছেন কাল রাতে।'

বজ্রপাত হলো যেন ঘরের মধ্যে। চমকে গেল হরমুজ আলী। হাঁ হয়ে গেল মুখটা। ঘরের সবাই অবাক হয়ে গেছে এই মন্তব্যে। ঢোক গিলবার চেষ্টা করল হরমুজ আলী। শুকিয়ে গেছে জিভ। কোন মতে বলল, 'হুজুর যা বলছেন, তা যদি সত্য হয়...'

'আমার কথার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ আছে নাকি আপনার? ফালতু কথা বলি না আমি। একমাত্র আল্লাহতায়ালার অস্তিত্বের বিষয়টি ছাড়া বিনা প্রমাণে কিছুই বিশ্বাস করি না, নিশ্চিত না হয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না—আমার ধারণা ছিল একথা আপনার জানা আছে।'

'আমি ঠিক সেভাবে...' থেমে গেল হরমুজ আলী। দু'জন প্রহরী ঢুকল ঘরে সোফিয়াকে নিয়ে। হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা, চুল উস্কখুস্ক, ঠোঁট দুটো সুই-সুতো দিয়ে সেলাই করা, কাপড় ছিঁড়ে গেছে জায়গায় জায়গায়, সেই ফাঁক দিয়ে নির্যাতনের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে সারা গায়ে। ঠেলতে ঠেলতে সোজা ডায়াসের উপর নিয়ে আসা হলো সোফিয়াকে। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল হরমুজ আলী। চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে ওর কপালে।

'এই জানানাই মারা গিয়েছিল মাসুদ রানার সাথে?' শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন মাওলানা।

কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল হরমুজ আলী, কিন্তু আওয়াজ বেরোল না গলা থেকে। থর থর করে কাঁপছে ওর সর্বাঙ্গ। আতঙ্কিত চোখে চেয়ে রয়েছে মাওলানার দিকে।

'আজ সকাল দশটায় ধরা পড়েছে এই জানানা। আজিমপুরে। একে যিনি কাজে নিযুক্ত করেছিলেন তিনিই ধরেছেন।' পাশের চেয়ারে বসা সাইমনের দিকে ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিত করলেন মাওলানা। 'মাসুদ রানা কোথায় তা জানা যায়নি এর কাছ থেকে অনেক চেষ্টা করেও। কথা যখন বলবেই না, তখন ঠোঁট সেলাই করে জবান বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এর।' এতক্ষণ সবার উদ্দেশে কথা বলছিলেন মাওলানা, এবার সরাসরি চাইলেন হরমুজ আলীর দিকে। 'আশা করি আমার কথার

সত্যতা সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ নেই আপনার মনে। বার বার তিনবার সুযোগ দিয়েছি আমি আপনাকে জনাব হরমুজ আলী। আপনি তিনবারই বিফল হয়েছেন। যার ফলে আমাদের এই উপদলের সাফল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে শতকরা মাত্র পনেরো ভাগ। আপনি শাস্তির জন্যে প্রস্তুত?'

'আর একবার···' ঢোক গিলে শুকনো কণ্ঠে বলল হরমুজ আলী, 'আর একটা সুযোগ···'

'দুঃখিত। আগেই বলেছি ভুল করবার উপায় আমাদের নেই। একটু ভুল হয়ে গেলেই অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। সেই জন্যেই কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা। আপনার ভুলে অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে আমাদের ইতিমধ্যেই। যদি সম্ভব হত, আপনাকে কেবল দায়িত্ব থেকে অপসারণ করেই আমরা ক্ষান্ত থাকতাম। কিন্তু দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকদের এমনিতে বিদায় দিলে গোপন সংস্থা বিপদগ্রস্ত হতে পারে। শুধু চোখ দুটো উপড়ে, কানের পর্দা ফাটিয়ে আর জিভ কেটে নিয়ে আপনাকে কানা-কালা বোবা করে ছেড়ে দিতে পারলেও আমি যার-পর-নাই খুশি হতাম। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। কারণ তাহলেও আপনার লেখার ক্ষমতা থেকে যাচ্ছে—এবং আপনার কাছ থেকে আমাদের এই সংস্থার পক্ষে ক্ষতিকর বা বিপজ্জনক তথ্য বেরিয়ে যেতে পারে। কাজেই আপনাকে আল্লাহ পাকের নামে কোরবানি দেয়াই স্থির করা হয়েছে। লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লা! জবেহ করবেন হাফেজ আলী মনসুর।'

পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে হরমুজ আলী। যেন শুনতে পাচ্ছে না কিছুই। ভুরু নাচিয়ে ইঙ্গিত করলেন মাওলানা। দুই পাশ থেকে দুইজন চেপে ধরল হরমুজ আলীর দুই হাত, টেনে নিয়ে গেল একটা অন্ধকার কুঠুরির দিকে। হাফেজ আলী মনসুর প্রকাণ্ড একটা গরু জবাই করা ছুরি হাতে চললেন পিছন পিছন। এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে প্রায় আঁতকে উঠল বিদেশী এজেন্ট। 'ওহ্ নো! দ্যাট্স্ ইন্হিউম্যান।'

মাওলানা সাহেব তার কাঁধে একটা মোলায়েম হাত রাখলেন মমতা ভরে। বললেন, 'ইট উইল সেট এ গ্লেয়ারিং এগ্যাম্পল, মাই ডিয়ার।'

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সবাই অন্ধকার ঘরটার দিকে। তিন ওয়াটের একটা লাল আলো জ্বলে উঠল ঘরটায়। ঝটপটির আওয়াজ এল ওঘর থেকে। দড়াম করে আছড়ে পড়ার শব্দ এল প্রায় সাথে সাথেই। কান খাড়া করে রাখল সবাই। অস্ফুট একটা ঘড় ঘড় আওয়াজ এল সবার কানে। বিশ সেকেন্ড পর হাফেজ সাহেবের সুরেলা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন!'

সবাই একসাথে বলে উঠল: ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। গম গম করে উঠল সারা ঘর।

'আমাদের অধিবেশনের প্রথমার্ধ শেষ হয়েছে। এখন নামাজ আদায়ের সময়।

আমাদের পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্যে আবার আলোচনা সভা বসবে বাদ মাগরেব। খোদা হাফেজ। পাকিস্তান পায়েন্দাবাদ।'

উঠে পড়লেন মাওলানা ইকরামুল্লাহ।

নয়

রাত সাড়ে এগারোটা।

তৈরি হয়ে নিয়েছে রানা। ওয়ারড্রোব থেকে গাঢ় ছাই রঙের একটা স্যুট বের করে পরেছে সে। সোহানার বাবার স্যুট। চমৎকার ফিট করেছে ওর গায়ে। কিন্তু বিরাট মাউযার পিস্তলটা পছন্দ হয়নি ওর। সাইলেন্সার লাগিয়ে ছোটখাট একটা কামানের সমান হয়েছে ওটা। বেল্টের নিচে গুঁজে নিয়েছে সে কামানটা, হাঁটতে গেলে খোঁচা লাগে ঊরুতে। সোহানাকে সাথে নেয়া ঠিক হচ্ছে কিনা ভাবতে যাচ্ছিল রানা, এমন সময় ঘরে এসে ঢুকল সে।

ঘরে ঢুকেই ভূত দেখার মত চমকে উঠল সোহানা। বিবর্ণ হয়ে গেল মুখটা। চোখ দুটো বিস্ফারিত। থমকে দাঁড়িয়েছে দোরগোড়ায়।

'কি হলো, সোহানা?' এগিয়ে গেল রানা।

'না, কিচ্ছু না।' তিন সেকেন্ডেই সামলে নিল সোহানা। রানার ডান হাতটা তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরল। 'দেখো, কি রকম ধুকপুক করছে। আমি মনে করেছিলাম বাবা দাঁড়িয়ে আছে।' হেসে উঠল সোহানা। হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলল, 'ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে একেবারে। যাক, চলো, তৈরি হয়ে নিয়েছ?'

রাজহংসের মত সাদা ডজ ভেসে চলল নির্জন পীচ ঢালা পথ বেয়ে গুলশানের দিকে। দক্ষ হাতে স্টিয়ারিং ধরে আছে সোহানা।

'মীরপুরে না ওদের আড্ডা ছিল?'

'ওখানে নেই। এ ব্যাপারে আমি শিওর। ষোলোই ডিসেম্বরের পর ওরা সরে গেছে অন্য কোথাও। কিন্তু কোথায় সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। আমার যতদূর বিশ্বাস সাইমনের গুলশানের বাড়িতে কিছু তথ্য পাওয়া যাবেই।'

'তুমি কি ওই বাড়িতে ঢুকবে এখন?'

'দেখি। কি করব ঠিক করিনি। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে। হয়তো কিছুই পাওয়া যাবে না ওখানে। তুমি ঠিক সাড়ে বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে আমার জন্যে। যদি এর মধ্যে না ফিরি, তাহলে সোহেলকে খবর দেবে।'

বিদেশী মিশনের সেই দোতলা বাড়ি থেকে আধমাইল দূরে লেকের ধারে সোহানাকে গাড়িটা থামাতে বলল রানা। একটা জনশূন্য অর্ধ-সমাপ্ত বাড়ির গেট

দিয়ে ঢুকে সীমানা-দেয়ালের আড়ালে থামল ডজ। রানার সাথে সাথে সোহানাও নামল গাড়ি থেকে।

'সাবধানে থেকো।' একসাথে বলল দু'জন কথাটা। দু'জনেই অবাক হয়ে গেল। হেসে উঠল তারপর একসাথে। সোহানার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল রানা।

আধখানা চাঁদ আকাশে। মাঝে মাঝে ঢাকা পড়ছে মেঘে, খানিক বাদেই হেসে উঠছে আবার ঝিক্ করে।

বাড়িটার দক্ষিণ ও পূর্ব দিকের দেয়ালের পর কয়েক হাত জমি, তারপরই লেক। উত্তরে রাস্তা। পশ্চিমে পর্ পর অনেকগুলো সুদৃশ বাড়ি। রাস্তার অপর দিকেও কয়েকটা প্রকাণ্ড লন-ওয়ালা বাড়ি। আশপাশের বেশ কয়েকটা বাড়িতেই আলো জ্বলছে, কোন বাড়ি থেকে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুর ভেসে আসছে, কোথাও হাসির হুল্লোড়—পার্টি চলছে। কিন্তু এই বাড়িটা অন্ধকার। লোহার গেট বন্ধ।

সামনে দিয়ে হেঁটে চলে গেল রানা একবার। মনে হচ্ছে জনশূন্য বাড়ি। পাততাড়ি গুটিয়ে ভাগল নাকি? দেয়ালের উঁপর কাঁটা তার দেখে সন্দেহ হলো রানার। এত উঁচু দেয়ালের উপর আবার কাঁটা তার কেন? ইলেকট্রিফায়েড?

কয়েকটা বাড়ি ছাড়িয়ে এসে বাম দিকে একটা সরু রাস্তা চলে গেছে দক্ষিণ দিকে। এই রাস্তার পুবে লেক, পশ্চিমে সারি সারি বাড়ি।

বাঁয়ে মোড় নিল রানা। তারপর রাস্তা ছেড়ে হাঁটতে শুরু করল পূর্ব দিকে লেকের পাড় ধরে। বাড়িটার পিছনে যেতে চায় সে। কোন কোন বাড়ির দক্ষিণ সীমানা একেবারে লেকের ঢাল পর্যন্ত চলে এসেছে। ফলে ঢালু পাড় ধরেই এগোল রানা। অসংখ্য ঝোপ ঝাড় ডিঙিয়ে অতি সন্তর্পণে দাঁড়াল সে তারকাঁটা ঘেরা বাড়িটার পিছনে এসে। নাহ্, জনমানুষের চিহ্ন নেই। প্রাণের কোন স্পন্দন টের পাওয়া যাচ্ছে না বাড়ির ভিতর। থমথমে, নীরব, নিস্তব্ধ। বাড়িটার পিছন দিকে একটা দরজা আশা করেছিল রানা, পাওয়া গেল দরজাটা, কিন্তু বন্ধ। ভিতর থেকে আটকানো। এ ছাড়া সোজা সাপটা দেয়াল, দেয়ালের উপর কাঁটাতার। মোটা একটা কাঁঠাল গাছ কোন এক ঝড়ে উপড়ে মরে পড়ে আছে লেকের মধ্যে। গাছের গোড়ায় গর্ত তৈরি হয়েছে একটা। গর্তটা ভাল মত পরীক্ষা করে মৃদু হাসল রানা। এদিকটায় লেকটা সরু হয়ে এসেছে, চল্লিশ-পঞ্চাশ হাতের বেশি হবে না চওড়ায়। ওপারে ঝোপ ঝাড় জঙ্গল। পোড়ো জমি। গাছের গুঁড়ির উপর উঠে বাড়ির ভিতরে নজর করার চেষ্টা করল রানা। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কোন ঘরের স্কাই লাইটের ফাঁক দিয়ে সামান্য আলোও না!

হয় কেউ নেই, নয়তো ঘাপটি মেরে আছে। পুব ও পশ্চিমের দেয়াল দুটোও পরীক্ষা করল রানা। তারপর উঠে এল বড় রাস্তায় চাঁদটা মেঘের আড়াল হতেই। আবার একবার বাড়িটার সামনে দিয়ে হেঁটে পশ্চিম দিকে চলে গেল রানা। লোহার

গেটটা ফাঁক হয়ে আছে হাত খানেক।

নিশ্চয়ই লোক আছে ভিতরে। কয়েকটা বাড়ি ছাড়িয়ে এসে আবার বাঁয়ে মোড় নিল রানা। এবার সোজা তিন চারশো গজ চলে গেল সরু রাস্তাটা ধরে। একটা কালভার্ট ডিঙিয়ে তারপর রাস্তা ছেড়ে বাঁয়ে মোড় নিল। বাড়িটার পিছন দিকে লেকের ঠিক অপর পারে পৌঁছুতে চায় সে। কোন গাছে উঠলে হয়তো দেখতে পাওয়া যাবে বাড়ির ভিতরটা।

ঝোপ-ঝাড় পাশ কাটিয়ে পোড়ো জমির উপর দিয়ে শ' দুয়েক গজ এগিয়েই ডানদিকে দেখতে পেল রানা তিনটে ছায়ামূর্তি। নিঃশব্দ পায়ে সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। ঝট করে পিছন ফিরল রানা। আরও তিনজন। সাবধানে এগোচ্ছে। বাঁয়ে চাইল রানা। আরও তিনজন। তিনদিক থেকে এগিয়ে আসছে ওরা। সামনে ছাড়া যাবার রাস্তা নেই রানার। আবছা আলোতেও লক্ষ করল রানা, প্রত্যেকটি লোকের ডান হাত বাঁ হাতের চেয়ে লম্বা।

ঠিক এই সময় চাঁদটা মেঘের আড়ালে চলে গেল। দৌড় দিল রানা। মাউযারটা চলে এল ওর ডান হাতে। একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ করল রানা তেমনি সন্তর্পণে কিন্তু নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে ছায়ামূর্তিগুলো। ডানদিকের দলটা সবচেয়ে কাছে চলে এসেছে। থেমে দাঁড়াল তিনজন? তিনটি ছোট্ট আগুনের হল্কা দেখতে পেল রানা। কোন শব্দ নেই। কোটের হাতা ধরে জোরে হেঁচকা টান দিল কে যেন। বাম বাহুর খানিকটা চামড়া ছড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা গুলি। তীক্ষ্ণ একটা জ্বলুনি অনুভব করল রানা জায়গাটায়।

পরপর তিনবার গুলিবর্ষণ করল রানার মাউযার ডানদিকের তিনজনের উপর। একটা গুলিও লাগল না কারও গায়ে, কারণ লাগাতে চায়নি রানা। শুধু দেখাতে চেয়েছে যে সে নিরস্ত্র নয়। কাজ হলো এতে। চট্ করে শুয়ে পড়ল ডানদিকের তিনজনই। সাবধান হয়ে গেছে বাকি দুটো দলও। একটা ঝোপের আড়াল থেকে দুটো আগুনের হল্কা দেখা গেল। দুটো গুলিই রানার দশ হাত দূরে পড়ল ঝোপের গায়ে। ঘাপটি মেরে রইল রানা কয়েক সেকেন্ড। চাঁদটা বেরিয়ে আসছে মেঘের আড়াল থেকে। আবার সংক্ষিপ্ত একটা দৌড় দিয়ে একটা আম গাছের আড়ালে দাঁড়াল। ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্। চারটে গুলি এসে লাগল গাছের গায়ে!

এবার ভয় পেল রানা। নয়টা গুলির মধ্যে চারটে যদি গাছের গায়ে লাগে, তাহলে ভয়ের কথা। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে পিছনের তিনজন ঝোপের আড়ালে আড়ালে। বেশ অনেকটা কাছে চলে এসেছে। দুটো খুলি ফুটো করল রানা। ঘুমিয়ে পড়ল দু'জন সবুজ ঘাসের উপর। তৃতীয়জন লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল একটা গাছের আড়ালে।

বামপাশের লোকগুলোকে দেখা যাচ্ছে না। আন্দাজে গুলি করল রানা ঐদিকে লক্ষ্য করে। তিনটে প্রত্যুত্তর এল। আগুনের হল্কা দেখে বুঝতে পারল রানা ছড়িয়ে

পড়ছে ওরা, অন্তত দশ হাত দূরে দূরে আছে ওরা এখন।

চাঁদটা আরেকবার মেঘের আড়ালে যেতেই দৌড় দিল রানা সামনের দিকে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ওরাও দৌড়াচ্ছে পিছন পিছন। থেমে দাঁড়িয়ে দুটো গুলি করল রানা, নতুন ক্লিপ ভরে নিল পিস্তলে। একজন হাঁটু ধরে বসে পড়েছে মাটিতে। গাছের গায়ে পিছলে কানের পাশ দিয়ে বোঁ করে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। আবার দৌড়াল রানা।

কিন্তু যাবে কোথায়? ঘিরে ফেলছে ওরা ক্রমেই। দূরত্ব কমে গেছে আশঙ্কাজনকভাবে। নিজের বোকামির জন্যে রাগ হলো রানার নিজের উপর। কুকুরের মত গুলি খেয়ে মরতে হবে এখন ওকে। এতলোককে একা ঠেকানো সম্ভব নয় কারও পক্ষেই। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আবার গুলি চালাল রানা। কারও গায়ে লাগল কিনা বোঝার উপায় নেই। ঝোপের আড়ালে রয়েছে ওরা। ঝোপগুলো দুলছে। এগিয়ে আসছে ওরা ক্রমেই। আবার দৌড়াল সে। বাড়িটার পিছনে লেকের অপর পাড়ে চলে এসেছে সে দৌড়াতে দৌড়াতে। কয়েকটা বড় বড় ঝোপ রয়েছে এদিকটায়, তারপরেই বেশ কিছুদূর ফাঁকা মাঠ, এবং মাঠের পরই লেক। একটা দশ ইঞ্চি ইটের আধখানা তুলে নিল রানা বাম হাতে। পুরো ম্যাগাজিনটা শেষ করল ঝোপঝাড়গুলোর উপর যত্রতত্র গুলি চালিয়ে। একটা শব্দ এল কানে—উফ্‌ফ্‌! কোমরে গুঁজে নিল পিস্তলটা। ডান হাতে ইট। অপেক্ষা করছে রানা চাঁদটা মেঘে ঢাকা পড়ার জন্যে।

নিজেদের সুবিধাজনক অবস্থাটা বুঝতে পেরেছে ওরা। তাই কোন ঝুঁকি নিচ্ছে না আর। মরতেই হবে রানাকে। আর পালাবার পথ নেই। অপেক্ষা করছে ওরা শেষ আঘাত হানবার জন্যে।

চাঁদটা ছোট্ট একটা মেঘে ঢাকা পড়ল। সামনের দিকে বাঁকা হয়ে ঝুঁকে প্রাণপণে দৌড় দিল রানা খোলা মাঠের উপর দিয়ে। গুপ্‌ গাপ, ধুপ্‌ ধাপ গুলি লাগছে আশপাশের মাটিতে। ওরাও ঝোপের আড়াল থেকে লাফিয়ে উঠে দৌড়াতে শুরু করেছে এখন। মাঠের মাঝামাঝি পৌঁছতেই চাঁদটা হেসে উঠল আবার। সামনে দৌড়ে চলল রানা এঁকে বেঁকে। কয়েকবার কাপড়ে হেঁচকা টান অনুভব করল রানা। লেকের পাড়ে পৌঁছেই হঠাৎ সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে দুই হাত শূন্যে ছুঁড়ল সে। ডান হাতের ইটটা ছিটকে গিয়ে থপাস্‌ করে পড়ল পানিতে। সাথে সাথেই দড়াম করে আছড়ে পড়ল সে মাটিতে। দুই সেকেন্ড পর হামাগুড়ি দিয়ে উঠে হাঁটু গেড়ে বসল সে, দুই হাত গলার কাছে, মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট্‌ করছে যেন। পরমুহূর্তে ঝপাং করে পানিতে পড়ল বাঁকা হয়ে। পড়ার সময় লম্বা করে একটা দম নিয়ে নিতে ভুলল না।

পানিতে পড়েই চমকে উঠল রানা। চমকে গিয়ে খানিকটা শ্বাস বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে। অসম্ভব ঠাণ্ডা পানি। মুহূর্তে হাত পা অসাড় হয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু

পানির গভীরতা দেখে অনেকখানি আশ্বস্ত হলো সে। সাত আট হাত পানি আছে এখানটায়। চুপচাপ পড়ে রইল সে মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে। এক সেকেন্ড দুই সেকেন্ড করে বিশ সেকেন্ড পার হয়ে গেল। লোকগুলোর চোদ্দগুষ্টি তুলে গাল দিতে শুরু করল রানা। আবছা আলো দেখতে পেল সে এবার। টর্চ জ্বেলে জায়গাটা পরীক্ষা করছে ব্যাটারা এখন। বড় বড় দুটো বুদ্বুদ ছাড়ল রানা অর্থাৎ দমটা বেরিয়ে গেল। দশ-বারো সেকেন্ড পরেই নিভে গেল আলোটা।

এবার সাঁতার কাটতে শুরু করল রানা। দম নেই বেশি, অথচ অন্তত চল্লিশ হাত অতিক্রম করতে হবে ওকে বাঁচতে হলে। কোট প্যান্ট আর জুতো খুলবার সময় নেই। আধাআধি আন্দাজ আসতেই বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা শুরু হয়ে গেল। টিপ টিপ করছে কপালের দুই পাশ। দাঁতে দাঁত চেপে প্রাণপণে সাঁতরে চলল রানা। উপড়ে পড়ে থাকা কাঁঠাল গাছটার আড়ালে গিয়ে আস্তে করে ভেসে উঠতে হবে। তারপর...তারপরের চিন্তা পরে, এখন ফেটে বেরিয়ে যাইতে চাইছে ফুসফুসটা। পাগলের মত হাত-পা ছুঁড়ছে রানা। আবছা ভাবে একবার মনে হলো সাবধান হওয়া দরকার। পানির নিচে কাঁঠাল গাছের কোন চোখা ডালের খোঁচা লেগে চোখ কানা হয়ে যেতে পারে। আবছা ভাবেই চেষ্টা করল সে একটু বাঁয়ে কাটার। কিন্তু তীর আর আসছেই না। অক্সিজেনের অভাবে নিস্তেজ হয়ে এসেছে দেহটা, হাত-পা চলতে চাইছে না, তার ওপর শীত। অসম্ভব ঠাণ্ডায় জমে যাবার জোগাড়। এবার মস্তিষ্কের আদেশ আর পালন করতে পারছে না হাত-পা।

কয়েক সেকেন্ডের জন্যে জ্ঞান হারাল রানা। ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে সে। কয়েক ঢোক পানি খেল সে নিজের অজান্তেই। হঠাৎ জ্ঞান ফিরে পেয়ে সচেতন হলো সে আবার। প্রাণ বাঁচানোর স্বাভাবিক তাগিদে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত চলতে শুরু করল আবার হাত-পা। ধীরে ধীরে এগোচ্ছে দেহটা। কিন্তু আর কতদূর? চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে যেতে চাইছে কোটর থেকে। ঘোলাটে ভাবে নানান রকম উদ্ভট চিন্তা চলতে থাকল ওর মাথার মধ্যে, টুকরো টুকরো নানান ঘটনা মনে পড়তে শুরু করল। মৃত্যুর আগে এরকম নাকি হয়, শুনেছে সে।

গাল দিল রানা নিজেকে: চালা, চালিয়ে যা উল্লুক। বাঁচতেই হবে। আরও জোরে, শুয়োর, আরও জোরে। -

হঠাৎ রানার মনে হলো, ঠিক পথেই যাচ্ছে তো সে? নাকি ঘুরে গিয়ে লম্বালম্বি ভাবে সাঁতরে চলেছে সে অনবরত? নইলে এখনও ওপারে পৌঁছাচ্ছে না কেন সে?

ঠিক এমনি সময় মাটি ঠেকল হাতে। ঢালু হয়ে উপরে উঠে গেছে। কিছুদূর উঠেই চমকে গেল রানা। দপ্ করে নিভে গেল সমস্ত উৎসাহ। আলো! পানির উপর আলো!

দুটোই সমান। ভাবল রানা। পানির নিচে থাকলে নিশ্চিত মৃত্যু, উপরে উঠলেই বুলেট।

উঠে এল রানা উপরে। কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না সে চোখে। ফুঁপিয়ে উঠে শ্বাস নিল ফুসফুসটা! জোরে আওয়াজ হলো, ঠেকাতে পারল না সে চেষ্টা করেও। প্রতি মুহূর্তে আশা করছে সে, চাঁদি ফুটো করে ঢুকবে একটা বুলেট। একটাই যথেষ্ট। একটু কেঁপে উঠবে শরীরটা, তারপরই স্থির হয়ে যাবে। বোকামির প্রতিফল। এই পরিণতির জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী করল সে নিজেকেই।

কিন্তু বুলেট এল না। আধ মিনিট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাবার পর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল রানা। কোথায় কাঁঠাল গাছ? কোথায় সেই দেয়াল? কাঁটাতার ও বিদ্যুৎ প্রবাহ দিয়ে যেটাকে দুর্ভেদ্য করা হয়েছে? নির্জন একটা ঘরের মধ্যে এসে হাজির হয়েছে সে। ষাট পাওয়ারের একটা শেডবিহীন বালব্ জ্বলছে ঘরের মধ্যে। একটা গুঞ্জন ধ্বনি আসছে কানে। গায়ে চিমটি কাটল রানা। কই ঘুমিয়ে তো নেই।

কিছুতেই তীরে পৌঁছুচ্ছিল না কেন বুঝতে পারল এবার রানা। এসকেপ্ রুট। সুড়ঙ্গ কেটে লেকের সাথে যোগ করা হয়েছে, সেই সুড়ঙ্গ বেয়ে চলে এসেছে সে ভুল করে দেয়ালের তলা দিয়ে বাড়ির ভিতর। সাবধানে পানি থেকে উঠে এল রানা উপরে।

ঘরটা মাটির নিচে। দুটো দরজা। দুটোই ওপাশ থেকে বন্ধ। একটা দরজায় কান পেতেই বুঝতে পারল রানা, ওপাশে জেনারেটার চলছে। আরেকটা দরজায় কান পাতল সে। কিছুই বোঝা গেল না। দরজাটা টেনে ফাঁক করার চেষ্টা করল। একটুও ফাঁক হলো না। ওপাশ থেকে বল্টু তোলা। খুঁজে খুঁজে একটা ছোট্ট ফাঁক পেয়ে সেখানে চোখ রাখল রানা। ঘরের যেটুকু অংশ চোখে পড়ল, লোক দেখতে পেল না সে। শুধু একটা দামী অয়্যারলেস সেট দেখা গেল টেবিলের উপর। এবার এই ঘরটার চারদিকে ভাল করে খুঁজতে গিয়ে আকাশের চাঁদ পেল রানা হাতে।

একুয়ালাঙ! কাঁচা মাটির দেয়ালের গায়ে একটা তাক মত কাটা রয়েছে। তার মধ্যে একজোড়া মুখোশ দুই জোড়া ফ্লিপার, আর দুটো অক্সিজেন সিলিন্ডার। হাতঘড়ির দিকে চাইল রানা। অটোমেটিক অল প্রুফ রোলেক্স এত চুবানি খাওয়ার পরও সমানে টিক টিক করে চলেছে একই তালে। সোয়া বারোটা। পনেরো মিনিটের মধ্যে সোহানার কাছে পৌঁছতে না পারলে হুলুস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে বসবে সে। কাজেই দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল রানা।

টের পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তবু এছাড়া আর কোন উপায় নেই। দুটো ফ্লিপার পরে নিল সে দুই পায়ে, অক্সিজেন সিলিন্ডারের স্ট্র্যাপ পরে নিল, মুখোশ পরে অক্সিজেন অ্যাডযাস্ট করে নিয়ে নেমে পড়ল সে পানিতে। পানির নিচে দিয়ে শ'পাঁচেক গজ গেলেই ধরতে পারবে সে সোহানাকে সময় মত। কিন্তু পাওয়া যাবে তো ওকে?

দশ

নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। রাত আড়াইটা। গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে রয়েছে রানা দোতলার সেই ঘরটায়।

শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে ঠিক সময় মতই পৌঁছেছিল সে গাড়ির কাছে। গাড়ির হিটার অন করে দিয়েও কাঁপুনি বন্ধ হয়নি রানার। ঘরে ফিরে কাপড় ছেড়ে আউন্স তিনেক ব্র্যান্ডি আর গরম এককাপ কফি খেয়ে দশ মিনিটের মধ্যে মাউযারটা সম্পূর্ণ খুলে মুছে পরিষ্কার করে তেল দিয়ে আবার জোড়া লাগিয়েছে সে। তারপর ঢুকেছে লেপের তলায়। পাঁচ মিনিটেই ঢলে পড়েছে গভীর নিদ্রায়।

খুট করে শব্দ হলো একটা।

মুহূর্তে পরিপূর্ণ সজাগ হয়ে চোখ মেলল রানা। বালিশের নিচ থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল পিস্তল ধরা হাতটা। বিপজ্জনক কাজ করে সে। দিনে, রাতে, ঘুমে, জাগরণে যে কোন দিন যে কোন সময় আক্রমণ আসতে পারে ওর উপর। ঘটতে পারে মৃত্যু। তাই ঘুমের মধ্যেও নিজের অজান্তেই ডান হাতটা রাখা থাকে ওর বালিশের নিচে পিস্তলের বাঁটে।

আওয়াজটা এসেছে বাথরুমের ভিতর থেকে। দরজাটা ভেজানো, কিন্তু বল্টু খোলা। আলগোছে নেমে গেল রানা খাট থেকে, নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল বাথরুমের দরজার পাশে। দশ সেকেন্ড। ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে এবার দরজাটা। রুদ্ধশ্বাসে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল রানা। পাপড়ি পর্যন্ত পড়ছে না চোখের।

হাত খানেক ফাঁক হতেই ঘরে ঢুকল একজন। আবছা দেখা যাচ্ছে, বেঁটে খাটো লোক। হাতে ফুট খানেক লম্বা রডের মত কি যেন। বিছানার দিকে এগোচ্ছে পায়ে পায়ে।

বিদ্যুৎ বেগে বাম হাতে পেঁচিয়ে ধরল রানা লোকটার গলা, পিস্তলটা ঠেকাল ওর জুলফির কাছে। কোঁক করে আচমকা একটা শব্দ বেরোল তার গলা থেকে। লোকটার থুতনির গিজগিজে দাড়ি বিঁধছে রানার হাতে।

'খবরদার! টুঁ শব্দ করলেই খুলি উড়িয়ে দেব।' চাপা কণ্ঠে বলল রানা।

কণ্ঠমণিটা নড়ে উঠল। কি যেন বলতে চায় লোকটা, কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বের করতে পারছে না। টেনে নিয়ে চলল রানা ওকে বাতির সুইচের দিকে। খুবই হালকা শরীর লোকটার। টেনে নেয়ার ফাঁকে রানার হাতের চাপ একটু ঢিল হতেই আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, 'আমি গিল্…উহ্, গেছিরে বাবা, গিলটি মিঞা স্যার।'

ঢিল হয়ে গেল রানার হাতটা। বাতি জ্বেলে দিল রানা, কিন্তু আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওর দিকে গিলটি মিঞা, 'নেবান স্যার। আলো নিবিয়ে দিন। বুজে ফেলবে শালারা।'

কিছু বুঝল না রানা, কিন্তু আলো নিভিয়ে দিল সে চট্ করে।

'এই টুকুনেই বুঝে নিল কিনা কে জানে! খিড়কির পর্দাগুলো টেনে দিচ্ছি আমি, তখুন ঐ ছোট বাত্তিটা জ্বালিয়ে দিলে কুনো শালার টের পাবার জো থাকবে না। কতায় বলে, সাবধানের মার নেই, কিন্তু আরাকটু হলে মারাই যাচ্ছিলাম স্যার। আপনারই হাতে। ও শালারা আমার ন্যাজের কাচেও…'

জানালার ভারী কার্টেনগুলো টেনে দিল গিলটি মিঞা। সম্পূর্ণ জানালা ঢাকা পড়ল কার্টেনে। টেবিল-ল্যাম্পটা কার্পেটের উপর নামিয়ে রেখে একটা কোট দিয়ে ঢেকে জ্বেলে দিল রানা। তারপর বসল চেয়ারে।

'কি ব্যাপার গিলটি মিঞা?'

'ব্যাপার স্যার গুরুচরণ। সাঙ্ঘাতিক। হাত কাটা যাচ্চে আমার। বাদ্য হয়ে এই খোঁজাখুঁজি। দশজন স্যাঙাৎ লাগিয়ে পাওয়া গেল শেষ কালে। ইদিকে লোক লেগে আচে পিচনে। টিকটিকি। আধঘণ্টা আগে পর্যন্ত চিল। ভাবলুম স্বাদীন দেশের রাজধানীটা দেকে আসি। লে হালুয়া, একেবারে হম্বি তম্বি শুরু করে দিলে। প্রাণটা বেরিয়ে যাবার যোগাড়। অতচ এই কাগজটা…' রানাকে হাত তুলতে দেখে ব্রেক কষল গিলটি মিঞা।

রানা বুঝেছে, এভাবে ঢালাও সুযোগ দিলে অনর্গল কথা বলে যাবে গিলটি মিঞা, থামবে না সারারাতে, কিন্তু কি বলতে চাইছে বোঝা যাবে না একবর্ণও। এতক্ষণে শুধু একটা ব্যাপার বুঝতে পেরেছে সে—গিলটি মিঞার হাতে ধরা বস্তুটা লোহার রড নয়, গোল করে জড়ানো একটা হাফ ফুলস্ক্যাপ কাগজ। কাজেই থামিয়ে দিয়ে গোড়া থেকে শুরু করল সে আবার।

'তুমি আমার কাছে এসেছ?'

'তবে কার কাচে বলুন? সেই সক্কাল বেলা চারটে মুকে দিয়ে…'

'কেন?'

'কি কেন?'

'আমার কাছে কেন এসেছ?'

'আরে! এতক্ষুণ বললুম কি? হাত কেটে নেবে যে! প্রথমে পিস্তল বের করে ভয় দেকিয়েচে, তারপর বলেচে, যদি দুই দিনের মধ্যে খুঁজে না বের করতে পারি, তাহলে…'

'কে বলেছে?'

'নাম-ধাম জিজ্ঞেস করিনি স্যার। যে রকম চোক পাকাচ্চিল, সাহস্ হোইনিকো। আপনার চেনা লোক। একটা হাত কাটা। আপনাকে খুঁজে না দিলে

আমারো একটা হাত কেটে নেবে বলেচে। না, ঠাট্টা নয়, আল্লার কিরে কেটে বলেচে। লোকটাকে পচন্দ হয় না স্যার আমার। ওলোক সব পারে। তবে স্যার হাওয়া হয়ে যেতে পারতুম। কিন্তু লোকটা বললে কিনা, যে আপনাকে সাবদান না করলে আপনার কপালে খারাবি আচে, তাই…'

রানা বুঝল, কোনক্রমে গিলটি মিঞাকে বাগে পেয়ে প্যাঁচ মেরেছে সোহেল। জিজ্ঞেস করল, 'ওই কাগজটা আমাকে দিতে বলেছিল?'

'হ্যাঁ স্যার।' কাগজটা বাড়িয়ে ধরল গিলটি মিঞা রানার দিকে। 'কিন্তু হাত-কাটা সায়েবের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে রাস্তায় বেড়িয়েই টের পেলুম কানকাটা এক লোক লেগে গেচে পিচনে। বুজলুম শালা নিচ্চয় রাজাকার, কান কেটে ছেড়ে দিয়েচিল বিচ্চুরা ধরে, ঢেকে ঢুকে রেকেচে ব্যাটা কানটা, কিন্তু আমার চোক হলো গিয়ে বাজপাকীর চোক। কিন্তু সে ব্যাটা লেগেই আচে, সব্বোক্ষণ ঘুরচে পিচন পিচন, কিচুতেই খসানো যায় না। লে হালুয়া! কোন বাড়িতে ঢুকলে ডেঁড়িয়ে থাকে রাস্তায়। কাজেই নিজে আর খুঁজলুম না। বত্রিশ বচোর ছিলুম থ্রী সেবেন্টি নাইন (চুরি) সার্বিসে। অসংক্য স্যাঙাৎ সাকরেত আচে। তাদেরই জনা দশেককে লাগিয়ে দিলুম। ও শালারা সব পারে। সেই ফরটি সিক্সে একবার ক্যালক্যাটায়…'

'যে লোকটা তোমার পিছু নিয়েছিল সে কোথায়?'

'ওহ্, সে শালা এতক্ষুণ ডেঁড়িয়ে ছিল উই রাস্তায় দেয়ালের দিকে মুক করে। কিচুতেই পিছু ছাড়ে না। শেষকালে এই কাগজটাকে মুড়িয়ে নিয়ে পেস্তলের মত করে এটার ছায়া ফেললুম দেয়ালের গায়ে, আড়াল থেকে বললুম—নড়েচ কি মরেচ। ব্যস, ডেঁড়িয়ে পড়ল। খুব করে ভয় দেকিয়ে, শালার বাপ-মা তুলে গাল দিয়ে ঢুকে পড়লুম সামনের বাড়িতে। পরপর তিনটে বাড়ি টপকে উঁকি দিয়ে দেখি তেমনি পুতুলের মত ডেঁড়িয়ে এদিক ওদিক চাইচে শালা। আরও দুটো বাড়ি ডিঙিয়ে আবার উঁকি দিয়ে দেকি চলে যাচ্চে ফিরে। তারপর ঢুকলাম ওই বাতরূমে। ও বাবা, বাগের ঘরে ঘোগের বাসা…'

চিঠিটা মেলে ধরল রানা। শুধু তারিখ নয়, সময়ও লেখা আছে চিঠির উপর। গতকাল সকাল দশটায় লেখা। সোহেল লিখেছে: প্রিয় শ্যালক, চিঠির তারিখ ও সময় দেখে বুঝতেই পারছিস কি অসম্ভব বুদ্ধি আমার মাথায়। সবই বুঝি, কিন্তু একটু দেরিতে। খারাপ লোক সহজে মরে না জানতাম, কিন্তু তুই যে এতই খারাপ, জানা ছিল না। যাক, এখন আসল কথা হচ্ছে, একথা শত্রুপক্ষও জানে। মেয়েটি ওদের হাতে ধরা পড়েছে আজ সকালে আজিমপুরে। কাজেই মিত্র ও শত্রু দুই পক্ষই তোকে এখন হন্যে হয়ে খুঁজছে। তোর সাথে আমার দেখা হওয়া জরুরী দরকার। কিভাবে হতে পারে জানাবি। আর বিশেষ কি? লাথি নিস। ইতি তোর পরম পূজনীয় বড় দুলাভাই, সোহেল।

মাথা নিচু করে কয়েক মিনিট গভীর চিন্তায় ডুবে গেল রানা।

ধরা পড়েছে সোফিয়া। তার মানে ওরা জানে যে মারা পড়েনি রানা পূর্বাণীর বিস্ফোরণে। ওরা কি আশা করেছিল যে রানা আজ রাতে যাবে সাইমনের বাসায়? ওরা কি অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে? ওরা কি অনুসরণ করল ওকে এ বাড়ি পর্যন্ত? অ্যাকুয়ালাঙ যে একটা খোয়া গেছে সেকথা কি জেনে গেছে ওরা? এখন কিভাবে এগোতে হবে ওকে? সবকিছু প্রকাশ হয়ে গিয়ে থাকলে পালিয়ে বেড়াবার কি মানে হয়? বিদেশী মিশনের বিরুদ্ধে সরাসরি কিছু করা যাবে না সরকারের তরফ থেকে। তাহলে কি করা উচিত এখন ওর?

হঠাৎ চাইল সে গিলটি মিঞার দিকে। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রানাকে লক্ষ করছিল সে আনমনে। রানাকে মাথা তুলতে দেখে চমকে উঠল। তারপর হেসে উঠল। রানাকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইতে দেখে বলল, 'এমনিই হাসচি স্যার। কোন কারণ নেই। ভাবছিলাম, চিন্তে করলে আপনাকে বড় সুন্দর দেকায় স্যার। এক্কেবারে ধ্যানী ঋষিদের মতন। দাড়ি গোঁপ থাকলে যা মানাত না! আমার ওস্তাদ বলত...'

'বাতি নেভাতে বলেছিলে কেন তুমি গিলটি মিঞা? যে তোমার পিছু নিয়েছিল সে তো চলেই গিয়েছিল...'

'একটা কালো গাড়িতে আলো নিবিয়ে বসে আচে স্যার তিনজন ইদিকে মুক করে। উই ওখানে অন্ধকার ছায়ায়। অস্তোর আচে ওদের কাচে। ওদের পচোন্দ হোইনি স্যার আমার। দেকে ফেলেছিল আমাকে, নুকিয়ে ওদের চোক ফাঁকি দিয়ে উঠে এসেচি একানে।'

'ওদের একজনের গালে সামান্য দাড়ি আছে?'

'আচে স্যার।'

'তিনজনেরই বয়স আঠার থেকে চব্বিশের মধ্যে?'

'ঠিক বলেচেন।'

'তোমাকে একটা কাজ দিলে করতে পারবে গিলটি মিঞা?'

'আরে! একি কতা জিগ্যেস করচেন স্যার। পারব না মানে? নিচ্চয় পারব। দিয়েই দেকুন না।'

'গাড়ির ওই তিন বিচ্ছুকে বলবে, বাড়ি ফিরে যেতে বলেছে সোহানা দি। কাল সকাল আটটায় এই বাড়িতে মীটিং আছে, যেন আসে। আর শোন...'

মন দিয়ে শুনল গিলটি মিঞা রানার কথা নিষ্পাপ দুই চোখ মেলে, সব শুনে মুচকি হাসল, তারপর রানার লেখা একটা চিরকুট নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে বাম পাটা একটু খুঁড়িয়ে। কান খাড়া করে ওর পদশব্দ শোনার চেষ্টা করল রানা, কোনদিকে গেল কিচ্ছু টের পাওয়া গেল না। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে লোকটা। মুচকি হাসল রানাও। বত্রিশ বছরের প্র্যাকটিস!

শুয়ে পড়ল রানা। তিন মিনিটেই অচেতন হয়ে পড়ল সে গভীর ঘুমে।

এগারো

ডাইনিং টেবিলটা ঘিরে বসেছে ওরা সাতজন। সোহেল, মমতা, শাহেদ, ইগলু, সোহানা, রানা, আর ফোর্থ ব্যাটালিয়ানের মেজর কবির। সামনে ধূমায়িত কফির কাপ। রান্নাঘরে এতক্ষণ সোহানাকে সাহায্য করেছে গিলটি মিঞা, এখন হাত কাটা সাহেবের জন্যে সিগারেট আনতে গেছে। রানাকে বলেছে, লোকটাকে এখন ওর বেশ 'পচোন্দ' হয়েছে। কাল রাতে রানার খবর দেয়াতে যে রকম করে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল, এবং যেরকম ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বাকি রাতটুকু ঘুমাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল পাশের ঘরে, কিছুতেই অত রাতে আর রাস্তায় বেরোতে দেয়নি, তাতে সমস্ত রাগ ওর জল হয়ে গেছে। লোকটা একেবারে খারাপ না।

'উহ্, বড় বক বক করে তোমার ওই বেঁটে বাঁদরটা। এক ঘন্টার মধ্যেই পুরো আত্মজীবনী শুনিয়ে দিয়েছে আমাকে। আর সেই সাথে তোমার গুণগান। ওর ধারণা পৃথিবীতে মানুষ বলতে মাত্র দুজন আছে, এক ওর ওস্তাদ, আর দুই হচ্ছে মাসুদ রানা। আচ্ছা, কথায় কথায় লোকটা বলে "থ্রী সেভেনটি নাইন" ব্যাপারটা কি?'

'চুরি।' মুচকি হেসে বলল রানা।

'চুরি।' বড় বড় হয়ে গেল সোহানার চোখ। 'চোর নাকি লোকটা? বলে বত্রিশ বছর থ্রী সেভেনটি নাইন সার্ভিসে…'

'ছিল। এখন আর চুরি করে না। এখন ও বিখ্যাত শখের গোয়েন্দা মাসুদ রানার সহকারী।' বলল সোহেল।

কথাটার মধ্যে টিটকারী রয়েছে, আতিশয্য রয়েছে, কিন্তু আমল দিল না রানা। চাকুরি ছেড়ে দিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করবে রানা, এটা কিছুতেই হজম করতে পারছে না সোহেল। রানার সাফ জবাব শুনে বিগড়ে গেছে সে। কিন্তু সময়ে ঠিক হয়ে যাবে সব কিছু, ভাবল রানা।

'এবার সরাসরি কাজের কথায় চলে যেতে পারি আমরা।' বলল রানা। 'ব্যাপারটা প্রথম থেকে বলছি আমি।'

শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে বলে গেল রানা। কিভাবে টের পেল সে দলটার কথা, কিভাবে ঢুকে পড়ল সে দলে, কিভাবে পালিয়ে গেল চোদ্দই ডিসেম্বর, কেন আত্মগোপন করে ছিল এতদিন। গত পরশু সকাল থেকে গত রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিল সে। সবশেষে বলল, 'এবার আমাদের আক্রমণের পালা। তোমাদের কার কাছ থেকে কি সাহায্য পেতে পারি জানা গেলেই একটা প্ল্যান অফ অ্যাকশন দাঁড় করিয়ে ফেলা যাবে।'

'তার আগে আমরা আপনার পূর্ণ পরিচয় জানতে চাই।' বলল দুর্ধর্ষ গেরিলা কমান্ডার মমতাজ। 'আমার গ্রুপের সাথে আপনি কাজ করেছেন। জানতে পেরেছি, এরকম আরও অনেকগুলো গ্রুপের সাথেই আপনার যোগাযোগ ছিল। প্রত্যেকেই এক বাক্যে স্বীকার করে বীরের মত যুদ্ধ করেছেন আপনি, অনেক বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে সাহায্য করেছেন ওদের, আপনার সততা ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে কারও কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু একটা ব্যাপারে সবাই একমত—কেউ আপনাকে চেনে না। আপনার পুরো ঘটনাটা শুনে আমি আপনার পরিচয় সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করতে পারছি, কিন্তু পরিষ্কার জানতে চাই—কে আপনি?'

'স্বাধীনতার আগে এ প্রশ্ন জাগেনি কেন?' জিজ্ঞেস করল সোহেল। রানা বুঝল, ওর পরিচয় এদের জানাবার ইচ্ছে নেই সোহেলের। যতটা সম্ভব গোপনীয়তা রক্ষার পক্ষপাতী সে।

'তখন এ প্রশ্ন অবান্তর ছিল। যে-ই অস্ত্র হাতে নিয়েছে খান সেনাদের বিরুদ্ধে, তাকেই বুকে জড়িয়ে ধরেছি আমরা। ব্যক্তিগত স্বার্থ বলতে কিছুই ছিল না, দলমত নির্বিশেষে ছাত্র, শিক্ষক, চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী কৃষক, শ্রমিক, সবাই আমরা কাজ করেছি দেশের জন্যে। পরিচয় জানার প্রয়োজন ছিল না। যে মানুষটা একই সাথে আমার পাশে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়ছে আমারই শত্রুর উপর, সে আমার বন্ধু—বন্ধুত্বের সংজ্ঞাটা এতই সহজ সরল ছিল তখন। কিন্তু আজকে স্বাধীনতার পর যদি জীবনের ঝুঁকি নিতে হয়, বন্ধুর জন্যে নেব আমরা সেটা। আমরা মাসুদ রানাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছি, ব্যক্তিগত ভাবে আমি ওঁর কাছে কৃতজ্ঞও আছি, কিন্তু এ কেমন বন্ধু যাকে চিনিই না?'

'আমার নাম মাসুদ চৌধুরী। ডাক নাম ছিল রানা। দুটো মিলিয়ে নাম দাঁড়িয়েছে মাসুদ রানা। পিতা মৃত জাস্টিস ইমতিয়াজ চৌধুরী। জন্ম: ঢাকা শহরে। শিক্ষাগত যোগ্যতা বি. এ পাস। বলো, আর কি জানতে চাও?' বলল রানা।

'কি করেন আপনি?'

উত্তেজিত সোহেল ঝুঁকে এল সামনে। 'চাকরি করে। একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জেনারেল ম্যানেজার।' উত্তর দিল সে। 'ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং করপোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার। মতিঝিলে অফিস।'

'আপনিও সেই অফিসেই কাজ করেন?'

'হ্যাঁ।' টের পেল না সোহেল যে ফেঁসে যাচ্ছে।

'এবার বলুন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী হয়ে যে-কোন অস্ত্র চালাতে শিখলেন কি করে মাসুদ রানা? ওঁকে পিস্তল, স্টেনগান থেকে শুরু করে মেশিনগান, মর্টার, এমন কি মিডিয়াম গান পর্যন্ত চালাতে দেখেছি আমি। টার্গেট মিস করতে দেখিনি কখনও। আমার জানা আছে, আর্টিলারির মেজারমেন্ট ও ক্যালকুলেশন জানতে হলে কেবল দেশপ্রেমে চলে না, যথেষ্ট সময় ব্যয় করে কষ্ট করে ট্রেনিং নিতে হয়।'

'কাজেই বোঝা যাচ্ছে আর্মিতে ছিলাম আমরা।'

'তুই-তুঁকারি সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছি আপনাদের মধ্যে। নিশ্চয়ই অনেক দিনের বন্ধু। আপনারা দুজনেই কি একই সাথে আর্মিতে ছিলেন?'

'হ্যাঁ।' এইবার পুরো ফেঁসে গেল সোহেল। 'একই পোস্টে।'

'কি পোস্টে?' হাসছে মমতা। রানার ঠোঁটেও ফুটে উঠল একটুকরো হাসি।

'মেজর।' ফাঁদটা টের পেয়ে এবার চুপসে গেল সোহেল। মনে পড়ল সালদা নদীর ক্যাম্পে বসে সে যখন আর্মি ইন্টেলিজেন্সের কাজ চালাচ্ছে তখন যে কোন গেরিলা ইউনিটের কমান্ডারের পক্ষে ওর পরিচয় জানতে পারা অসম্ভব ছিল না। নিশ্চয়ই মমতা দেখেছে ওকে ওখানে, রানা এবং সোহেল যখন একই অফিসে একই কাজ করে, তখন সে অফিসের কাজটা কি বুঝতে না পারার কথা নয়। পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে ওদের।

'বুঝলাম। পরিচয় দিতে আপনাদের এত আপত্তি কেন বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। এবার কাজের কথায় আসা যেতে পারে। আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত।' অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে গেছে মমতার কাছে। মনে পড়ল, বাসাবোয় ওকে ঘিরে ফেলেছিল পশ্চিম-পাকিস্তানী পুলিসের একটা দল, সেই সময় ধীর স্থির এই নিষ্ঠুর চেহারার লোকটা কিভাবে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, আহত জলিলের হাত থেকে স্টেনটা তুলে নিয়ে কি রকম দৃঢ়তার সাথে মুখোমুখি যুদ্ধ করেছিল, পরাজিত করেছিল নিশ্চিত মৃত্যুকে। পরিচয় জানা ছিল না, জানা ছিল না যে এই-অসমসাহসী লোকটা আর্মির মেজর ছিল এককালে, স্পাই ছিল কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের। বলল, 'কিন্তু আপনি একজন মেজর হয়ে যুদ্ধ পরিচালনায় না গিয়ে ফ্রন্টাল ফাইটে গেলেন কেন বুঝতে পারছি না।'

মৃদু হাসল রানা। বলল, 'অস্ত্র ধরেছিলাম আমার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন মানুষের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিজ হাতে নেব বলে। পাঞ্জাবীগুলোকে মারতে মারতে খুন চেপে গেছিল মাথায়, নেশার মত হয়ে গিয়েছিল। মনে হত আরও কয়েকটাকে মারতে পারলে রেহানার···' থেমে গেল রানা। 'যাক, ব্যক্তিগত কথা বাদ দিয়ে কাজের কথায় আসা যাক।'

শুরু হলো প্ল্যান তৈরির কাজ। কিভাবে আক্রমণ হবে বিস্তারিত আলোচনা করল ওরা। গিলটি মিঞার কাজ বুঝিয়ে দেয়া হলো ওকে। ঠিক হলো বাড়ির ভিতর ঢুকবে কেবল বেসরকারী লোকেরা, মেজর কবির আর সোহেল তাদের লোকজন নিয়ে যা করার করবে বাইরে থেকে।

'দুঃখ, সরকারী ভাবে কিছুই করা যাচ্ছে না। জেনেও না জানার ভান করতে হচ্ছে আমাদের।' বলল মেজর কবির। 'নইলে শেলিং করে উড়িয়ে দিতাম বাড়িটা। আমাদের তরফ থেকে কোন ঝুঁকি নেওয়ার দরকার পড়ত না। আপনারা মারাও যেতে পারেন ওই বাড়ির ভিতরে।'

'আপনারাও মারা যেতে পারেন। আত্মরক্ষার জন্যে ওরা কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে আমাদের জানা নেই। আপনারা বাইরে যারা থাকছেন তাদেরও ঝুঁকি আছে।' বলল রানা।

'তাহলে ভেতরে ঢোকার ব্যাপারে আপত্তি করছেন কেন?'

'আপনাকে এবং সোহেলকে ভেতর ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না কেবলমাত্র একটা কারণে। বিদেশী সাংবাদিক আর অন্যান্য মিশনের লোকজন এসে পৌঁছানোর আগেই কাজ সেরে কেটে পড়তে হচ্ছে আমাদের। বড় জোর দশ মিনিট চলবে আমাদের অপারেশন। বাইরে থাকছেন আপনারা, অনায়াসে আপনাদের পক্ষের লাশ নিয়ে সরে পড়তে পারছেন সময় মত। কিন্তু ভেতরে যারা ঢুকছে তারা এতটা সুবিধা পাচ্ছে না। প্রয়োজন হলে লাশ ফেলেই পালাতে হবে তাদের। সরকারী কর্মচারীর একটা দুটো লাশ ওই বাড়ির ভিতর ফেলে এলে কি অবস্থা হবে কল্পনা করুন! সারা দুনিয়া কাঁপিয়ে চিৎকার জুড়বে না সেই বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধান? পাকিস্তানের প্রতি তাদের এতই দরদ যে এই ছুতোয় একটা ছোটখাট যুদ্ধও বাধিয়ে বসতে পারে। সদুত্তর দেয়ার মুখ থাকবে তখন আমাদের সরকারের? অথচ মমতা, শাহেদ, ইগলু, সোহানা, গিলটি মিঞা আর আমি—এই ছ'জনের সবার লাশও যদি পাওয়া যায় বাড়ির ভিতর, কিছু ক্ষতি নেই। আমরা সবাই জেনুইন মুক্তি যোদ্ধা। ব্যাপারটা ব্যক্তিগত কলহ এবং অ্যামেচারের কাজ বলে প্রমাণ করা সহজ হবে।'

'কিন্তু গিলটি মিঞা? সে-ও কি মুক্তি যোদ্ধা?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'বিশ্বাস না হয় ওর আইডেন্টিটি কার্ড দেখো।' হাসল রানা। 'না, নকল নয়। রামগড় সেক্টারের প্রায় অর্ধেক বাঙ্কার উড়িয়েছে এই গিলটি মিঞাই গ্রেনেড মেরে। প্রথমে এস. এল. আর. দেয়া হয়েছিল ওকে, কিন্তু সেটা লম্বায় এবং ওজনে ওর জন্যে বেশি হয়ে যাওয়ায় অনেক তেল খড় পুড়িয়ে এক্সপ্লোসিভে স্পেশালাইজ করেছিল সে। পুলিস দেখলে এখনও আত্মা কেঁপে যায় ওর, কিন্তু মোটেই ভয় পায় না সে আর্মিকে। পাক আর্মির ক্যাম্প থেকে ক্যান-ফুডের অসংখ্য টিন চুরি করে এনে খাইয়েছে সে নাইন্থ বেঙ্গলের অফিসারদের, বিনকিউলার এনে দিয়েছে, মর্টারের সাইট এনে দিয়েছে, চাইনিজ স্টেনের ম্যাগাজিন এনে দিয়েছে, আরও কত অসংখ্য টুকিটাকি জিনিস। ওর বিরাট অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে বত্রিশ বছরের এক্সপিরিয়েন্স।'

সবাই হাসল।

'কিন্তু ব্যক্তিগত কলহ বলে চালানো যাবে বলছেন—কলহটা কোথায়?' প্রশ্ন করল ইগলু।

'বাধাতে হবে।' বলল রানা। 'আমি আর গিলটি মিঞা রওনা হয়ে যাব আগেই। তোমরা চারজন আজ সন্ধ্যায় ইন্টারকনে গোলমাল বাধাবে ওই হারামিটার সাথে। নারীঘটিত কলহ হলেই ভাল হয়। সোহানা থাকছে তোমাদের

সাথে, ব্যাপারটা ওইদিকে মোড় ঘোরাবার চেষ্টা কোরো। যদি সেদিকে সুবিধা না হয়, এমনি ঝগড়া হলেও চলবে। হাতাহাতি হওয়া চাই। অন্যান্য ফরেন মিশনের লোকেরা আর বিদেশী জার্নালিস্টরা জানবে মুক্তিযোদ্ধার একটা প্ল্যাটুনের কয়েকজন লম্বা চুল আর জুলফিওয়ালা আপস্ট্রার্ট ছোকরার সাথে মারামারি হয়েছে অমুক মিশনের অমুকের। ঝগড়া বাধাবার জন্যে দরকার মনে করলে আমানত আলীকে সাথে নিয়ে নিতে পারো।'

'রাইট।' বলল প্ল্যাটুন কমান্ডার মমতা। 'ঝগড়া ফ্যাসাদে ওর জুড়ি নেই। প্ল্যানিংটা মোটামুটি ভালই দাঁড়াবে মনে হচ্ছে। কাল যখন আক্রমণের খবর পাবে তখন সবাই ব্যাপারটা আজকের ঘটনার সাথে যুক্ত করে নেবে। পত্রিকায় বেরোবে মুক্তি যোদ্ধার ছদ্মবেশে গুণ্ডামীর খবর। দুঃখ প্রকাশ করে কোন নেতার বিবৃতি বেরোবে, এবং সেই সাথে কঠোর হুঁশিয়ারি। বুঝলাম। কিন্তু লাশগুলো কি হবে?'

'না আউযুবিল্লাহ্! ফুদ্দু দাড়িওয়ালা মাদ্রাসার ফাজেল পাস মুক্তি যোদ্ধা শাহেদ বলল, 'লাশ? কোন্ পক্ষ স্বীকার যাবে লাশের কথা? গায়েব হয়ে যাবে সব লাশ। হাদিস শরীফ বলেছেন…'

'তুই চুপ কর্ তো ফাজিল কোথাকার!' ধমক দিল সোহানা। 'না হয় একটা পাসই দিয়েছিস, তাই বলে যখন তখন বিদ্যে ঝাড়বি নাকি?'

'আর বোলো না সোহানা আপা,' কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলে উঠল ইগলু, 'গত নয়টা মাস একেবারে জান জ্বালিয়ে খেয়েছে আমাদের। বললে বিশ্বাস করবে না, অনেক সূরা মুখস্থ হয়ে গেছে আমার। একদিকে পাঞ্জাবীদের উপর মেশিনগান স্টেনগানের গুলি, আর অন্যদিকে আমাদের উপর হাদিস কোরানের বুলি—সমানে ঝেড়েছে ব্যাটা অনর্গল। দুই তরফই অস্থির। দুই দিকেই ও ছিল টেরর্।'

শাহেদ আলী ছাড়া হেসে উঠল সবাই। নির্বিকার চেহারায় চুটকি দাড়িতে হাত বুলাচ্ছে সে। গিলটি মিঞার তত্ত্বাবধানে আরেক দফা চা তৈরি করে ট্রেতে সাজিয়ে নিয়ে এল বেয়ারা।

'তবে যে যাই বলুক,' রানা বলল, 'একবার বড় বাঁচা বেঁচে গিয়েছিলাম শাহেদের কল্যাণে। গুরুত্বপূর্ণ একটা অপারেশনে যাচ্ছি, কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ দাউদকান্দির এক মাইল আগে বাস থামিয়ে চেকিং শুরু হলো। ব্যস, আর্মি গার্ডের উপর শুরু হয়ে গেল ওর ওয়ায-নসিহত। আমার এদিকে হার্টবিট ডবল হয়ে গেছে, সার্চ করলেই ধরা পড়ে যাচ্ছি নির্ঘাৎ, ওদিকে সময় মত পৌঁছতে না পারলে আমাদের তেইশজন গেরিলা মারা পড়বে পাক-সেনার হাতে। দুই মিনিটেই কাবু করে ফেলল সে গার্ডগুলোকে। ভক্তি বিগলিত চিত্তে সার্চ না করেই ছেড়ে দেয়া হলো ওকে—আপ্ যাইয়ে মুনসি সাহাব, লাইন পে খাড়া হোনেকা যরুরত ন্যহি। পবিত্র এক মধুর হাসি মুখে নিয়ে এগিয়ে গেলেন মুনসি সাহেব পাঁচ কদম, তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন। জোব্বার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে ছোট্ট একটা স্টার্লিং

কারবাইন। গুলির দাম আছে, তাই অটোমেটিকে না দিয়ে রিপিটে দিয়ে পিছন থেকে চারটে গুলিতে চারটে হার্ট ফুটো করলেন মুনসি সাহেব। তারপর সমবেত জনতার উদ্দেশে বললেন, 'রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম একবার হযরত আলী রাযিআল্লাহ আনহাকে ডেকে বললেন...

হো হো করে আরেক চোট হাসি হলো। সবাই মজা পাচ্ছে পুরানো ঘটনার অবতারণায়। বেশ অনেকক্ষণ গল্প চলল। তারপর বাড়িটার একটা মোটামুটি ম্যাপ এঁকে নিয়ে প্রত্যেকের কাজ বুঝিয়ে দিল রানা আলাদা আলাদা ভাবে।

সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা।

মারামারি বাধাতে অসুবিধে হলো না।

সুন্দরী এক সঙ্গিনীকে নিয়ে হুইস্কি খাচ্ছে সাইমন। খুব সম্ভব কারও জন্যে অপেক্ষা করছে। বাইরে থেকে দেখেই বোঝা গেল সোহানাকে ব্যবহার করা যাবে না এক্ষেত্রে। দ্রুত পলায়নের সুবিধার্থে গাড়ির ড্রাইভিং সীটেই বসে রইল সে প্রস্তুত হয়ে।

সবার চোখে পড়ার মত হৈ-চৈ করে ঢুকল ওরা চারজন 'সাকী'তে। কাছাকাছি একটা টেবিলে বসল ওরা, টেবিল চাপড়ে ডাকল বেয়ারাকে, উচ্চ কণ্ঠে গল্প শুরু করল মুক্তি যুদ্ধের। ড্যাম কেয়ার ভাব করে চাইল সবার দিকে। ভ্রূ কুঁচকে বিরক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সাইমন ওদের দিকে।

দশ মিনিটের মধ্যেই লোকটার দামী আলপাকা স্যুটটা বরবাদ করে দিল শাহেদ ভরা কফির কাপটা ঢেলে। গালি দিয়ে উঠল সাইমন। সঙ্গে সঙ্গে রূপসী সঙ্গিনীর সামনেই কানটা ধরে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিল শাহেদ ওর গালে। ঘর ভর্তি লোক তাজ্জব হয়ে চেয়ে রয়েছে এদিকে।

দ্বিতীয়-প্রধানের ত্রাণে এগিয়ে এল মিশনের অধঃস্তন এক কর্মচারী। কিন্তু ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল তাকে সাইমন, উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে, নিজ হাতে শায়েস্তা করবে সে। প্রকাণ্ড মাথাটা শাহেদকে ছাড়িয়ে আরও হাত দেড়েক উপরে উঠে গেল। পাঞ্জাবীর কলার না পেয়ে চুলের মুঠি চেপে ধরল সে শাহেদের।

'ওরে বাবা, গেছিরে!' চিৎকার জুড়ল শাহেদ।

এতক্ষণ যেন দেখতেই পায়নি, এমনি ভাবে ফিসফিস করছিল বাকি তিনজন নিজেদের মধ্যে। শাহেদের চিৎকারে উঠে এল টেবিল ছেড়ে। তুমুল বাক বিতণ্ডা হলো, আশপাশ থেকে কয়েকজন মিটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু চুলের মুঠি ছাড়ল না সাইমন, শেষ পর্যন্ত রাগ সামলাতে না পেরে মেরেই বসল।

বিদ্যুৎ খেলে গেল মমতা আর আমানত আলীর শরীরে। দু'পাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল দু'জন। একটা টেবিলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল শাহেদ, যখন সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল তখন ওর হাতে স্টারলিং কারবাইন। অটোতে দিয়ে ছাতের দিকে

দুই সেকেন্ড গুলি বর্ষণ করল সে। চিৎকার আর হৈ-হুলস্থূল শুরু হয়ে গেল বারের মধ্যে। পনেরো সেকেন্ডেই সাইমনের নাক মুখের চেহারা অন্য রকম হয়ে গেল। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সে মেঝের উপর। ওর বুকের উপর থেকে উঠে দাঁড়াল মমতা। শাহেদের কারবাইন আর ইগলুর পিস্তলের মুখে সাহায্যের জন্যে কাছে এগোতে সাহস পেল না কেউ।

বেরিয়ে গেল ওরা ইন্টারকন থেকে উচ্চৈস্বরে বাংলা, ইংরেজী ও অ্যারাবিকে সাইমনের চোদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করতে করতে।

বারো

তেজগাঁ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার একটা নির্জন এলাকায় থামল কালো মার্সিডিজ বেঞ্জ লেকের পাশে। অন্ধকার। গাড়িতে বসেই তৈরি হয়ে নিল রানা। জামা কাপড় খুলে ফেলল সে। পরনে রইল শুধু একটা সাঁতারু জাঙ্গিয়া, কোমরে বেল্টের সাথে বাঁধা হোলস্টার। সেফটি ক্যাচ নামিয়ে দিয়ে অয়েল স্কিনের একটা ওয়াটার-প্রুফ ব্যাগের মধ্যে ঢোকাল সে মাউযারটা, তারপর রাখল ব্যাগটা হোলস্টারের ভিতর। ফ্লিপার বেঁধে নিল পায়ে, অক্সিজেন সিলিন্ডারটা পিঠে। দরজা খোলার জন্যে কয়েকটা যন্ত্র বেঁধে নিল সে ডান পায়ের উরুতে।

প্রৌঢ় ড্রাইভার ঘাড় সোজা করে সামনের দিকে চেয়ে রয়েছে। এইসব ভয়ঙ্কর লোকের সাথে আপামণির মেলামেশা পছন্দ হচ্ছে না তার। হুকুম হয়েছে, ডিউটি পালন করছে সে, এর বেশি নয়।

শিউরে উঠল গিলটি মিঞা।

'কিহে ভয় লাগছে নাকি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'জাড় লাগচে স্যার। আপনাকে ন্যাংটো হতে দেকেই সব্বোশরীল কাঁপচে আমার শীতে। ডাঙাতেই এই অবস্তা, ভাবচি প্যানির নিচে সাঁতার কাটব কি করে? অবশ্য অ্যাকোন ভেবে আর কি হবে, পড়েচি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাতে।' রাবারের মাউথ পিসটা দাঁতে চেপে ভাল্‌ভ্ রিলিজ অ্যাডযাস্ট করছে রানা যাতে ঠিক পরিমাপ মত বাতাস পাওয়া যায়। ওদিকে বক বক করে চলল গিলটি মিঞা, 'এসব যন্তোরের কায়দা তো রপ্ত করে ফেলেচি স্যার, কিন্তু আসল কাজটাই তো জানি না। মেদনিপুর জম্মো, ক্যালক্যাটায় মানুষ, সাঁতার শিকবো কোতায়? কিরে কেটে বলচি স্যার, জীবনে এই প্রথম পানিতে নামতে যাচ্চি। ও বাবা, বুকের ভেতর এই জায়গাটায় কেমন যেন গুড়গুড় করচে স্যার। কী যে হবেই আল্লাই জানে। এই জিনিসটা আর্চে,' সীটের পাশে ওর জন্যে রাখা অক্সিজেন

সিলিন্ডারের উপর হাত রাখল গিলটি মিঞা, 'বুজলুম, ডুবে মরার ভয় নেই। শীতও নাহায় সহ্য করে নিলুম দাঁতে দাঁত চেপে, কিন্তু কাঁকড়া? চোখ বুজলেই অসংক্য কাঁকড়া দেখতে পাচ্চি যে! আট হাত-পায়ে এগিয়ে আসচে সব আমার দিকে। ওই বিটকেল জন্তুটাকে আমার বড় ভয় স্যার, এক্কেবারে ছোট বেলা থেকে। বিচ্ছিরি, বিদঘুটে ওটার চলাফেরা, সামনের দু'পায়ের নোক দুটোর কতা ভাবলে…' শিউরে উঠল সে আবার।

মৃদু হেসে নেমে পড়ল রানা গাড়ি থেকে। ড্রাইভারকে বলল, 'রামপুরায় ঠিক যেখানে নামতে চাইবে সেখানেই নামিয়ে দেবে গিলটি মিঞাকে। তারপর সোজা বাড়ি ফিরে যাবে।' গিলটি মিঞাকে বলল, 'ঠিক জায়গা মত চিনে পৌঁছতে পারবে তো? নক্সাটা মনে আছে?'

'মুকস্ত আচে স্যার। কিন্তু পানির নিচে দিগ্‌বিদিগ কতটা ঠিক থাকবে বলতে পারচি না। ক্যালকাটায় একবার ডায়মন হারাবারে…'

সাবধানে নেমে গেল রানা ঢালু পাড় বেয়ে। চলে গেল মার্সিডিজ বেঞ্জ। পোড়া পেট্রলের গন্ধ এল নাকে। চাঁদের মিষ্টি আলোয় অপরূপ লাগছে লেকটা। এলাকাটা যেন নিঝুম পুরী। উঁচু দেয়াল ঘেরা ফ্যাক্টরিগুলোর বিরাট সব মেশিন যেন এক একটা দৈত্য—ঘুমিয়ে আছে এখন। দূরে মিলিয়ে গেল গাড়ির শব্দ। রানার সাড়া পেয়ে এতক্ষণ ঘাপ্‌টি মেরে ছিল, হঠাৎ আবার উঁচুস্বরে ডাকতে শুরু করল একটা ঝিঁঝি পোকা খুব কাছের একটা ঝোপ থেকে। চমকে উঠেই হেসে ফেলল রানা, তারপর নিঃশব্দে নেমে গেল পানিতে। ভয়ানক ঠাণ্ডাপানি। হাঁটু পর্যন্ত নামার পর অসাড় হয়ে গেল পা দুটো, মনে হচ্ছে, লাফ দিয়ে পাড়ে উঠে আসে। একটা বাইম মাছ পড়ল পায়ের নিচে, সড়াৎ করে পিছলে বেরিয়ে গেল। বুক পানিতে নেমেই ডুব দিল রানা মাউথ পিসটা কামড়ে ধরে। কাঁপুনি ধরে গেছে সর্বাঙ্গে। ধীরে ধীরে পানির উপর কোন আলোড়ন না তুলে পা দুটো চালাতে শুরু করল সে। গভীর পানিতে এসে দিক ঠিক করে নিয়ে যাত্রা শুরু করল রানা।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই বেশ গরম হয়ে উঠল শরীরটা। শীত লাগছে ঠিকই, কিন্তু শরীরের চামড়াটা অসাড় হয়ে যাওয়ায় মনে হচ্ছে পুরু হয়ে গেছে ইঞ্চি দেড়েক, চামড়া ভেদ করে ঢুকতে পারছে না শীত শরীরের অভ্যন্তরে। সমান তালে চলছে পা দুটো, সেই সাথে হাত দুটো চলছে ব্রেস্টস্ট্রোকের ছন্দে। লেকের পানি কোথাও গভীর, কোথাও অগভীর। গভীর পানিতে ঠাণ্ডা বেশি। সমান গতিতে এগিয়ে চলল রানা ছয়ফুট পানির নিচ দিয়ে। একটা ব্রিজের তলা দিয়ে পার হয়ে ডানদিকে মোড় নিল সে। আরও অর্ধেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে ওকে। আরও দুটো ব্রিজ আছে পথে।

পানির নিচটা নীরব, নিস্তব্ধ, শান্ত। একঘেয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে নানান চিন্তা ঘুরতে থাকল রানার মাথায়।

এতবড় ঝুঁকি এত অনিশ্চয়তার মধ্যে এতগুলো মানুষকে টেনে নামানো কি ঠিক হলো? কি অপেক্ষা করছে ওর জন্যে এ পথের শেষে? আর আধঘন্টার মধ্যে কি ঘটবে ওর কপালে? জানে না রানা। ওরা কি তৈরি আছে আক্রমণের জন্যে? একটা অ্যাকুয়ালাঙ যে খোয়া গেছে সেটা কি টের পেয়ে গেছে ওরা এতক্ষণে? না পাওয়ার কোন কারণ নেই। ওর মৃতদেহ নিশ্চয়ই খুঁজেছে ওরা লেকের মধ্যে। লাশ পাওয়া গেল না যখন, স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত আসছে, পালিয়েছে রানা। কি ভাবে পালাল? ডুব দিয়ে এপারে চলে এসেছিল। গুপ্ত পথ দিয়ে ঢুকে পড়েনি তো ভিতরে? খোঁজ খোঁজ। অ্যাকুয়ালাঙটা নেই। আচ্ছা, ব্যাটা এভাবে পালিয়েছে তাহলে! রাস্তাটা জেনে গেছ তুমি, আচ্ছা, ব্যবস্থা করছি। কি ব্যবস্থা? জানা নেই রানার। বড় জোর আঁচ করতে পারে।

গিলটি মিঞা কি সত্যিই পথ চিনে আসতে পারবে? রামপুরা থেকে এতক্ষণে রওনা হয়ে গেছে সে। জেনারেটার অফ করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গিলটি মিঞার উপর। সাঁতার জানে না, কাঁকড়ার ভয়ে ভীত, এমন একজন লোকের উপর অতখানি নির্ভর করা কি ঠিক হলো? 'আমার অসাদ্য কিচুই নেই স্যার।' গিলটি মিঞার কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পেল রানা। কিন্তু মুখে বলা এক কথা, করে দেখানো আরেক কথা। আজ পর্যন্ত কথার খেলাফ অবশ্য হয়নি লোকটার। কিন্তু আজকেও কি রাখতে পারবে সে তার কথা? ভাল্‌ভ্‌ রিলিজটা ঠিকমত অ্যাডযাস্ট করতে পারল তো। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিল রানা, শাসন করল নিজেকে। এসব উদ্বেগে ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। লোকটা সাঁতার জানে না, জীবনে কোনদিন ব্যবহার করেনি অ্যাকুয়ালাঙ, পানির নিচে দিক ঠিক রাখতে পারবে কিনা তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে—কিন্তু তিনটে ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই; এক হচ্ছে লোকটার অসম্ভব দৃঢ় মনোবল, দুই, তাক লাগানো উপস্থিত বুদ্ধি, তিন, অফুরন্ত কষ্ট সহিষ্ণুতা। এগুলোই একমাত্র ভরসা, এখন। কিন্তু এতে কুলোবে কি?

ঘড়ির দিকে চাইল রানা। সোয়া আটটা। ঠিক নয়টায় আক্রমণ শুরু হওয়ার কথা। এতক্ষণে ইন্টারকনের মারামারি শেষ হয়ে গেছে। সোহানা, মমতা, ইগলু, শাহেদ কি করছে এখন? সোহেলরা? মেজর কবির? সবাই তৈরি হচ্ছে এখন। নিজ নিজ লোকদের আক্রমণের প্ল্যান বুঝিয়ে দিচ্ছে এখন সোহেল আর কবির। মমতারা বোধহয় স্টেনগুলো পরিষ্কার করছে।

কত লোক আছে ওই বাড়িতে? প্রতিরক্ষার কি ব্যবস্থা ওদের? কি অস্ত্র ব্যবহার করবে ওরা? সোফিয়াকে কি ওখানেই পাওয়া যাবে? বাড়ি ছেড়ে সরে পড়েনি তো ইকরামুল্লাহ? এসব প্রশ্ন এখন ভেবে কোন লাভ আছে? ঘুরে ফিরে বারবার একই কথা মনে আসছে কেন?

মাথা থেকে সব চিন্তা দূর করে দিয়ে কিছুক্ষণ একমনে সাঁতার কাটল রানা। খড়মড় করে মুখোশের কাচের গায়ে কয়েকটা পাতলা ডাল লাগল। ঝড়ে উপড়ানো

সেই কাঁঠাল গাছের ডাল। সড়াৎ করে বগল ঘেঁষে চলে গেল একটা শোল-মাছ। রাঙার মার প্রিয় মাছ। কপাল কেটে রক্ত ঝরছে, পড়ে আছে জ্ঞানহীন দেহটা, দেখতে পাচ্ছে রানা।

সাবধানে পার হলো রানা জায়গাটুকু। এদিকটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। চাঁদের আলো আড়াল করেছে উঁচু দেয়াল। ভালই করেছে। অ্যাকুয়ালাঙের বুদ্বুদ দেখতে পাবে না কেউ। সুড়ঙ্গ মুখে এসে হঠাৎ একটা অকারণ আতঙ্ক চেপে ধরল রানাকে। মনে হলো মৃত্যুর দুয়ারে এসে পৌঁছেছে সে। কিছু একটা বোধহয় ভুল হয়েছে ওর। এখনও ইচ্ছে করলে ফিরে যাওয়া যায়। থেমে দাঁড়িয়ে চিন্তা করবার ইচ্ছেটা দমন করল সে। যা হবার হবে। কোমরের বেল্টটা খুলতে খুলতে এগিয়ে গেল সে সুড়ঙ্গ পথ ধরে। আলো দেখা যাচ্ছে। সুড়ঙ্গের ঢালটা উপর দিকে উঠছে এখন। হোলস্টার ও পিস্তলসহ বেল্টটা ডান দেয়াল ঘেঁষে ছেড়ে দিল রানা। তারপর ধীরে ধীরে মাথাটা ওর ভেসে উঠল পানির উপর।

তিন দিক থেকে তিনটে নল এসে ঠেকল রানার মাথায়। কাচের মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মাওলানা ইকরামুল্লার হাসিমুখ।

'মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়ান জনাব মাসুদ রানা। কৌশল করতে গেলেই গুলি খাবেন।'

পরিষ্কার বাংলা। ধীরে ধীরে হাত তুলল রানা মাথার উপর। মুখোশটা খুলে হাতে নিল। স্টেনগানের নল দিয়ে জোরে খোঁচা দিল একজন ওর মাথায়। ছেড়ে দিল সে মুখোশটা হাত থেকে। বুঝতে পারল এক্ষুণি সুপারির সমান ফুলে যাবে মাথার পিছনে।

'বেশ। এবার ওপরে উঠে আসতে মর্জি হোক। তাড়াহুড়ো করবেন না, এখন পা পিছলালেও বিপদ, ঘাবড়ে গিয়ে হঠাৎ কারও আঙুল চেপে বসতে পারে ট্রিগারে। এঁদের দোষ দেই না—এঁরা গতকাল রাতে তিনজন আর গত পরশু দু'জন খাদেমকে হারিয়েছেন বলে ঠিক স্থির মস্তিষ্কে নেই। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে এঁদের আঙুল নিশপিশ করছে। কাজেই খুব ধীরে সুস্থে উঠে আসুন উপরে।'

সাবধানে উঠে এল রানা উপরে। চার-পাঁচ হাত দূরেই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ইকরামুল্লাহ। ঝাঁপ দেবে সে?

'এতদূর পৌঁছতে পারবেন না জনাব মাসুদ রানা।' যেন রানার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে, এমনি ভাবে বলল ইকরামুল্লাহ। 'যদি হঠাৎ আক্রমণ করার ইচ্ছে থাকে তাহলে আপাতত মুলতবী রাখতে পারেন। আমার পিছনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন আরও দু'জন সশস্ত্র খাদেম।' রানা চেয়ে দেখল অন্ধকার ঘরে ছায়ামূর্তি দেখা যাচ্ছে দুটো। 'বেশ। এবার দু'পা ফাঁক করে দাঁড়ান, যন্ত্রগুলো খুলে নেয়া হবে এখন আপনার পা থেকে। পিঠ থেকে সিলিন্ডারটা নামিয়ে ভারমুক্ত করা হবে আপনাকে।'

পা দুটো ফাঁক করে দাঁড়াল রানা, একজন অস্ত্র রেখে এগিয়ে এল কাছে, প্রথমে সিলিন্ডারটা নামানো হলো, তারপর খুলে নেয়া হলো যন্ত্রগুলো ওর উরু থেকে। আবার মুখ খুলল ইকরামুল্লাহ, 'পিস্তলটা কোথায়?'

'আমি নিরস্ত্র।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি, জনাব। কিন্তু পাঁচ মিনিট আগেও যে নিরস্ত্র ছিলেন না তা আমি হলপ করে বলতে পারি। পানির নিচে ঠিক কোনখানটা রেখেছেন জানতে চাইছি।'

চুপ করে রইল রানা।

'বলতে ইচ্ছে করছে না? ঠিক আছে দরকার নেই বলার। জনাব ইসমাইল, আপনাকে একটু পানিতে নামতে হচ্ছে কষ্ট করে। ডুব দিলেই পেয়ে যাবেন। পাঁচ হাতের মধ্যেই পেয়ে যাবেন ওটা।' পানিতে নেমে গেল ইসমাইল। এক ডুবেই তুলে আনল বেল্ট ও হোলস্টারসহ পিস্তলটা। 'এটা ওখানে রাখা হয়েছিল, ধরা পড়ার সম্ভাবনার কথা ভেবেই। জনাব মাসুদ রানা বুদ্ধি খরচ করেছিলেন। ভেবেছিলেন, যদি ধরা পড়ে যান তাহলে ওটা রয়ে যাবে পানির নিচে, ওঁর পরে যে ভদ্রলোক আসছেন, তিনি ওটা দেখেই বুঝে নেবেন যে প্রথম জন ধরা পড়েছেন পানি থেকে মাথা বের করেই। প্রথমে ওপরটা নিরাপদ কিনা দেখে নিয়ে আবার ডুব দিয়ে পিস্তলটা তুলে নেয়ার ইচ্ছে ছিল ওঁর—কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। কাজেই সাবধান হয়ে যাচ্ছেন পিছনের ভদ্রলোক। তাছাড়া আরও একটা ক্ষীণ আশা ওঁর মনের মধ্যে ছিল। যদি ধরা পড়ে যান, এবং যদি পিস্তলটার প্রশ্ন কেউ না তোলে, তাহলে কোন একটা সুযোগে নিজেকে মুক্ত করে এই পিস্তলটা কাজে লাগানোর সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। কিন্তু আমি আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি জনাব মাসুদ রানা,' পিস্তলটা বের করে যে রকম অভ্যস্ত হাতে ম্যাগাজিন ও চেম্বার পরীক্ষা করল ইকরামুল্লাহ, তাতে রীতিমত বিস্মিত হলো রানা। 'এ পিস্তল আপনার কোন কাজেই লাগবে না। এটা ব্যবহারের সুযোগ পাবেন না আপনি আর জীবনে। কিন্তু এরকম একটা চমৎকার হাতিয়ার আমাদের অনেক কাজে আসবে। যাক, এখানে দেরি করবার কোন মানে হয় না, শুধু একজন থাকলেই যথেষ্ট, জনাব গিলটি মিঞার কাছে কোন অস্ত্র নেই আমি জানি। অস্ত্র থাকলেও কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, পানি থেকে মাথা তোলার সাথে সাথেই গুলি করবার হুকুম রইল। আপনি নিশ্চিন্ত বসে আরাম করুন, রামপুরা থেকে বুদ্বুদ অনুসরণ করে লেকের পাড় ধরে এগিয়ে আসছেন আমাদের একজন খাদেম, আপনাকে ঠিক সময় মতই জানিয়ে দেয়া হবে ঠিক কখন পৌঁছবেন আমাদের মেহমান।' রানার পিছনে এসে দাঁড়াল ইকরামুল্লাহ পিস্তলটা হাতে নিয়ে। 'চলুন জনাব মাসুদ রানা, আপনার সাথে কিছু আলাপ আছে আমার।'

দুইজন প্রহরী দু'দিক থেকে মুচড়ে ধরল রানার দুই হাত। পিঠের কাছে স্পাইনাল কর্ডের উপর চাপ পড়ল পিস্তলের নলের। এগোল রানা।

তেরো

অয়্যারলেসের ছোট্ট ঘরটা পেরিয়েই দেখা গেল অস্ত্রাগার। বেশ বড় ঘর। থরে থরে সাজানো রয়েছে শত চারেক স্টেনগান, পঞ্চাশ ষাটটা এল. এম. জি, গোটা পনেরো মেশিনগান, কয়েকটা মর্টার ও বাযুকা, এবং অসংখ্য গ্রেনেড ও গোলাবারুদের বাক্স। এর পরের ঘরটা লম্বাটে, দুই ভাগে ভাগ করা—এক ভাগে কয়েকটা খাটিয়া পাতা গার্ডদের জন্যে, অন্য ভাগটা সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে উঠে গেছে উপরে। মেঝেতে নারকেল-ছোবড়ার তৈরি কম দামী কার্পেট বিছানো রয়েছে, কিন্তু সব কটা ঘরই কাঁচা মাটির, মাটির গন্ধ বাতাসে। প্রত্যেক দরজায় দু'জন করে সশস্ত্র গার্ড।

সিঁড়ির শেষে একটা দরজা। খুবই ছোট। কপাট দুটো খোলে ভিতর দিকে। দরজা থেকে হাত দেড়েক দূরে একটা প্রকাণ্ড কাঠের আলমারির পিছন দিক। আড়াআড়ি ভাবে টেনে বের করে আনল ওরা রানাকে আলমারির পিছন দিয়ে। ইকরামুল্লাহ একটু আড়াল হতেই ল্যাঙ মারল একজন রানার পায়ে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু মোচড়ানো হাত দুটো টেনে ধরে রাখল ওরা উপর দিকে। ভয়ানক ব্যথায় নীল হয়ে গেল রানার মুখ। আরেকটু জোরে হুমড়ি খেলে মড়াৎ করে ভেঙে যেত দুটো হাতই।

'ছি ছি ছি, আপনারা হুকুম অমান্য করছেন জনাব।' পিছন থেকে শোনা গেল ইকরামুল্লাহর কণ্ঠস্বর। আলমারির আড়াল থেকে বেরিয়েই নিমেষে বুঝে নিয়েছে সে ব্যাপারটা। 'আপনাদের বলেছি, দশটা মিনিট কথা বলতে চাই আমি এঁর সঙ্গে—তারপর যা খুশি করার সুযোগ পাবেন আপনারা। আগেই এঁকে পঙ্গু করে দিলে চলবে কি করে?'

লজ্জা পেয়ে গিয়ে মাথা নিচু করে হাসল ওরা। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করল রানা ব্যথাটা। চেয়ে দেখল এটা একটা নিখুঁত স্টোর-রূম। জানা না থাকলে কারও বোঝার উপায় নেই যে কাঠের আলমারিটার পিছনে সুড়ঙ্গ পথ আছে। উঠে এসেছে ওরা মাটির নিচে থেকে উপরে। ঘরটা পাকা। এঘর থেকে বেরিয়েই করিডর। বাম দিকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। স্টোর-রূমের দরজায় দু'জন গার্ড, সিঁড়ির মুখে আরও দু'জন। কয়েকজন লোককে একঝলক দেখতে পেল রানা, ড্রইংরূমে বসে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে, ঘরের কোণে রাখা টেলিভিশন সেট চালু রয়েছে, কিন্তু দেখছে না কেউ। মাউযারের খোঁচা খেয়ে বুঝল রানা এগোতে হবে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল দোতলায়। বারান্দায় এসে সামনের ফাঁকা জমি, দেয়াল এবং দেয়ালের

বাইরে চোখ বুলাল রানা। অন্ধকারে বিশেষ কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু বাড়ির সামনের লনের যেটুকু অংশে চাঁদের আলো পড়েছে সেখানে মানুষের গতিবিধি দেখতে পেল সে। প্রহরার ব্যবস্থায় কোন ফাঁক নেই ইকরামুল্লাহর। দোতলায়ও প্রত্যেক দরজায় প্রহরী।

হলঘর পেরিয়ে একটা দরজার কাছে এসে এগিয়ে গেল ইকরামুল্লাহ। টোকা দিল তিনটে, তারপর এগিয়ে গেল নিজেই দরজা ঠেলে। সাইমন। গালে কপালে কয়েক জায়গায় ইলাস্টোপ্লাস্টের তালি, দাঁতে চেপে ধরা একটা চুরুট। রানাকে দেখেই মাথা ঝুঁকিয়ে সবিনয়ে বলল, 'শুভ সন্ধ্যা স্পাই সাহেব, আসুন, আসুন।'

একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বসে রয়েছে সোফিয়া। সেলাই করা ঠোঁট। সেলাইয়ের ক্ষতগুলোতে পুঁজ জমেছে। বন্দী রানার দিকে বিস্ফারিত চোখে চাইল সোফিয়া। চোখের তারা থেকে নিভে গেল আশার শেষ আলোটুকুও। দুই চোখে তার মৃত্যুর কালো ছায়া।

'আপনার বান্ধবীকে এখানে দেখে অবাক হলেন না যে একটুও?' প্রশ্নটা করল ইকরামুল্লাহ। ওঁর বন্দী হওয়ার খবরও জানা আছে দেখছি আপনার জনাব মাসুদ রানা। বেশ বেশ। আপনার কাছ থেকে অনেক নতুন কথা জানা যাবে।' ইঙ্গিত করল সে প্রহরী দুজনকে। সোফিয়ার পাশে খালি চেয়ারটার দিকে ঠেলে নিয়ে চলল ওরা ওকে। ঘড়ি দেখল রানা, পোনে ন'টা। এতক্ষণে পৌঁছে যাবার কথা গিলটি মিঞার। পৌঁছেছে কি? ইকরামুল্লাহর হাতে পিস্তলটা এখন মাটির দিকে মুখ করা। বলল, 'আমার প্রথম প্রশ্ন, কেন এসেছেন আপনি এখানে?'

প্রাণপণ শক্তিতে লাথি মারল রানা মাওলানা ইকরামুল্লাহর পিছন দিকটায়। বলল, 'এই জন্যে।'

ছিটকে গিয়ে সাইমনের গায়ে ধাক্কা খেল ইকরামুল্লাহ। চুরুটটা পড়ে গেল মাটিতে, চট্ করে তুলে নিল সেটা সাইমন। থমকে গেছে ঘরের সবাই। প্রহরী দুজন আদেশের অপেক্ষায় উদগ্রীব। লাল হয়ে গেল মাওলানার ফর্সা চেহারা। রাগে অন্ধ হয়ে গেল সে কয়েক সেকেন্ড, রানার বুক লক্ষ্য করে পিস্তল তুলেছে, থরথর করে কাঁপছে হাতটা। কিন্তু অদ্ভুত মানসিক বল লোকটার। সামলে নিল। স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'বেঁধে ফেলুন।'

বেঁধে ফেলা হলো রানাকে সোফিয়ার মত করে। ঠিক একই সুরে, একই ভঙ্গিতে, যেন কিছুই ঘটেনি এমনি ভাবে একই কথার পুনরাবৃত্তি করল সে, 'আমার প্রথম প্রশ্ন, কেন এসেছেন আপনি এখানে?'

'তোমার বারোটা বাজাতে, শুয়োরের বাচ্চা!'

'আপনি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন জনাব মাসুদ রানা। অশালীন ভাষা ব্যবহার করলে আপনার মৃত্যুটা বড় যন্ত্রণাদায়ক হবে। আগে হোক পরে হোক, আমার সব প্রশ্নের জবাব আপনাকে দিতেই হবে। তার আগে আপনাকে খানিকটা মেরামত

করে নেয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি।' ইঙ্গিত দিল সে প্রহরী দুজনকে।

মিনিট দুয়েক শিলাবৃষ্টির মত কিল, চড়, কনুইয়ের গুঁতো ও গাঁট্টা পড়ল রানার নাকে, মুখে, ঘাড়ে, মাথায়। থামবার ইঙ্গিত করল ইকরামুল্লাহ হাত তুলে। একজনকে আদেশ করল, 'হাফেজ আলী মানসুরকে ডেকে আনুন।' লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই রানাকে বলল, 'আপনারা দুজন আলাদা ভাবে আসছিলেন কেন?'

'শুয়োরের বাচ্চা, (ছাপার অযোগ্য), কুত্তার বাচ্চা, হারামজাদা।'

সাইমন জিজ্ঞেস করল, কি বলছে রানা। ইকরামুল্লাহ ইংরেজীতে বুঝিয়ে দিল। জ্বলন্ত চুরুটটা দিল সে ইকরামুল্লাহর হাতে। চুলের মুঠি ধরে মুখটা উপর দিকে তুলে রানার গালে ঠেসে ধরল সেটা ইকরামুল্লাহ দশ সেকেন্ড। দাঁতে দাঁত চেপে ছটফট করল রানা, দরদর করে পানি বেরিয়ে এল চোখ থেকে, নিভে গেল চুরুট। আধ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট বৃত্তাকার একটা ফোস্কা পড়ে গেল জায়গাটায়। ভয়ানক জ্বলছে।

'আমি জানতে চাই, আপনি ঠিক কি প্ল্যান নিয়ে এখানে এসেছেন? একসাথে না এসে আগে পরে আসা স্থির করলেন কেন? আজ সন্ধ্যায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে যে ঘটনা ঘটেছে তার সাথে আপনার কোন সম্পর্ক আছে কিনা? সুড়ঙ্গ পথে এখানে ঢোকা নিরাপদ নয় জেনেও এই পথেই কেন এলেন?' উত্তরের অপেক্ষায় রানার মুখের দিকে চাইল ইকরামুল্লাহ।

(ছাপার অযোগ্য), (ছাপার অযোগ্য), (ছাপার অযোগ্য), (ছাপার অযোগ্য)।

ঘরে ঢুকল হাফেজ আলী মানসুর। হাতে একটা তেনা জড়ানো গরু জবাই করার প্রকাণ্ড ছুরি। ক্ষুরধার ব্লেডটাই পনেরো ইঞ্চি, বাঁট সহ বিশ ইঞ্চি হবে লম্বায়। পিস্তলটা টেবিলের উপর রেখে হাত বাড়িয়ে ছুরিটা চাইল ইকরামুল্লাহ। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তুলে দিল সে ছুরিটা মাওলানার হাতে। মৃদু হাসল মাওলানা, বলল, 'ভয় নেই জনাব, আসল কাজটা আপনিই করবেন, আমি এর ধারটা পরীক্ষা করব কেবল।'

আশ্বস্ত হয়ে লোভাতুর দৃষ্টিতে চাইল সে রানার দিকে। ঘোলাটে জল্লাদের দৃষ্টি। জবাইয়ের সময় রানার মুখের চেহারায় ও শরীরের কি প্রতিক্রিয়া হবে কল্পনা করছে সে। আন্দাজ করার চেষ্টা করছে কয়টা পোচ লাগবে ধড় থেকে মাথাটা সম্পূর্ণ আলাদা করতে। তেনাটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে খুলছে ইকরামুল্লাহ।

ঠিক এমনি সময় ঠক্ ঠক্ দুবার টোকা পড়ল দরজায়। ঘরে ঢুকল ইসমাইল। উত্তেজিত।

'কি ব্যাপার জনাব ইসমাইল? খুব পেরেশান মনে হচ্ছে?'

'পালিয়েছে হুজুর!'

'কে?' ভুরু জোড়া কুঁচকে গেছে ইকরামুল্লাহর।

'ওই লোকটা, কি যেন নাম···গিলটি মিঞা।'

'কি করে পালাল? পানি থেকে মাথাটা তোলা মাত্রই গুলি করার হুকুম ছিল।'

'ও ব্যাটা আসেইনি হুজুর। যিনি অনুসরণ করছিলেন তিনি এইমাত্র খবর দিলেন, ভুড়ভুড়িগুলো শেষ ব্রিজটার তলায় এসেই শেষ হয়ে গেছে, আর কোন চিহ্নই নেই। হয় ডুবে মরেছে, নয়তো পালিয়েছে লোকটা।'

আশ্বস্ত হলো রানা কথাটা শুনে। কিন্তু মুখের ভাবে কিছুই প্রকাশ পেল না। গিলটি মিঞা ব্রিজ পর্যন্ত এসেছিল, এটা মস্ত সুখবর।

'আপনি সুড়ঙ্গ ঘরটা খালি রেখেই চলে এসেছেন?'

'জ্বি না হুজুর, সালামকে বসিয়ে রেখে এসেছি। দুজনকে পাঠিয়েছি ব্রিজের তলায় লোকটাকে খুঁজে বের করার জন্যে।'

'বেশ করেছেন।' খুশি হলো ইকরামুল্লাহ। আপাদ-মস্তক চেয়ে দেখল একবার ইসমাইলকে। 'আপনি শীতে কাঁপছেন। ভেজা কাপড় ছেড়ে ফেলুন গিয়ে। আপনার ডিউটি অফ।'

'বহুত আচ্ছা, হুজুর।' বেরিয়ে গেল ইসমাইল।

রানার দিকে ফিরল ইকরামুল্লাহ ছুরি হাতে।

'আমরা বুঝতে পারছি, ভাল মত প্ল্যান-প্রোগ্রাম করেই এসেছেন আপনি। জনাব গিলটি মিঞার হঠাৎ হারিয়ে যাওয়াটাও কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এটাও প্ল্যানের অংশ। আমরা জানতে চাই, কি সেই প্ল্যান? এরই উপর নির্ভর করছে আমাদের নিরাপত্তা। কাজেই মুখ খুলতেই হবে আপনাকে।'

মুখ খুলল রানা। '(ছাপার অযোগ্য), (ছাপার অযোগ্য), গাধার বাচ্চা, খচ্চড়, (ছাপার অযোগ্য)···'

হালকা করে ছুরিটা রানার গলার কাছে বুকের উপর ঠেকিয়ে টেনে নাভি পর্যন্ত নামিয়ে আনল ইকরামুল্লাহ আলতো ভাবে। ইঞ্চির এক চতুর্থাংশ গভীর একটা লম্বা দাগ পড়ল প্রথমে। বুক থেকে নাভি পর্যন্ত চামড়াটা চিরে গিয়ে দু'ফাঁক হয়ে গেছে। তিন সেকেন্ড সাদা দেখাল জায়গাটা, তারপর কুলকুল করে উষ্ণ রক্তের ধারা নামল। নাভির গর্ত ভরে গিয়ে নেমে এল রক্ত জাঙ্গিয়ার উপর। লাল হয়ে যাচ্ছে ঘিয়ে রঙের জাঙ্গিয়া। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দেখছে সোফিয়া সেটা। রানার মাথার মধ্যে দ্রুত চলেছে চিন্তা। ন'টা বাজতে চার মিনিট আছে আর। এক্ষুণি নতুন খবর আসবে।

ঠক্ ঠক্, ঠক্ ঠক্। আবার টোকা পড়ল দরজায়। ঘরে ঢুকল দুজন সশস্ত্র প্রহরী। ভয়ানক উত্তেজিত।

'কি ব্যাপার জনাব মূসা?' বোঝা গেল ওদের এখানে দেখে অবাক হয়েছে ইকরামুল্লাহ। উদ্বিগ্ন ওর কণ্ঠস্বর।

পাঁচজন লোক পজিশন নিয়েছে হুজুর বাড়ির চারপাশে। একজন জেনানা

আছে ওদের সাথে। সবারই হাতে হাতিয়ার!'

চট্ করে ফিরল ইকরামুল্লাহ সাইমনের দিকে। একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে নির্বিকার চুরুট টানছিল সে, খবরটা শুনেই সটান হয়ে বসল। বলল, 'এরা সেই দল। কিন্তু কি চায় ওরা এখানে? বাড়িই বা চিনল কি করে?' চিন্তিত দেখাচ্ছে সাইমনকে। 'অবশ্য ঢুকতে গেলেই মারা পড়বে, কিন্তু তবু, চিন্তার কথা…'

'ঠিক আছে জনাব মূসা।' মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে আদেশ দিল ইকরামুল্লাহ। 'আপনারা সব কজন গার্ড যুদ্ধের জন্যে তৈরি হয়ে যান, আমি বাকি সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি। খেয়াল রাখবেন, ওরা আক্রমণ করলেই কেবল আমরা গুলি ছুঁড়ব, নইলে নয়। ওরা যদি বাড়ির চারপাশে কয়েক পাক ঘুরে ঢোকার পথ না পেয়ে ফিরে যায়, কিংবা দেয়াল ডিঙাতে গিয়ে শক্ খেয়ে মারা পড়ে বা পালিয়ে যায় তাহলেই সবচেয়ে ভাল। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর গুলি ছুঁড়ব আমরা। বুঝতে পেরেছেন?'

'জ্বি, হুজুর।' দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল গার্ড দুজন।

টেবিলের ওপর থেকে একটা মাইক্রোফোনের স্পীকার তুলে নিল ইকরামুল্লাহ, একটা বোতাম টিপে ধরে বলল, 'যে যেখানে আছেন, হুঁশিয়ার হয়ে যান। বিপদের সম্ভাবনা আছে। এ বাড়ির ওপর হামলা আসতে পারে। কিন্তু ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। পরবর্তী আদেশের জন্যে অপেক্ষা করুন সবাই।' বোতাম ছেড়ে দিয়ে স্পীকারটা নামিয়ে রাখল সে টেবিলের উপর। আবার ফিরল রানার দিকে। 'এরা আপনার লোক?'

জবাব দিল না রানা। মনে মনে বলল—আমার না তো কি তোমার?

'হি ইজ কিলিং ইয়োর টাইম।' বলল সাইমন ইকরামুল্লাহকে। 'বুঝতে পারছেন না, দেরি করাতে চেষ্টা করছে ও। সময় নিচ্ছে। দুইবার ঘড়ি দেখেছে ও এই ঘরে আসার পর। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, কিন্তু ওর মুখ থেকে কিচ্ছু বের করা যাবে না। তার চেয়ে আসুন আমরা একটা প্ল্যান অফ ডিফেন্স তৈরি করে ফেলি। দুই নম্বর এসকেপ রুটটা এখনি খোলা দরকার বলে মনে করছি…'

রানা মনে মনে বলল—ওটা খোলাই আছে বাছা। ওই পথেই ঢুকেছে গিলটি মিঞা।

'মাই ডিয়ার…' আশ্বস্ত করার জন্যে মুখে হাসি টেনে এনে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ইকরামুল্লাহ, এমন সময় জোরে জোরে ছয়টা টোকা পড়ল দরজায়। আবার এসে হাজির হয়েছে মূসা। দৌড়ে এসেছে বলে হাঁপাচ্ছে। দুই চোখ বিস্ফারিত। ঘড়ি দেখার ইচ্ছে দমন করল রানা। আন্দাজ করল, এখনও এক মিনিট বাকি আছে নটা বাজতে।

'হুজুর! তিনটা ট্রাকে করে ষাট-সত্তুর জন লোক এসেছে। মনে হচ্ছে সাদা পোশাকে আর্মির লোক। ঘিরে ফেলেছে বাড়িটা। সবার হাতেই অস্ত্র। ট্রাকের

ওপর ভারী অস্ত্রও আছে, নামিয়ে ফিট করছে ওরা এই বাড়ির দিকে।'

রানা মনে মনে বলল খামোকা ভয় পাচ্ছ বাবা। ওরা এসেছে আসলে ভয় দেখাতে, ফাঁকা আওয়াজ করবে কেবল ওরা। বাড়িতে ঢুকবে মাত্র পাঁচজন। যদি জানতে···

খবরটা শুনেই ঝাঁপিয়ে পড়ল সাইমন টেলিফোনের উপর। দ্রুত ডায়াল করল সে মিশন অফিসের নাম্বারে।

'হ্যালো! দিস ইজ সাইমন। ওয়ান্ট টু স্পীক···' কথার মাঝেই থেমে গেল সে। বার কয়েক টোকা দিল সে ক্রাডলে। রানা বুঝল লাইন কেটে দেয়া হয়েছে টেলিফোনের। খটাং করে রেখে দিল সাইমন রিসিভারটা। ফিরল ইকরামুল্লাহর দিকে।

ততক্ষণে দ্রুত নির্দেশ দিতে শুরু করেছে ইকরামুল্লাহ মাইক্রোফোনে। 'দশ নম্বর বিপদ সঙ্কেত দেয়া হচ্ছে সবাইকে। যে যেখানে আছেন চলে আসুন সিঁড়ি ঘরের কাছে। তিন নম্বর ইউনিটকে অস্ত্র সরবরাহ করতে বলা হচ্ছে। সবাই অস্ত্র হাতে প্রস্তুত হয়ে যান আত্মরক্ষার জন্যে। অল্পক্ষণের মধ্যেই হামলা আসতে পারে। এগারো নম্বর ইউনিটকে দুই নম্বর এসকেপ রুট খুলতে বলা হচ্ছে।' মাইক্রোফোন রেখেই ঝট্ করে ফিরল সে রানার দিকে। জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো, মুখে ক্রূর হাসি। 'যত যা-ই করুন, আপনার আজ নিস্তার নেই জনাব মাসুদ রানা।' ইঙ্গিত করল সে গার্ড দুজনকে, 'এদের বাঁধন খুলে নিয়ে যান বধ্য ঘরে।' ঝট্‌পট্ বাঁধন খুলে দাঁড় করানো হলো দুজনকেই। রানার ডানহাতটা বাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পিঠের কাছে, যতদূর যায় ঠেলে তোলা হয়েছে উপর দিকে, যাতে নড়াচড়ার ক্ষমতা না থাকে। 'বুঝতে পেরেছি, সরকারী আক্রমণ হচ্ছে আমাদের উপর। উচ্ছৃঙ্খল মুক্তি সেনার আচরণ বলে ভাঁওতা দেয়া হবে বিদেশীদের। কিন্তু জনাব মাসুদ রানা···' থমকে গেল মাওলানা ইকরামুল্লাহ কথার মাঝখানে। ঘরের উজ্জ্বল বাতি একবার নিভু নিভু হয়ে আবার জ্বলে উঠল। সাথে সাথেই গুনতে শুরু করল রানা মনে মনে, এক হাজার এগারো, দুই হাজার এগারো তিন হাজার এগারো··· এটা গিলটি মিঞার সিগন্যাল। 'বাতিটা এরকম করে উঠল কেন? হাফেজ আলী মানসুর, ছুরিটা ধরেন আমি দেখছি···'

দপ্ করে নিভে গেল সারা বাড়ির সবকটা বাতি একসাথে। পরমুহূর্তে চারপাশ থেকে একসাথে গর্জে উঠল সত্তর আশিটা হালকা, মাঝারি ও ভারী আগ্নেয়াস্ত্র। ব্যাপারটার আকস্মিকতায় ঢিল হয়ে গেল প্রহরীর হাত।

এক ঝটকায় সামনে নিয়ে এল রানা পিছনের লোকটাকে। কাঁচের জানালার সামান্য আলোয় দেখতে পেল রানা ইকরামুল্লাহর ছায়ামূর্তি। ডান হাতটা উপরে উঠে গেছে। বিদ্যুৎ বেগে ছুরি চালাল ইকরামুল্লাহ রানা যেখানটায় দাঁড়িয়েছিল সেই জায়গা লক্ষ্য করে। এক পা পিছিয়ে গেল রানা। ঘ্যাচ করে কেটে মাটিতে গড়িয়ে

পড়ল প্রহরীর কল্লা। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছিটে এসে লাগল রানার চোখে মুখে। কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না রানা, তবু আন্দাজের উপর নির্ভর করে ডাইভ দিল সে। মাথাটা গিয়ে লাগল ইকরামুল্লাহর সোলার প্লেক্সাসে। 'হুঁক্' শব্দ বেরোল মাওলানার মুখ থেকে, চিৎ হয়ে পড়ে যাচ্ছে সে। ছুরিটা হাত থেকে ছুটে গিয়ে ঝন্ঝন্ করে পড়ল মেঝের উপর। গলা টিপে ধরল রানা ইকরামুল্লাহর। দুই হাতে রানাকে বুকের উপর থেকে ঠেলে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করছে মাওলানা। এগিয়ে আসছিল হাফেজ আলী মানসুর মাওলানাকে সাহায্য করতে, রানার এক লাথি খেয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। ছটফট করছে ইকরামুল্লাহ। গায়ে প্রচণ্ড শক্তি আছে লোকটার বুঝতে পারল রানা। এক গড়ান দিয়ে রানার বুকের উপর উঠে এল সে। কিন্তু থামতে দিল না রানা, একই গতিতে সে-ও আরেক গড়ান দিয়ে উঠে এল আবার ওর বুকের উপর। কণ্ঠনালী ছাড়ল না। একটা চেয়ারে পা বাধল রানার।

বাইরে প্রচণ্ড গোলাগুলি চলেছে দু'পক্ষেই। অস্ত্র সরবরাহের সুযোগ পায়নি এরা। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এপক্ষ দুর্বল। ঠিক এমনি সময়ে চারিপাশ থেকে সার্চ লাইট ফেলা হলো বাড়ির ভিতর। আলোকিত না হলেও অনেক ফর্সা হয়ে গেল এঘরের অন্ধকার কাচের জানালা দিয়ে আলো এসে। আবছা ভাবে সবই দেখা যাচ্ছে এঘরে। রানা দেখল দরজার কাছে চলে গেছে সাইমন সোফিয়াকে নিয়ে। টেবিলে রাখা রানার মাউযারটা ওর হাতে। আরেক গড়ান দিল ইকরামুল্লাহ, ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে ওর চোখ। পড়ে গেল একটা চেয়ার। সরে যাচ্ছে রানা ইকরামুল্লাহর বুকের উপর থেকে। একটু কাৎ হতেই গুলি করল সাইমন। মনে হলো হাতুড়ির প্রচণ্ড একটা ঘা দিল কেউ রানার বাম হাতে। ঢিল হয়ে এল রানার হাত। এক ধাক্কা দিয়ে গলা থেকে রানার হাত সরিয়ে দিয়ে উঠে যাচ্ছে ইকরামুল্লাহ। চোখটা আঁধার হয়ে আসতে চাইছে রানার, অন্ধের মত হাতড়ে দাড়ি পেল সে মাওলানার, তাই চেপে ধরল। এক হেঁচকা টান দিয়ে মাথাটা সরিয়ে নিল ইকরামুল্লাহ। পড়পড় করে ছিঁড়ে রয়ে গেল রানার হাতে একগোছা দাড়ি। হলঘরের মাঝামাঝি চলে গেছে সাইমন, চলে যাচ্ছে ইকরামুল্লাহও, পা চালাল রানা মরিয়া হয়ে। লাথি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, একটা চেয়ার ধরে টাল সামলে নিল মাওলানা। আছড়ে পাছড়ে দরজার দিকে এগোচ্ছে সে।

ছুরিটা হাতে ঠেকল। এই শেষ সুযোগ। মাথা ঠিক রাখো রানা, মাথাটা ঠিক রাখো, ঢলে পড়ো না কিছুতেই—নিজেকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করল রানা। হাঁটু গেড়ে বসল, সমস্ত মনোবল একত্রিত করে ভাল মত লক্ষ্যস্থির করল, তারপর ছুঁড়ল ছুড়িটা চৌকাঠের বাইরে এক পা দিয়েছিল ইকরামুল্লাহ, হঠাৎ পিছন দিকে বাঁকা হয়ে গেল ওর শরীর, দুই হাত শূন্যে ছুঁড়ল, তারপর দড়াম করে পড়ল চিৎ হয়ে। ছুরিটা ছ'ইঞ্চি ঢুকেছিল, এবার শরীরের চাপে পুরোটা ঢুকে গেল, ছ'ইঞ্চি বেরিয়ে এল বুক ফুঁড়ে বাইরে।

কেউ নেই এঘরে। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল রানা। প্রহরীর মুণ্ডহীন ধড়টা ডিঙিয়ে ইকরামুল্লাহর পাশে এসে দাঁড়াল। পা দিয়ে ঠেলে কাত করল মৃতদেহটা। ছুরিটা টেনে বের করার চেষ্টা করল। পিচ্ছিল হয়ে গেছে বাঁটটা রক্তে ভিজে, বের করা গেল না। সাইমন বেরিয়ে যাচ্ছে হল ঘর থেকে। সোফিয়াকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সে সাথে। রানা বুঝল রেকডগুলো নষ্ট করতে যাচ্ছে সাইমন। ইকরামুল্লাহর পকেটে ডুপ্লিকেট চাবী পেল সে আয়রন সেফের। এগিয়ে গেল রানা।

প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ চলেছে। খুব কাছাকাছি গুলির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে এবার, এক আধটা মরণ চিৎকার শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। তার মানে দেয়াল ডিঙিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়েছে নিশ্চয়ই মমতারা। সামান্য যেটুকু প্রতিরোধ চলেছে এখনও, স্তব্ধ হয়ে যাবে একটু পরেই। রানা বুঝতে পারছে, কি ফাঁদ পাতা আছে টের পাচ্ছে না বলে দুই নম্বর এসকেপ্ রুট দিয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে ওরা, এবং টপাটপ ধরে ধরে তোলা হচ্ছে ওদের আর্মি ট্রাকে। মর্টারের দ্রুম দ্রুম আর মেশিন গানের ধা ধা ধা ধা ধা ধা ধা শুনে মনে হচ্ছে কি ভয়ঙ্কর যুদ্ধই না চলছে। এগুলো সব ফাঁকা আওয়াজ, একথা জানা থাকলে পাঁচ মিনিটেই খতম করে দিতে পারত ওরা গেরিলা পাঁচজনকে।

পিছু ফিরে চাইল একবার সাইমন। চিনতে পারল কি? নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে রানা। মাথা ঘুরছে ওর, মনে হচ্ছে এক্ষুণি ঢলে পড়ে যাবে, দরদর করে রক্ত ঝরছে বাম বাহু থেকে, দ্রুত দুর্বল হয়ে যাচ্ছে শরীরটা, বসে পড়তে ইচ্ছে করছে। আর কিছুক্ষণ! নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করল রানা, আর কিছুক্ষণ সহ্য করে নাও রানা, আসল কাজই বাকি আছে, কাগজপত্র নষ্ট করতে দিলে চলবে না, ওগুলো উদ্ধার করতেই হবে, একটু শক্ত হতে হবে, আর একটু এগোতে হবে, এখন বসে পড়লে চলবে না।

সিঁড়ির কাছে গিয়েই আবার পিছিয়ে এল সাইমন কয়েক পা। দেয়ালের গায়ে সেঁটে দাঁড়িয়েছে সে সোফিয়াকে সামনে চেপে ধরে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে কেউ উপরে। পিস্তল তাক করেছে সাইমন।

'নিশ্চয়ই আমাদের কেউ!' ভাবল রানা। দ্রুত হয়ে গেল চলার গতি। একটু দেরি হয়ে গেলে হয়তো মারা পড়বে নিজেদের কোন লোক।

কিন্তু গুলি ছুঁড়ল না সাইমন। পায়ের শব্দটা দোতলায় উঠেই থামল না, উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে দোতলার ছাতে। রানা বুঝল একটু পরেই ছাতে বসানো মেশিনগানটা স্তব্ধ হয়ে যাবে। দ্রুত পায়ে সিঁড়িঘরটা পার হয়ে আবছা অন্ধকারে একটা ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল সাইমন। এদিক ওদিক চেয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে। দরজাটা বন্ধ করার আগেই পৌঁছে গেল রানা, প্রাণপণ শক্তিতে লাথি মারল। ঘুরে গেল দরজার একটা পাট। পিস্তলটা ছিটকে পড়ে গেল সাইমনের হাত থেকে। সাথে সাথে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল সোফিয়া পিস্তলের উপর। তার উপর

ডাইভ দিয়ে পড়ল সাইমন। হাতটা মুচড়ে ধরে সহজেই কেড়ে নিল সে পিস্তলটা। এক লাথি খেয়ে ঘরের কোণে ছিটকে চলে গেল সোফিয়া, দেয়ালে ঠুকে গেল মাথাটা। উপুড় হয়ে পড়ে গেল সোফিয়ার জ্ঞানহীন দেহ মেঝের উপর।

ঘরের ভিতর এসে দাঁড়িয়েছে রানা। বাইরে ধুপধাপ পায়ের শব্দ। গুলির আওয়াজ কমে এসেছে।

'দরজাটা বন্ধ করে দাও মাসুদ রানা।' সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সাইমন। পিস্তলটা সোজা রানার বুকের দিকে ধরা। 'টুঁ শব্দ করলে গুলি করব। পাঁচ পর্যন্ত গুনব। এক, দুই, তিন...'

দরজা বন্ধ করে দিল রানা। আশা করছিল পিছন ফিরলেই গুলি করবে সাইমন, কিন্তু তেমনি পিস্তল ধরে দাঁড়িয়ে আছে সে। রানাকে এখন বড় দরকার ওর। এখনি মেরে ফেলা উচিত বলে মনে করল না।

'এই ঘরে যদি ঢুকতে চায়, দরজা না খুলেই কথা বলে বিদায় করবে তুমি ওদের। যদি আমার আদেশ পালন না করো, যদি ওরা ঢুকে পড়ে এই ঘরে, জেনে রেখো তোমাদের দুজনকে না মেরে আমি মরছি না।'

'যদি তোমার আদেশ পালন করি তাহলে তুমি বেঁচে যাচ্ছ সাইমন, কিন্তু আমাদের কি লাভ হচ্ছে?' দুর্বল কণ্ঠে বলল রানা। যতটা দুর্বল বোধ করছে তার চাইতেও অনেক দুর্বল শোনাল নিজের কণ্ঠটা নিজের কানেই।

'প্রাণে বেঁচে যাচ্ছ, এই লাভ হচ্ছে।' কর্কশ কণ্ঠে বলল সাইমন। 'আমি এই আলমারির কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলে সমস্ত প্রমাণ নষ্ট করতে পারলেই সন্তুষ্ট। তোমাকে হত্যা করার প্রয়োজন আমার নেই। আমি যদি প্রাণে বাঁচি, তুমিও বাঁচবে, কিন্তু আমাকে এদের হাতে ধরিয়ে দিলে আমি তোমাকে নিয়ে মরব।'

প্রতিশ্রুতির প্রথম অংশটুকু অবিশ্বাস করলেও, শেষের অংশটুকু বিশ্বাস করল রানা। সাইমনের দিকে চেয়ে আছে সে, কিন্তু আবছা ভাবে দেখতে পেল নড়ে উঠল সোফিয়ার জ্ঞানহীন দেহটা।

'রানা! মাসুদ সাহেব! রানা ভাই!' বাইরে কয়েকজনের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। হল-ঘরের দিকে চলে গেল ওরা দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে উঠে।

গুলির আওয়াজ আসছে না আর। ঘড়ি দেখল রানা, নয়টা বেজে নয় মিনিট। আর এক মিনিট পরই ফিরে যাবে সবাই। নয়টা দশের পর এক সেকেন্ডও কেউ থাকবে না এ বাড়ির মধ্যে—কঠোর নির্দেশ দেয়া আছে রানার। যে যেমন ভাবে পারে বেরিয়ে যাবে, আহত বা মৃত কাউকে যদি সাথে নিতে হয়, এই দশ মিনিটের মধ্যেই সারতে হবে সে কাজ।

রানা লক্ষ করল হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে সোফিয়া সাইমনের দিকে। কান খাড়া করে বাইরের শব্দ শোনার চেষ্টা করছে সাইমন, তাই টের পেল না। ফিরে আসছে পায়ের শব্দ হলঘরে রানাকে না পেয়ে। সোহানার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল

রানা। ডাকছে ওর নাম ধরে। এ ঘরের পাশ দিয়ে চলে গেল ওরা ডান দিকে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল রানা বন্ধ দরজার গায়ে হেলান দিয়ে অলস ভঙ্গিতে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল পায়ের শব্দ। সাইমনের মুখে বিজয়ের হাসি।

উঠে দাঁড়াল সোফিয়া। এক লাফে এগিয়ে এসে দুই হাতে চেপে ধরল সাইমনের চুলের মুঠি! সাথে সাথেই ঝট্ করে পিছন ফিরল সাইমন। এবং ঠিক সেই মুহূর্তে ঝাঁপ দিল রানা। পিস্তল ধরা হাতের কব্জি চেপে ধরল রানা ডান হাতে। বুম্ করে একটা গুলি ছুটে দেয়ালে লাগল। বাম হাতটা তোলার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ অবশ হয়ে গেছে, একটু নড়ল মাত্র, তোলা গেল না। সোফিয়াকে ধর্তব্যের মধ্যেও না এনে ঠেলে নিয়ে গিয়ে দেয়ালের সাথে ঠেসে ধরল সাইমন রানাকে। বাম হাতটা অনবরত চলছে রেল এঞ্জিনের পিস্টনের মত সামনে পিছনে। নাকে মুখে বুকে ঘুষি পড়ছে দমাদম। দুর্বল হয়ে পড়েছে রানা ক্রমেই, ঝিমঝিম করছে মাথার ভিতর, নাক মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে। বাম হাতে রানার কণ্ঠনালী চেপে ধরল সাইমন। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে রইল রানা পিস্তল ধরা হাতটা, প্রাণপণ শক্তিতে চাপ দিল। বেঁকে যাচ্ছে সাইমনের কব্জিটা। হঠাৎ বুঝতে পারল সাইমন রানার মতলব। এটা জুডোর একটা বিখ্যাত হোল্ড। ট্রিগারের উপর এমনভাবে রয়েছে সাইমনের আঙুল এবং এমনভাবে বেকায়দা চাপ পড়েছে কব্জির উপর যে আরেকটু চাপ পড়লে হয় পিস্তলটা ছেড়ে দিতে হবে, নয়তো নিজের গুলিতে মারা পড়তে হবে নিজেকেই। চট্ করে কণ্ঠনালী ছেড়ে দিয়ে রানার হাত ধরার চেষ্টা করল সে। ফস্কে গেল হাত। চুল ধরে টেনে ঝুলে পড়েছে ওদিকে সোফিয়া। বেঁকে যাচ্ছে ডান হাতটা আরও। দাঁত বেরিয়ে পড়েছে রানার, শিরা ফুলে উঠেছে কপালের। হাঁটু চালাল রানা এবার তলপেট বরাবর। কুঁকড়ে গেল সাইমনের দেহটা। সাথে সাথেই ছুটল গুলি। সার্চ-লাইটের আলো নিভে গেল, এবং একই সাথে দপ্ করে জ্বলে উঠল আবার বাড়ির সব বাতি। অর্থাৎ, নয়টা দশ।

দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়ে মিনিট খানেক গড়াগড়ি করল সাইমন, তারপর স্থির হয়ে গেল।

টলছে রানা। পিস্তলটা রক্তে ভেজা জাঙ্গিয়ার ভিতর গুঁজে রেখে এগিয়ে গেল সে আলমারির দিকে। কাগজ পত্রগুলো উল্টে দেখল সে মিনিট দুয়েক। বিভিন্ন জেলায় কর্মরত খাদেমদের নাম ঠিকানা লেখা রেজিস্টার এবং প্রয়োজনীয় কয়েকটা ফাইল বাছাই করল সে। সময় নেই, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকজন এসে পড়বে।

বেরিয়ে এল রানা ঘর থেকে।

সোফিয়াকে সাথে আসতে বারণ করল সে। বলল, 'তুমি অপেক্ষা করো এখানেই। তোমার বাবা এসে যাবেন কিছুক্ষণের মধ্যেই। সব কথা খুলে বোলো তাকে। তাহলে তোমার আমার উভয়ের সরকারই বেঁচে যাবে অনর্থক কাদা

ঘাঁটাঘাঁটি থেকে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যা ঘটেছে সবটা শুনলেই উনি বুঝতে পারবেন কিভাবে ধামাচাপা দিতে হবে পুরো ব্যাপারটা।'

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল রানা। এখানে ওখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে লাশ।

চারদিক চুপচাপ। শান্ত পরিবেশ। চাঁদের আলো বিছিয়ে রয়েছে লন জুড়ে।

বাড়িটার পিছন দিকের বারান্দা ধরে কিছুদূর এগিয়েই থমকে দাঁড়াল রানা। শাহেদ না? স্বল্পালোকিত বারান্দার একটা থামে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে শাহেদ। মানুষের সাড়া পেয়ে চোখ মেলল।

'হ্যালো, টু-আই-সি মাওলানা! কোথায় গুলি খেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

পায়ের দিকে ইঙ্গিত করল শাহেদ। রানা দেখল দুই পা-ই জখম হয়েছে ওর। প্রচুর রক্ত জমে আছে মেঝেতে। মৃত্যুর অপেক্ষা করছে সে বসে বসে। স্টারলিং কারবাইনটা ধরাই আছে হাতে। রানার বাম হাতের ক্ষত দেখছে সে এখন।

'হাঁটতে পারবে না?'

মাথা নাড়ল শাহেদ। পারবে না। বলল, 'আপনিও আহত, মাসুদ ভাই। চলে যান, আমার জন্যে ভাববেন না।'

'এই কাগজপত্রগুলো ধরো। ফেলে দিয়ো না আবার, খুব দরকারী জিনিস।' খাতা ও ফাইলগুলো দিল রানা শাহেদের হাতে।

'শুধু শুধুই চেষ্টা করছেন মাসুদ ভাই। ভয়ানক জখম হয়েছেন আপনি। এক হাতে তুলতে পারবেন না আমাকে। চলে যান। দেরি করলে মারা পড়বেন।'

বহু কষ্টে টেনে হিঁচড়ে পিঠের উপর তুলল রানা শাহেদকে। টলতে টলতে চলল দুই নম্বর এসকেপ রুটের দিকে। মাঝপথে আছাড় খেল একটা। আবার উঠল। আবার তুলল শাহেদকে পিঠের উপর। আবার চলল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পঁচিশ গজ গিয়ে আবার পড়ল। উঠল। আবার চলল। থর থর কাঁপছে দুই পা।

বড় রাস্তায় এসে উঠতেই পনেরো মিনিট লাগল রানার। অনেক লোকের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে বাড়িটার গেটের সামনে। সাদা ডজটা এসে থামল পাশে, ঝটাং করে খুলে গেল পিছনের দরজা। রানার আশা ত্যাগ করতে পারেনি সোহানা, আদেশ অনুযায়ী ঠিক নয়টা দশেই বেরিয়ে গেছে সে বাড়িটা থেকে, কিন্তু আশপাশে ঘুর ঘুর করছিল এতক্ষণ।

পিছনের সীটে শুইয়ে দিতেই শোকর আলহামদুলিল্লাহ বলে জ্ঞান হারাল শাহেদ।

ঢোলা একটা কিমোনো ধরনের স্লিপিং গাউন পরে বসে আছে রানা দোতলার বারান্দায় ইজিচেয়ারে। ব্যান্ডেজ বাঁধা বাম হাত স্লিং-এ ঝোলানো। ডান হাতে

খবরের কাগজ।

ঝিলমিল করছে ধানমণ্ডী লেকের পানি সকাল নয়টার রোদ পড়ে। গাঙ চিলগুলো উড়ছে আকাশে। মৎস্য-শিকারী এসে পৌঁছোয়নি এখনও। ধূমায়িত কফির কাপ রেখে গেছে বেয়ারা টেবিলের উপর।

কোন খবর নেই কাগজে। উল্লেখ পর্যন্ত নেই গত রাতের ঘটনার। সোহেলকে ঝড়ের বেগে আসতে দেখে কাগজটা নামিয়ে রাখল রানা। গতি দেখেই বোঝা যাচ্ছে টগবগ করে ফুটছে সে উত্তেজনায়।

'বেশি ব্যস্ত মনে হচ্ছে দোস্ত?' বলল রানা।

'হ্যাঁ। খুব ব্যস্ত।' বলেই রানার সামনে থেকে কফির কাপটা খপ্ করে তুলে নিয়ে চুমুক দিল সোহেল। 'তুই তো শালা ইঞ্জেকশন খেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লি, সারারাত ঘুম নেই আমার। ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি করতে করতে জান বেরিয়ে গেছে। হারলিং ব্যাটা ঘোড়েল লোক, গোলমাল পাকাতে চেয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা পর্যন্ত করেছিল কাল রাতেই। সে কী হম্বিতম্বি! খবর পেয়ে আমি গিয়ে পৌঁছলাম। গোটা দুই ফাইল সামনে ফেলে দিতেই একেবারে চুপসে গেল ব্যাটা। শেষ কালে পায়ে ধরতে চায়।'

'ওদের গ্যাঙের যে লিস্ট দিলাম, তার কি করেছিস?'

'চারদিকে খবর চলে গেছে অয়্যারলেসে। আজকের মধ্যেই ধরা পড়ে যাবে সব কটা।'

'কাল রাতে দুই নম্বর এসকেপ রুট দিয়ে ক'জন বেরিয়েছিল রে?'

'সাতাশ জন। দারুণ সব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে ওদের কাছ থেকে।'

'শাহেদ কেমন আছে?'

'আরে ওর কথা বলিস না। এক্ষুণি এলাম ওখান থেকে। ঘণ্টা দুয়েক আগে জ্ঞান ফিরেছে, ব্যস, সাথে সাথেই কোরান হাদিসের লম্বা লম্বা উদ্ধৃতি দিয়ে নার্সটাকে শবেকদরের তাৎপর্য বোঝাতে লেগে গেছে। ডাক্তারের সাথে কথা বলেছি। ভয়ের কিছুই নেই। মুখটা বন্ধ রাখলে সাত দিনেই সেরে উঠবে।'

গিলটি মিঞা এসে হাজির হলো বাম পাটা একটু খুঁড়িয়ে। বিধ্বস্ত চেহারা। খালি গায়ে একটা খশখশে কম্বল জড়ানো আলোয়ানের মত করে। চোখ দুটো লাল, কিন্তু দৃষ্টিটা নিষ্পাপ। সারা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

'কাল রাতে কোথায় গায়েব হয়ে গিয়েছিলে গিলটি মিঞা?' বলল রানা। 'তোমার না রিপোর্ট করার কথা?'

'আর বলবেন না স্যার। মারা পড়চিলুম আরাকটু হলেই। রিপোট কি করব, কাজ সেরে যেই বাইরে বেরিয়েচি কাঁঠাল গাচের গর্ত দিয়ে, ওমনি শালা এঁটকে দিল। কত করে বললুম, তা কে শোনে কার কতা। সবার সাতে আমাকেও বেঁদে এক্কেবারে টেরাকে করে নিয়ে গেল ক্যান্টনমেন। যন্তোনার একশেষ। সে কি রাম

প্যাঁদানি। কতা বললেই মারতে তেড়ে আসে। শেষ কালে ভোর ছ'টায় ওই গোঁপ-আলা সেপাইটা (মেজর কবির) এসে পড়ায় রক্ষে।'

'খুব মেরেছে বুঝি?' চেষ্টা করে সহানুভূতি টেনে আনল সোহেল গলায়।

'মেরেচে। কিন্তু এরা আর কি মারবে? ছেলেমানুষ। পুলিসের কাচে কিচুই না। সেই তুলনায় এদের মার আদরের মত মনে হয়। মার খেইচি একবার সাইফুদ্দিন দারোগার হাতে। ওরেব্বাপ। ওস্তাদ লোক। একেবারে রগে রগে মারে। ক্যালক্যাটায় একবার...'

'খাওয়া দাওয়া হয়নি নিশ্চয়ই?' রানা বাধা দিল তাড়াতাড়ি। 'তোমার সোহানাদি...'

'খেইচি স্যার। গোঁপ-আলা লোকটা খারাপ না। খুব করে খাইয়ে দাইয়ে ছেড়েচে।'

'তবে এরকম টলছ কেন?'

'টলচি ঘুমে। অসম্ভব ঘুম পেয়েচে। এখেনেই শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করচে। জলদি একটা বিছানা ম্যানেজ করতে হবে। যাই।'

গিলটি মিঞা নিঃশব্দ পদক্ষেপে চলে গেল সোহানার খোঁজে। নড়ে চড়ে বসল সোহেল।

'তুই কি মত পাল্টাবি না, রানা?'

'না।'

'শেষকালে গোয়েন্দাগিরি করবি? এটা কি একটা কাজ হলো? এদিকে আমি একা চালাই কি করে বল্?'

'সাহায্য চাইলেই পাবি। কিন্তু চাকরি আর করবই না স্থির করেছি।'

'দেখ্ রানা, আমি যেটুকু বুঝি, বিপদ, ভয় আর রোমাঞ্চ ছাড়া তোর জীবনটা অর্থহীন হয়ে যাবে। সাধারণ গোয়েন্দার মত তুই ছোটখাট কেস নিবি, তদন্ত করবি, তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করার চেষ্টা করবি—তোর সম্পর্কে এ ধারণা করতে আমার কষ্ট হয়। ভাল লাগবে না তোর কাছে এই কাজ, দেখিস। তোর যোগ্য কাজ এটা নয়। তুই কি মনে করিস না, বি. সি. আই-এর চীফ হিসাবে তোর অনেক কিছু করার আছে?' এক ঢোক কফি খেয়ে গলা ভেজাল সোহেল।

'অনেকগুলো প্রশ্ন একসাথে তুলেছিস তুই দোস্ত। এক এক করে জবাব দিচ্ছি। সাধারণ গোয়েন্দার কাজ আমি করতে যাচ্ছি না। যে কাজে বিপদ, ভয় আর থ্রিল নেই সেকাজে যাচ্ছি না আমি। তুই কল্পনাও করতে পারবি না কী সাঙ্ঘাতিক সব কাণ্ড চলেছে সমাজের উঁচু নিচু সর্বস্তরে। ভয়ঙ্কর অন্যায়, অত্যাচার আর অবিচার করছে মানুষ মানুষের উপর। আমি সাধারণ মানুষের পাশে থেকে যুদ্ধ করতে চাই; যতটা সহজ ভাবছিস তত সহজ হবে না ক্ষমতাশালীর বিরুদ্ধে দুর্বলের এই যুদ্ধ।' সিগারেট ধরাল রানা। 'আর তোর শেষ প্রশ্নের উত্তরে আমি ছোট্ট একটা প্রশ্ন

করব। তুই কি নিশ্চিত যে মেজর জেনারেল রাহাত খান মারা গেছেন?'

চমকে গেল সোহেল। চোখ দুটো বিস্ফারিত। চাপা গলায় বলল, 'না, নিশ্চিত নই। কিছু জানতে পেরেছিস তুই?' চকচক করে উঠল চোখ দুটো আগ্রহে।

'না।' মৃদু হাসল রানা। 'আমিও নিশ্চিত নই। কিন্তু আমার মনে হয় আমাকে সাধাসাধি না করে এ ব্যাপারটা ভাল করে খোঁজ নিয়ে দেখা উচিত তোর। তাছাড়া আমি তো দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি না কোথাও, যখন দরকার সাহায্য করতে পারব তোকে। আমাকে আর টানা হেঁচড়া করিস না।'

'তোর জন্যে সোহানাকেও হারাচ্ছি আমরা। তুই কাজে যোগ না দিলে সোহানা যোগ দেবে ভেবেছিস? যে রকম লটর-পটর ভাব লক্ষ করছি...'

'সোহানা যোগ দেবে। ওকে আমি সাথে নিচ্ছি না। ভয়ঙ্কর এক জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছি আমি। ওকে সাথে নিয়ে বিপদের মাত্রা বাড়াতে চাই না।'

কিছুটা আশ্বস্ত হলো সোহেল। ও জানে, কান টানলে মাথা আসে। সোহানাকে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে রাখতে পারলে রানাকেও পাওয়া যাবে দরকার মত।

সোহানা এল। ঝলমল করছে সকালের রোদের মত। অপরূপ সুন্দর লাগছে ওকে।

'আরে, আপনি ওর কফিটা খেয়ে ফেলেছেন!' আঁতকে উঠল সোহানা। 'আপনার জন্যে তৈরি করতে বলেছি তো!'

'নাম লেখা তো আর নেই কফিতে। আমারটা ও খাবে।' বলল সোহেল নির্বিকার ভাবে। সোহানাকে একটু ইতস্তত করতে দেখে যোগ করল, 'কেন, ওর কফিতে বিশেষ হৃদয়ের স্পর্শ দিয়েছিলেন নাকি?'

'না। ঘুমের ওষুধ দিয়েছিলাম।'

'ও—রে—বা—বা! গেছি, রানা, ফিনিশ হয়ে গেছি! অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। এখন নাক ডাকিয়ে ঘুমালে তো চলবে না। কি করি এখন!' খাবলা দিয়ে রানার সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিল সোহেল। একটা বের করে ধরিয়ে নিয়ে বলল, 'এর ভেতর আবার চরস বা মারিযুয়ানা নেই তো!'

প্রমাণ কই?

প্রথম প্রকাশ: জুন, ১৯৭২

এক

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ নেই। শূন্য পড়ে আছে মেজর জেনারেল রাহাত খানের পিঠ উঁচু রিভলভিং চেয়ারটা। চীফ নেই, মাসুদ রানা নেই, অথচ তিন মাসের মধ্যেই সুষ্ঠু ভাবে চলতে শুরু করেছে আবার সমস্ত কাজকর্ম। অগাধ পানিতে পড়েছিল সোহেল। মস্ত বোঝা চেপে গিয়েছিল ওর মাথার উপর। প্রথম একটা মাস দুশ্চিন্তা জর্জরিত সোহেলের বিমর্ষ চেহারা দেখলে রীতিমত মায়া হত সোহানার। মনে হত, কয়েক বছর বেড়ে গেছে বেচারার বয়স। কিন্তু হঠাৎ কি করে যেন আবার আগের মত হাসিখুশি হয়ে উঠেছে মানুষটা। সহজ, স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে সে চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার হিসেবে। হয় হঠাৎ নিজের মধ্যে প্রচণ্ড কোন শক্তি খুঁজে পেয়েছে সে, যার ফলে যোগ অঙ্কের মত সহজ হয়ে গেছে ওর কাছে সমস্ত কাজ; নয়তো অন্য কারও দক্ষ হাতে গুরু দায়িত্ব তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বেঁচেছে সে। অন্য আর কোন লোক দেখা যাচ্ছে না, কাজেই ধরে নেয়া যায় হঠাৎ রাতারাতি আত্মবিশ্বাস, বিচক্ষণতা ও কর্মদক্ষতা দশগুণ বেড়ে গেছে সোহেলের।

এটা যে একেবারে অসম্ভব, তা নয়। অনেক সময় দেখা গেছে কোন দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিকূল চাপের সম্মুখীন হলে মানুষ হঠাৎ নিজের মধ্যে প্রচণ্ড কোন ক্ষমতার উৎস আবিষ্কার করে বসে। এটা সম্ভব। কিন্তু কেমন যেন একটু সন্দেহ জাগে মাঝে মাঝে সোহানার মনে। সোহেলই যদি সবকিছু চালাবে তাহলে চীফের গদিতে বসছে না কেন সে? কেন শূন্য পড়ে রয়েছে সাততলার সেই কামরাটা, যার দরজার সামনে দাঁড়ালে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধায় আপনা আপনি নত হয়ে আসত প্রতিটা দুর্ধর্ষ, দুঃসাহসী এজেন্টের মাথা? কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার আগে টেলিফোনে কার সাথে কথা বলে সোহেল দরজা বন্ধ করে? চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটারের চেয়ারের পাশে ছোট্ট টিপয়ের উপর রাখা লাল টেলিফোনটা বাজলেই ঘর থেকে সবাইকে বের করে দেয় কেন সে? কিছু একটা গোলমাল আছে। অদৃশ্য কারও ছায়া যেন আঁচ করতে পারছে সোহানা। কে সে? মেজর জেনারেল রাহাত খান? রানা?

একটা ফটোগ্রাফী ইয়ার বুক ঘাঁটছিল সোহানা। আর ভাবছিল।

নাহ্, রানা কি করে হবে? গত দু'মাসে দু'বার মাত্র দেখা পেয়েছে সে রানার। অত্যন্ত ব্যস্ত সে! বাড়িতে পাওয়া যায় না, মতিঝিলে অফিস নিয়েছে একটা, সেখানে

থাকে না—কোথায় থাকে, কোথায় যায়, কি করে কেউ জানে না। মাঝে নাকি ঢাকার বাইরেও ছিল বেশ কিছুদিন। মনে হচ্ছে কত যুগ যেন দেখেনি সে রানাকে। ওকে দেখার জন্যে মনটা কেমন যেন করে ওর। ওকি প্রেমে পড়েছে? দূর, ওই লোকের প্রেমে পড়া যায় নাকি? আকর্ষণ বোধ করে ও, ব্যস এই পর্যন্তই। ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছিল লোকটা, বাইরেই রয়ে গেল। বাঁধনে পড়ে না বলেই কি ওর এত আকর্ষণ?

আজ অফ ডে। নায়লাকে নিয়ে তিনটার শোতে সিনেমায় যাবে ঠিক করেছে। সাজগোজ সেরে ছবির পাতা উল্টাচ্ছে এখন। টিকেট কেটে রেখেছে নায়লা ওর ভাইকে দিয়ে সকালেই। পৌনে তিনটা বাজলেই রওনা হবে সোহানা, নায়লাকে তুলে নিয়ে চলে যাবে অভিসারে। ঠিক দুটো চল্লিশে ফোন বেজে উঠল। সুরেলা মেয়েলী কণ্ঠস্বর। মাসুদ রানা কথা বলতে চান।

'দিন ওকে।' হঠাৎ কেন যেন বুকের মধ্যে ঢিব ঢিব শুরু হয়ে গেল সোহানার। বহুদিন অপেক্ষার পর এসেছে রানার ফোন। গোলাপী একটা আভা ছড়িয়ে পড়ল গালে। গরম হয়ে উঠেছে কান দুটো। নিজেকে শাসন করল সোহানা—এই, কি হচ্ছে! নিজের এই পরিবর্তনে আয়নার দিকে চেয়ে ভ্রূকুটি করল সে নিজেকে।

খুটখাট শব্দ, বাযারের অস্পষ্ট আওয়াজ খটাং, তারপর ভেসে এল রানার ভরাট কণ্ঠস্বর।

'কি করছ, সোহানা?'

'তোমার মুণ্ডুপাত করছি। মেয়েটা কে?'

'আমার নতুন অফিসের সেক্রেটারি।'

'নাম?'

'সালমা কবীর।'

'বয়স?'

'বাইশ।'

'গায়ের রঙ?'

'ফর্সা।'

'চেহারা?'

'অপূর্ব।'

'অবিবাহিতা?'

'হ্যাঁ।'

'দাঁড়াও! তোমার চোদ্দটা বাজাচ্ছি আমি!'

হো হো করে হাসল রানা। তারপর বলল, 'তোমার সব কথা শুনতে পাচ্ছে সালমা।'

'ছি ছি, আল্লা! তাই নাকি? সত্যি?'

'সত্যি না তো কি?'

'কসম লাগে তোমার, সত্যি, শুনতে পাচ্ছে?' সোহানার কণ্ঠে অনুনয়।

'না। ঠাট্টা করছিলাম। কি করছ এখন? পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাপড় পরে চলে আসতে পারবে?'

ধক করে উঠল সোহানার বুকের ভিতরটা। রানা ডাকলে কেন যে এরকম হয় বুঝতে পারে না সে। মনে হয়, এক্ষুণি ছুটে চলে যাই। সামলে নিয়ে তরল কণ্ঠে বলল সে, 'কেন? এত তাড়া কিসের? একেবারে পাঁচ মিনিটে...'

'তিনটের শোতে সিনেমা দেখব। ভাবছি তোমাকে নেব, না সালমাকে...'

'খবরদার! ও যদি তোমার সাথে যায় তাহলে ঠ্যাং ভেঙে দেব আমি ও মেয়ের। আমি আসছি।'

'জলদি এসো।'

'কোন্ হলে?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল সোহানা। 'কোন্ হলে ছবি দেখবে?'

'অভিসার।'

এই সেরেছে! 'দূর, বাজে বই চলছে ওখানে। অন্য কোন হলে চলো।'

'টিকেট কাটতে পাঠিয়ে দিয়েছি গিলটি মিঞাকে। বাজে বই মানে? তিন তিনটে অস্কার পেয়েছে...'

'দশটা অস্কার পেলেই বা কি? ওই হলে সিনেমা দেখতে আমার ভাল লাগে না। যাক, আসছি আমি, তারপর দেখা যাবে কোথায় যাওয়া যায়।'

'পৌনে তিনটে বাজে, তাড়াতাড়ি এসো। আমি অফিসে অপেক্ষা করছি তোমার জন্যে।'

'ঠিক আছে। মেয়েটাকেও সেই ফাঁকে এক নজর দেখে নেয়া যাবে। কিন্তু কথা নেই, বার্তা নেই, সিনেমা কেন হঠাৎ?'

'হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ল, তাই।'

'এতদিন মনটা কোথায় পড়ে ছিল?'

'কাজে ব্যস্ত ছিলাম।'

'হঠাৎ আমার কথা মনে পড়ল কেন?'

'শাট্ আপ! বাজে না বকে কাপড়-চোপড় পরে নাও।'

'কাপড় পরাই আছে, স্যার। আসছি।'

লাইন কেটে দিয়েই দ্রুত রিং করল সোহানা নায়লার নাম্বারে। সেই পুরানো গৎ—রাগ করিস না ভাই, আমার না, ভীষ...ণ মাথা ধরেছে।...সত্যি...না না, আর কিছু না, কেউ ফোন করেনি।...তুই তোর সেই মামাত ভাইটাকে নিয়ে যা না? ...ইশ্শ্, আমি যেন্ কিছু জানি না!...যাহ্ কি অসভ্য! রাখছি। রাগ করিস না কিন্তু!—ইত্যাদি।

রিসিভার নামিয়ে রেখে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সোহানা। বার

কয়েক চিরুনি বুলাল চুলে। পাউডারের পাফটা আরেকবার হালকা করে বুলাল মুখে, ঘাড়ে, গলায়। লিপস্টিক গাঢ় করে নিল আরেকটু। রানার প্রিয় সেন্ট শ্যানেল নাম্বার ফাইভ স্প্রে করল আঁচলে। শাড়ির কুঁচি ঠিক আছে কিনা ঘুরে ফিরে আয়নায় ভাল করে দেখে নিয়ে খুশি মনে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে। দীঘল একহারা শরীরে চমৎকার মানিয়েছে কাঞ্জিভরম।

বৈশাখের উত্তপ্ত দুপুর।

কর্মব্যস্ত শহরের প্রাণ চাঞ্চল্য ঝিমিয়ে এসেছে অনেকটা। রাস্তাঘাট প্রায় জনশূন্য। প্রখর রৌদ্রের দোর্দণ্ড প্রতাপ এখন রাজধানীর বুকে। এক চিলতে মেঘ নেই আকাশে। কার্নিসের এক চিলতে ছায়ায় বসে ঠোঁট ফাঁক করে হাঁপাচ্ছে কাক। শুকনো গরম বাতাস। রাস্তার পিচ গলে গিয়ে চড় চড় শব্দ উঠেছে গাড়ির চাকায়। তেতে উঠেছে গাড়ির ছাত তিন মিনিটেই।

মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়া।

বিশাল এক অট্টালিকার সাততলার উপর রানার এয়ার কন্ডিশন্‌ড্ অফিস স্যুইট।

লিফটে চড়ে উঠে এল সোহানা সাততলায়। লম্বা করিডর। বাঁ দিকের সবশেষ দরজায় আঁটা রানার নেমপ্লেট। দরজা ঠেলে পুরু কার্পেট মোড়া ঘরে ঢুকতেই ডোর বেলের মিষ্টি একটা আওয়াজ হলো টুং-টাং। চোখ তুলে চাইল ডেস্কের ওপাশে চেয়ারে বসা একটি কর্মব্যস্ত তরুণী। সোহানা বুঝল, সালমা কবীর। মিথ্যে বলেনি রানা। একবাক্যে সুন্দরী বলা যায় একে। মিষ্টি হেসে উঠে দাঁড়াল মেয়েটি। সুরেলা কণ্ঠে বলল, 'আসুন। এইদিকে। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন মিস্টার মাসুদ রানা।' ইঙ্গিতে রানার কামরার বন্ধ দরজা দেখাল সালমা। এগিয়ে গিয়ে মেলে ধরল দরজাটা।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে মেয়েটাকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে ঢুকে পড়ল সোহানা খোলা দরজা দিয়ে।

জুতো সুদ্ধ দুই পা টেবিলের উপর তুলে দিয়ে সুইভেল চেয়ারে বসে চোখ বুজে সিগারেট টানছে রানা। কি যেন ভাবছে সে গভীর ভাবে। সোহানা ঘরে ঢুকতেই চোখ মেলে চাইল। ঝট্ করে পা নামিয়ে নিয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ওর দিকে কয়েক সেকেন্ড।

'মাই গড! দারুণ লাগছে তোমাকে, সোহানা। দিন দিন আরও সুন্দর হয়ে যাচ্ছ তুমি। মনে হচ্ছে তোমাকে না পেলে বাঁচব না। চমৎকার মানিয়েছে কিন্তু শাড়িটা...'

আস্তে বন্ধ হয়ে গেল সোহানার পিছনে দরজাটা।

'ছি! আক্কেল বলতে কিছুই নেই তোমার?' কপট রাগে ভুরু কুঁচকাল সোহানা। 'বেহায়া কোথাকার। কি ভাবল মেয়েটা বলো তো?'...বোঝা গেল মনে

মনে খুশি হয়েছে সে প্রশংসায়। এগিয়ে এল সে টেবিলের কাছে।

'কি আবার ভাববে? ভাবল, চমৎকার না কচু। লোকটার রুচি বলতে কিচ্ছু নেই! প্রেমে পড়লে একেবারে অন্ধ হয়ে যায় ব্যাটাছেলেগুলো।'

হাসল সোহানা। 'হয়েছে। আর স্ত্রী-চরিত্র বিশ্লেষণ করতে হবে না। উঠে পড়ো। আর পাঁচ মিনিট আছে।'

'আরে বসো, বসো। হাফ-টাইম পর্যন্ত বিজ্ঞাপন আর ট্রেলার দেখাবে। সাড়ে তিনটায় উঠব।'

'তাহলে এত তাড়া দিচ্ছিলে কেন?' বসে পড়ল সোহানা একটা চেয়ারে।

'তোমাকে না দেখে থাকতে পারছিলাম না। তর সইছিল না কিছুতেই।'

'বাজে কথা রাখো। আসল ব্যাপারটা কি বলো দেখি?'

'আসলে একটা কাজের ভার দেব তোমাকে।'

'কি কাজ?'

'এক্ষুণি আমার এক বন্ধু আসবে। মাহবুব। যুদ্ধে পরিচয়। খুব নাকি বিপদে পড়েছে। কোর্ট থেকে ফোন করছিল। হাজতে ঢোকার আগে বিশ মিনিটের জন্যে আমার সাথে দেখা করার অনুমতি নিয়েছে। ওর বক্তব্যটা শুনবে তুমি মন দিয়ে, তারপর সমস্যাটার সমাধানের দায়িত্ব নেবে।'

'আর তুমি?'

'আমি থাকব তোমার সাথে। অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে।'

'তার মানে তোমার একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট দরকার। এই তো?'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল রানা এমন সময় ঝট্ করে দরজা খুলে ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল গিল্টি মিঞা। হাতে ধরা দুটো সিনেমার টিকেট। মুখটা ফ্যাকাসে। দু'জনেই অবাক হয়ে চাইল ওর দিকে।

'পুলিস!!' প্রায় ফিসফিস করে বলল গিলটি মিঞা। উত্তেজিত চাপা কণ্ঠস্বর। 'এই দিকেই আসচে স্যার! দু'জন দারোগাও আচে!' দরজাটা একটু ফাঁক করে বাইরের দিকে উঁকি দিয়েই পাথরের মত জমে গেল সে। ঘরে ঢুকছে দু'জন পুলিস ইন্সপেক্টর। 'সব্বোনাশ! ঢুঁকে পড়েচে! এইবারই সেরেচে···নিগ্‌ঘাত মারা পড়েচি···' এদিক ওদিক চাইল সে। লুকোবার জায়গা খুঁজছে।

সালমা এসে ঢুকল। 'দু'জন পুলিস অফিসার আপনার সাথে দেখা করতে চান।'

'নিয়ে এসো।'

রানার মুখের দিকে দুই সেকেন্ড আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল গিলটি মিঞা। তারপর টিকেট দুটো টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিয়েই একলাফে চলে গেল অ্যাটাচড্ বাথরূমের দরজার সামনে। মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল সে বাথরূমের ভিতর। কার্পেটের উপর দিয়ে ভারী বুটের শব্দ এগিয়ে আসছে এদিকে। দরজার সামনে

একটু ইতস্তত করল, তারপর ঢুকে পড়ল ঘরে। এক নজরেই চিনতে পারল সোহানা। পত্রিকায় ছবি দেখেছে সে এই লোকের।

'এসো মাহবুব।'

'এগিয়ে এল সাব-ইন্সপেক্টর মাহবুবুল আলম। ওর পিছনে একজন প্রৌঢ় পুলিস অফিসার। অত্যন্ত রাগী চেহারা। একজোড়া পাকা গোঁফ মোম দিয়ে পাকিয়ে ছুঁচোল করা। পাকা ভুরুর নিচে চোখ জোড়ায় বাঘের দৃষ্টি।

পরিচয় করিয়ে দিল মাহবুব আড়ষ্ট ভঙ্গিতে। 'ইনি মিস্টার জালাল শিকদার। রমনা থানার ও. সি.। আমার বস্। ইনি মিস্টার মাসুদ রানা। এঁরই সাথে দেখা করতে চেয়েছিলাম, স্যার। আর ইনি...' সোহানার দিকে চেয়ে একটু ইতস্তত করল মাহবুব।

'ইনি মিস সোহানা চৌধুরী। আমার সহকারিণী। বসুন দারোগা সাহেব। বসো মাহবুব। তোমার ফোন পেয়ে তো ঘাবড়েই গিয়েছি একেবারে। তারপর? কি খবর, লেটেস্ট?'

'লেটেস্ট হচ্ছে হাজত বাস। আমার ব্যাজ আর রিভলভার কেড়ে নেয়া হয়েছে। আমি এখন অ্যারেস্টেড।'

'ফেঁসে গেছ তাহলে? চার্জটা কি?'

'মার্ডার। ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার।'

'আই সী!' ভুরু জোড়া কুঁচকে গেল রানার।

'চোখে অন্ধকার দেখছি, মাসুদ ভাই। ছয়দিন পর কোর্টে তারিখ পড়েছে। ছয় দিনের মধ্যে প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে যে আমি নির্দোষ। অথচ হাজতে বসে কিছুই সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।' হতাশ আর উদ্বেগ ফুটে উঠল মাহবুবের মুখে। 'সাহায্য পাব আপনার?'

'তুমি দোষী?'

'না।'

আধ মিনিট ভাবল রানা চোখ বুজে। তারপর বলল, 'ঘটনাটা খুলে বলো দেখি।'

'আপনি কাগজে দেখেননি ঘটনাটা?'

'না। ঢাকার বাইরে গ্রামে ছিলাম। আজ সকালে এসেছি। কাগজ দেখার সুযোগ হয়নি।'

'সাহায্য পাচ্ছি?' উদগ্রীব মাহবুবের দুই চোখ।

'আগে সবটা ব্যাপার শুনব আমি। তারপর কথা দেব। নাও, শুরু করো।'

দুই

'রাত দেড়টা। নিউ সার্কুলার রোডে নয় ফ্ল্যাটের একটা তেতলা বাড়ির সামনে কার পার্কের পাশে অন্ধকার একটা ঝোপের মধ্যে বসে আছি। তেরো নম্বর বাড়ি। বাড়িটার পিছন দিকে পাহারা দিচ্ছে সাব ইন্সপেক্টর রুস্তম আলী। একটা টেলিফোন পেয়ে আমাদের পাঠিয়েছিলেন ও.সি. সাহেব। ক'দিন আগে হেমায়েতপুর মেন্টাল হসপিটাল থেকে গারদ ভেঙে পালিয়েছিল একজন ভয়ঙ্কর সাইকোপ্যাথ। খুন করে বেড়াচ্ছে সে এখন ঢাকার বুকে রাতের অন্ধকারে। গভীর রাতে জানলার শিক ভেঙে বা দরজার বলটু খুলে ঢুকে পড়ে সে বাড়ির ভিতর। ঘুমন্ত যুবতী মেয়ে পেলেই আক্রমণ করে। মাথায় হাতুড়ি মেরে খুন করে সে প্রথমে, তারপর মৃতদেহের উপর বলাৎকার করে ধারাল ছুরি দিয়ে কেটে কেটে মুখ চোখ বিকৃত করে দেয়। সে দিন রাত এগারোটার সময় হঠাৎ ফোন এল, ওই বাড়িটার আশেপাশে একজন লোককে ব্যাগ হাতে নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে একজন মহিলা জানালা দিয়ে। খুবই আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর। ফোন পাওয়ার পনেরো মিনিটের মধ্যে পজিশন নিয়েছি আমরা।

'গত মঙ্গলবারের ঘটনা। তিন ঘণ্টা ধরে তুমুল ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেছে সেদিন ঢাকায়। কাল বৈশাখী। এখানে ওখানে ভাঙা ডাল পালা।

'বসে আছি, আর মশা তাড়াচ্ছি। একটু নড়ে উঠল ঝোপটা। বোতাম টিপলাম টর্চের। কুকুর। ঝুরঝুরে বুড়ো একটা কালো অ্যালসেশিয়ান। অবাক হয়ে দেখছে আমাকে। যাতে ঘেউ ঘেউ না করে সেজন্যে চুক চুক করে ডাকলাম। এল না। গরর্ আওয়াজ করে মিশে গেল অন্ধকারে। অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে উঠলাম। মশাগুলোও একেবারে খেপে গেছে রক্তের স্বাদ পেয়ে। ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি। হাল ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়তে যাচ্ছিলাম, এমনি সময় কী যেন নড়ে উঠল প্রায়-অন্ধকার গাড়ি বারান্দার কাছে। মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠল আমার চোখ কান। ছায়ামত দেখতে পেলাম লম্বা একজন লোক সতর্ক ভঙ্গিতে এদিক ওদিক চাইছে, এগোতে গিয়ে ইতস্তত করল একটু, আবার সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করল এদিক ওদিক। তারপর দ্রুতপায়ে সোজা হাঁটতে শুরু করল আমার দিকে। বাম হাতে বেশ বড় সড় একটা ব্যাগ দেখা যাচ্ছে। এখনও বিশ গজ দূরে আছে সে আমার থেকে।

'রিভলভারটা বের করে হাতে নিলাম। ওর চাল চলনে অপরাধী ভঙ্গি। পাঁচ বছর পুলিসে চাকরি করছি, এ ব্যাপারে আমার ভুল হওয়ার কথা নয়। নিঃসন্দেহ

হলাম, যখন মাঝপথে থেমে আবার এদিক ওদিক চাইল লোকটা, খুট শব্দ হলেই দৌড় দেবে এমন ভঙ্গিতে। প্রতি মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কা করছে যেন লোকটা।

'দশ গজের মধ্যে আসতেই এক লাফে উঠে দাঁড়ালাম এক হাতে টর্চ আরেক হাতে রিভলভার ধরে। আলো জ্বেলে বেশ জোরে বললাম—হল্ট, হ্যান্ডস আপ। মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়াও। আমি পুলিস ইন্সপেক্টর।'

'থমকে দাঁড়াল লোকটা। কিন্তু সে কেবল এক মুহূর্তের জন্যে। পর মুহূর্তে পাঁই করে ঘুরে দৌড় দিল সে বাঁয়ে।

'আমিও ছুটলাম পিছন পিছন। চিৎকার করেই চলেছি—খবরদার, দাঁড়াও, নইলে গুলি করব। কিন্তু গ্রাহ্যও করল না লোকটা, মাঠের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে চলল সে ফুল গাছ আর ছোট ছোট ঝাউ ঝোপ ডিঙিয়ে। সামনের পুকুরটার কথা ভুলেই গিয়েছিল। হঠাৎ পানি দেখতে পেয়ে থেমে গেল লোকটা, তারপর ঘুরে দাঁড়াল! আবার বললাম—মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়াও, নইলে গুলি করব।

'মনে হলো লোকটা আদেশ পালন করতে যাচ্ছে। হাতের ব্যাগটা ফেলে দিল সে মাটিতে। দুইহাত তুলছে সে উপরে। হঠাৎ একটা হাত চলে গেল ওর কোটের পকেটে। ঝট্ করে বেরিয়ে এল একটা পিস্তল।

'গুলি করলাম। দুই পা পিছিয়ে গেল লোকটা, দুই হাত শূন্যে ছুঁড়ল, তারপর ঝপাং করে পড়ে গেল পুকুরের ভিতরে। ছুটে গেলাম পুকুরের ধারে। টর্চের আলোয় দেখলাম উপুড় হয়ে পড়ে আছে লোকটা, লাল হয়ে উঠছে আশেপাশের পানি।

'ধুপ ধাপ পায়ের শব্দ পেলাম। প্রাণপণে দৌড়ে আসছে রুস্তম আলী। টর্চের আলো ফেলল আমার মুখের উপর। জিজ্ঞেস করল—কি হলো মাহবুব? কে গুলি করল?

'বললাম—আমি। সংক্ষেপে ঘটনাটা বলে লোকটাকে টেনে তোলার জন্যে নামলাম আমরা দু'জন। তুললাম। মারা গেছে লোকটা ততক্ষণে। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হবে। কেমন একটু সন্দেহ হলো, পাগলা গারদ থেকে পালানো কয়েদী স্যুট পাবে কোথায়? রুস্তম আলী বলল—চেনা চেনা লাগছে মুখটা। এদিক ওদিক টর্চের আলো ফেলে বলল—পিস্তলটা গেল কোথায়? দেখছি না তো! পুকুরে পড়ল নাকি? বললাম—তুমি পকেট সার্চ করো, আমি ব্যাগটা দেখছি।

'ব্যাগটা খুললাম। হাতুড়ি, ছুরি বা তালা খোলার যন্ত্রপাতি নেই। তার বদলে রয়েছে সিরিঞ্জ, স্টেথিসকোপ, থারমোমিটার, ব্লাডপ্রেশার চেক করার যন্ত্র, আর বিভিন্ন কোম্পানীর স্যাম্পল ওষুধের শিশি। ডাক্তারের ব্যাগ।

'লোকটার মানিব্যাগের ভেতর ভিজিটিং কার্ড পাওয়া গেল। তাতে লেখা—ডক্টর রুহুল আমীন, এম. বি. বি. এস. এম. আর. সি. পি. ইত্যাদি. ইত্যাদি।

"সর্বনাশ! বলল রুস্তম আলী—কপালে দুঃখ আছে তোমার মাহবুব!"

একটানা কথাগুলো বলে থামল মাহবুব কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে মনে মনে গুছিয়ে নিল কথাগুলো। চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে শুনছিল রানা। চোখ মেলল না। অভ্যস্ত হাতে ফাইভ ফিফটি ফাইভের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরিয়ে নিল চোখ বুজেই। নড়ে চড়ে বসল সোহানা। আবার শুরু করল মাহবুব।

'ডাক্তার রুহুল আমিন যে কত বড় হোমড়া চোমড়া লোক জানা ছিল না আমার তখন। পরদিন খবরের কাগজ দেখে জানতে পারলাম তিনি ছিলেন এদেশের এক বিরাট ফ্যামিলির যোগ্য সন্তান, কেবল মস্ত ডিগ্রিধারী ডাক্তারই নন, একজন মিনিস্টারের আপন চাচাত ভাই। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করতেন তিনি সেই আমলে গোপনে। অনেক কনট্রিবিউশন আছে। দয়ার সাগর ছিলেন তিনি, বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতেন অসংখ্য লোকের। এমন কি বছর তিনেক আগে শিকারে গিয়ে টেকনাফের কাছে তিরমিজ বলে একটি দ্বীপের অধিবাসীদের দুঃখ দুর্দশায় এতই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন যে সেই থেকে প্রত্যেক মাসে দুইবার করে নিজের খরচায় প্লেনে করে সেখানে গিয়ে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে আসতেন তিনি ওদের। ইত্যাদি, ইত্যাদি অনেক মহৎ কর্ম করে রেখেছিলেন তিনি—গত ক'দিনের কাগজ দেখলেই সব জানতে পারবেন।

'চোর, ডাকাত, রাজাকার, আলবদর যখন নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়াচ্ছে শহরের বুকে, পুলিসের নাকের ডগায় বসে অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে যখন কলোবাজারী, দুষ্কৃতিকারী আর মজুতদারদের দল, তখন পুলিস বিভাগের নিরীহ, নির্দোষ সম্মানীয় নাগরিকের জীবন নিয়ে এরকম ছিনিমিনি খেলার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠল সব কটা পত্রিকা। সরকার বাধ্য হলেন উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত কমিশন গঠন করতে। তিনদিন পর বিচার শুরু হলো সকাল দশটায়।

'নানান ভাবে জেরা করা হলো আমাকে। ঠিক কতটা দূরে প্রথম দেখতে পাই, কতদূর থাকতে হ্যান্ডস আপ বলি, কোন্ ভাবটা আমার সন্দেহ উদ্রেক করল, ইত্যাদি জিজ্ঞেস করা হলো প্রথমে। তারপর আমাকে বসতে বলে ডাকা হলো ওই বাড়িরই এক বৃদ্ধা বাসিন্দা মিসেস জোন্স্কে। মহিলা দেশী খৃষ্টান, আশি-বিরাশি বছর বয়স, বিধবা। কিছু মনে থাকে না তাঁর। পরলোকগত স্বামীর অগাধ টাকা আছে ব্যাঙ্কে, মাসে একহাজার করে টাকা পৌঁছে দেয়া হয় ওঁর কাছে। একা মানুষ, ভালভাবেই চলে যায় ওঁর। জানা গেল প্রত্যেক মঙ্গলবার ডাক্তার সাহেব ওকে দেখাশুনা করতে যেতেন, চিকিৎসা করতেন বিনা পয়সায়। সেদিন, মঙ্গলবার, ওঁকে চিকিৎসার জন্যেই গিয়েছিলেন তিনি তেরো নম্বর ফ্ল্যাট বাড়িতে। ডাক্তারের মধ্যে কোন রকম অস্থিরতা বা অস্বাভাবিকতা দেখতে পাননি তিনি সেই রাতে। শুধু ঝড় বৃষ্টির ব্যাপারে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। টম্ ঘরের বাইরে ছিল, ওকে খুঁজে ঘরে পাঠিয়ে দেবেন বলে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ঘর থেকে। টম্ হচ্ছে বুড়ির বুড়ো

কুকুর। ডাক্তার খুব পছন্দ করতেন কুকুরটাকে, মাঝে মাঝেই খেলনা এনে দিতেন ওকে। ডাক্তার বেরিয়ে যাওয়ার খানিক পরেই চিৎকার শুনতে পেয়েছিলেন বৃদ্ধা, তার কিছুক্ষণ পরই গুলির শব্দ। কি ঘটছে বুঝতে পারেননি, কিন্তু ভয়ানক ভয় পেয়েছিলেন।

'এরপর ডাকা হলো রুস্তম আলীকে। অত্যন্ত সৎ অফিসার। ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ার পর টেলিফোনে খবর পেয়ে ও. সি. সাহেব ঘটনাস্থলে পৌছলেই আমি থানায় ফিরে এসে রিপোর্ট লিখতে বসি, ফলে ওখানে কি ঘটেছে আমি জানতাম না। রুস্তম আলীর জবানবন্দী শুনে কেঁপে গেলাম আমি। জানা গেল, পিস্তলটা পাওয়া যায়নি কোথাও। আশে পাশের সমস্ত জায়গা চষে ফেলা হয়েছে, পুকুরে ডুবুরী নামিয়ে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে, কিন্তু ডাক্তারের সেই পিস্তলটা গায়েব হয়ে গেছে বেমালুম। আরও জানা গেল, পিস্তলের লাইসেন্স নেই ডাক্তারের, অর্থাৎ তার কাছে পিস্তল থাকার কথা নয়, ওটা আমার চোখের ভুল। রুস্তমকে বিদায় দিয়ে ডাকা হলো একজন ই. এন. টি. স্পেশালিস্টকে। তার কাছ থেকে জানা গেল ডক্টর রুহুল আমীন অটোসক্লেরোসিস রোগে ভুগছিলেন। অর্থাৎ কানের ভেতর একটা হাড় শক্ত হয়ে যাওয়ায় হিয়ারিং এইড ব্যবহার করতেন। কিন্তু ওটা পরীক্ষা করে দেখা গেছে ব্যাটারি ডাউন ছিল। এ থেকে আঁচ করে নেয়া হলো, খুব সম্ভব চিৎকার করে আমি যা বলেছিলাম তিনি বুঝতে পারেননি।'

'কিন্তু তাহলে দৌড় দিলেন কেন?' হঠাৎ প্রশ্ন করল সোহানা।

'সেটা আমারও প্রশ্ন। কিন্তু কমিশনের ধারণা, হঠাৎ আমাকে দেখে গুণ্ডা বদমাইশ মনে করেই উনি দৌড় দিয়েছিলেন। পিস্তলটা আমার কল্পনার আবিষ্কার। আমি দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত একজন নিরীহ নিরপরাধ নাগরিককে হত্যা করেছি। আমার বস্—শিকদার সাহেবকে ডাকা হলো সবশেষে। সত্যিসত্যিই আমার সম্পর্কে তাঁর কি ধারণা আমার জানা নেই, কিন্তু সেদিন তিনি কমিশনের সামনে যা বললেন সেটা সংক্ষেপে দাঁড়ায়—আমার মত সৎ, সাহসী, ও কর্তব্যপরায়ণ পুলিস অফিসার তিনি খুব কমই দেখেছেন। তাঁর বিশ্বাস আমার প্রতিটা কথা সত্য। পিস্তলটা পাওয়া যায়নি ঠিকই, কিন্তু চেষ্টা করলে হয়তো এ রহস্য ভেদ করা অসম্ভব নয়। অতীতে আমি কি কি ভাল কাজ করেছি তার উপর নাতিদীর্ঘ বক্তৃতাও দিলেন। কিন্তু কাজ হলো না কিছুই। সাসপেন্ড করা হলো আমাকে। আপীল করলাম।

'এদিকে খবরের কাগজে জোর লেখালেখি চলছে তখনও। ফৌজদারী আদালতে আমার বিচারের দাবি উঠেছে। একটা ব্যাপারে ততক্ষণে আমি পরিষ্কার বুঝে নিয়েছি—সবাই আমার বিরুদ্ধে। পাবলিক সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে আমাকে। এই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে একটি মাত্র উপায় আছে—সেটা হচ্ছে, প্রমাণ করা যে ডাক্তার নিরীহ নিরপরাধ লোক ছিলেন না।

'ডাক্তারের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে খোঁজ খবর করতে গিয়েই আসল বিপদে পড়লাম। নিজের অজান্তেই কারও আঁতে ঘা দিয়ে বসেছি আমি। ফলে আমার বিরুদ্ধে শক্ত ক্রিমিনাল চার্জ আনা হলো। ইচ্ছাকৃত খুনের অভিযোগ। ঘটনার কয়েকদিন আগে একটা টিন-এজার জুয়ার আড্ডায় হামলা করার সময় ডাক্তারের ছেলের সাথে হাতাহাতি হয়েছিল আমার। অবশ্য সেই আড্ডায় ডাক্তারের ছেলে ছিল কিনা জানতাম না আমি গতকাল পর্যন্ত। সেই হাতাহাতির সময় একা পড়ে যাওয়ায় মার খেয়েছিলাম আমি ওদের হাতে। আমি নাকি প্রতিশোধ নেবার জন্যে জেনে শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে খুন করেছি শাব্বিরের বাবা ডক্টর রুহুল আমীনকে। খুন করে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে গল্প তৈরি করেছি যে পিস্তল বের করেছিলেন ডাক্তার।

'বেইল পেলাম না। বসকে ধরে হাজতে ঢোকার আগে আপনার সাথে দেখা করবার সুযোগ চেয়েছিলাম। উনি সে সুযোগ দিয়েছেন। বিশ মিনিট সময় ছিল আমার হাতে, শেষ হয়ে গেল। সাহায্য পাব আপনার, মাসুদ ভাই?'

মৃদু হাসল রানা মাহবুবের উদগ্রীব মুখের দিকে চেয়ে। মাথা ঝাঁকাল।

'পাবে।' একটা কলিং বেল টিপল রানা। সালমা এসে ঢুকতেই চারটে আঙুল দেখাল। অর্থাৎ চারটে ফান্টা। 'ডাক্তারের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কি জানতে পেরেছ?'

'জানতে পারলাম, পাঁচ লাখ টাকার ইনস্যুরেন্স ছিল ডাক্তারের। গত দশ বছর ধরে নিয়মিত আহমেদ আলী ইনস্টিটিউটে জুয়া খেলতেন তিনি উঁচু স্টেকে। নিয়মিত হারতেন। বছর চারেক আগে প্রায় সর্বস্ব খুইয়েছিলেন তিনি জুয়ায়। এক বছর খুব কষ্টে কাটিয়েছেন। তারপরেই হঠাৎ জিততে শুরু করছেন অসম্ভব হারে। গত তিন বছর শেয়ার মার্কেটেও প্রচুর লাভ করেছেন। বর্তমান ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স পনেরো লাখ টাকা। চেম্বার আছে একটা বায়তুল মোকাররমে, কিন্তু প্র্যাকটিস খুবই সামান্য। এত টাকা কিভাবে উপার্জন করছেন তিনি এত অল্প সময়ে জানা গেল না। ব্যাপারটা রহস্যময় মনে হচ্ছে আমার কাছে। মনে হলো কেউ যেন আমার চোখ চেপে ধরতে চায়। দেখতে দিতে চায় না ডাক্তারের জীবনের এই দিকটা।'

ফান্টা খেয়েই উঠে পড়ল ও. সি. জালাল শিকদার। মাহবুবকে বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে বলে ঝুঁকে পড়ল টেবিলের উপর।

'একটা কথা বলে যাই। এ ব্যাপারে যখন যেমন দরকার আমার সাহায্য গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবেন না মিস্টার মাসুদ রানা। সব রকম সাহায্য করব আমি আপনাকে। এটা কেবল মাহবুবের ব্যক্তিগত ব্যাপারই নয়, পুলিস বিভাগের সম্মানও নির্ভর করছে এর উপর। এ ব্যাপারটা মুখ বুজে মেনে নিতে হলে দায়িত্ব পালন করতে দ্বিধা আসবে পুলিসের মনে।'

'পিস্তলটার কথা আপনি বিশ্বাস করেন?' প্রশ্ন করল রানা।

'করি। চোখের ভুল যে হতে পারে না এমন নয়। কিন্তু নিশ্চয়ই ওই জাতীয়

কিছু বের করেছিল ডাক্তার। নইলে গুলি করবে কেন মাহবুব? অন্য কিছু হলেও তো সেটা আমাদের খুঁজে পাওয়ার কথা। কিছু একটা খুঁজে পেলে না হয় বুঝতাম ভুল দেখেছিল মাহবুব অন্ধকারে। কিছুই যখন পাইনি, তখন নিশ্চয়ই কেউ সরিয়েছে সেটা। মাহবুবের কথা অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই।'

'পুলিসের লোক ছাড়া বাইরের কেউ গিয়েছিল ঘটনাস্থলে?'

'না। ঘিরে নিয়েছিলাম আমরা জায়গাটা।'

'আপনার কোন লোক করেনি তো কাজটা?'

'কথাটা আমার মনেও জেগেছিল। সেই রাতেই। আমি নিজ হাতে সার্চ করেছি প্রত্যেককে। পাইনি।'

'ঠিক আছে মিস্টার শিকদার, প্রয়োজন হলেই আপনার শরণাপন্ন হব আমি।'

বেরিয়ে গেল ভারী পা ফেলে জালাল শিকদার। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল ওকে রানা। চট্ করে সারা ঘরে একবার চোখ বুলাল সোহানা। যা খুঁজছিল পেল না। ওকি আশা করেছিল একটা লাল টেলিফোন সেট দেখতে পাবে এ কামরায়?

বাথরূমের দরজা খুলে উঁকি দিল গিলটি মিঞা।

তিন

রানার পিছু পিছু সিনেমা হল থেকে চোরের মত বেরোচ্ছিল সোহানা, পিছন থেকে আঁচল ধরে টানল নায়লা।

'কিরে, তোর না অসম্ভব মাথা ধরেছে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল নায়লা।

'সেরে গেছে।' লজ্জায় লাল হয়ে গেল সোহানা।

'কেউ টিপে দিয়েছে বুঝি?'

'যা অসভ্য কোথাকার!'

'বল্ না কোনজন? সামনেরটা?'

'না, তোর পিছনেরটা।'

কোনমতে নায়লার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে গাড়িতে এসে উঠল সোহানা।

'এবার কোন দিকে যাবে?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'চলো শুধু শুধু ঘুরে বেড়াই খানিক।' গাড়ি ছেড়ে দিল রানা।

'মাহবুব সাহেবের ব্যাপারটা ভুলতে পারছি না।'

'কি ভাবছ?'

'ভাবছি পিস্তলটা যাবে কোথায়? এ ব্যাপারে দারোগার কোন হাত নেই তো?'

'ভুল লাইনে ভাবছ তুমি, সোহানা। সোজা, সরল ও সৎ অফিসার হিসেবে শিকদার সাহেবের সুনাম প্রতিষ্ঠিত। সততার জন্যে প্রমোশন হয়নি তার গত

পনেরো বছর। মাহবুব ছেলেটা তার নিজের হাতে গড়া। তাছাড়া মাহবুবের অনুরোধ অনায়াসেই উপেক্ষা করতে পারত সে। তার যদি হাত থাকত তাহলে আমার কাছে নিয়ে আসত না ওকে।'

'তাহলে যাবে কোথায় সেটা? সেক্ষেত্রে ভাবতে হয় যে চোখের ভুল হয়েছিল মাহবুব সাহেবের।' অনেকটা স্বগত কণ্ঠে বলল সোহানা। 'কিভাবে এগোতে চাও তুমি?'

'কোন সূত্র দেখতে পাচ্ছি না। একমাত্র উপায় সূত্র তৈরি করে নেয়া। পুরো ব্যাপারটা শুনে মনে হচ্ছে কোথাও শক্ত একটা গিট আছে। কিন্তু গোড়া থেকেই আরম্ভ করতে হবে আমাদের। প্রথমেই ওই বাড়ির লোকজনের সাথে আলাপ করতে হবে, তারপর ভেবে দেখব কোন্ পথে এগোনো যায়।'

'চলো না এখনই যাই?'

'তর সইছে না বুঝি?' হাসল রানা। 'ঠিক আছে, চলো।'

কার পার্কে গাড়ি রেখে নেমে পড়ল ওরা। শেষ বিকেল। আঁধার হতে আরও আধঘণ্টা।

দেয়াল ঘেরা বিরাট কম্পাউন্ড। বারো তেরো ও চোদ্দ নম্বর লেখা তিনটে ফ্ল্যাট বাড়ি পাশাপাশি। তিনটে নিয়ে এক ইউনিট। মালিক খুব সম্ভব একজনই। চমৎকার সুন্দর প্ল্যান মাফিক সাজানো। ছবির মত।

মাহবুব কোন্ ঝোপটার আড়ালে লুকিয়েছিল বুঝতে অসুবিধে হলো না ওদের। সমস্ত ঘটনাটা যেন চাক্ষুষ দেখতে পেল রানা। পুকুরের ধার পর্যন্ত গেল ওরা পাশাপাশি হেঁটে। সোহানাকে মাথা নিচু করে এদিক ওদিক তীক্ষ্ণ চোখে চাইতে দেখে হাসল রানা। পিস্তলটা খুঁজছে সে।

তেতলা ও দোতলার বাসিন্দাদের কাছে জানা গেল না বিশেষ কিছুই। প্রত্যেক তলায় তিনটে করে ফ্যামিলি। বড়লোকি চালের তিন কামরা বিশিষ্ট ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাট না বলে এগুলোকে অ্যাপার্টমেন্ট বলাই ভাল। ভাড়াটেরা বেশির ভাগই হয় একা নয়তো স্বামী-স্ত্রী ও এক সন্তানের পরিবার। প্রত্যেকে বড়লোক। কেউ কারও খবর রাখে না। সবাই প্রশ্ন না করেই ধরে নিল যে ওরা আই. বি.র লোক। সাবধানে জবাব দিল প্রতিটা প্রশ্নের। অনেকে ডাক্তারকে দেখেনি কোনদিন এ বাড়িতে আসতে, কেউ কেউ আবার জানেই না যে এ বাড়িতে মিসেস জোন্স্ বলে কোন বৃদ্ধা মহিলা থাকে। শহুরে জীবন, যে যার তালে ব্যস্ত, অন্যের ব্যাপারে মাথা ঘামাবার অবসর নেই। দু'জন জানাল স্লিপিং পিল খেয়ে ঘুমায় তারা, সে রাতে কি ঘটেছিল টেরই পায়নি, পরদিন খবরের কাগজে দেখেছে।

নিচে নেমে এল ওরা। মিসেস জোন্সের কলিংবেল টিপল। দরজাটা সামান্য ফাঁক করে সেই ফাঁকে চোখ রাখল বৃদ্ধা। অপরিচিত লোক দেখেই দরজা বন্ধ করে দিচ্ছিল, চট করে বলল রানা, 'আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই মিসেস জোন্স। গত মঙ্গলবারের গোলাগুলির ব্যাপারে।'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনার কি আসার কথা ছিল? কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট...'

'ডক্টর রুহুল আমীনের মৃত্যুর ব্যাপারটা তদন্ত করছি আমরা।'

ডাক্তারের নামটা উচ্চারণের সাথে সাথেই খুলে গেল দরজাটা। তবু একটু অনিশ্চয়তা ছিল, সোহানাকে দেখে আশ্বস্ত হলো বুড়ি। 'এসো মা, এসো! বসো তোমরা। চা তৈরি করছিলাম—চায়ের সাথে আর কি খাবে? বিস্কুটঅলাটা আসছে না ক'দিন ধরে। উইলি মারা যাওয়ার আগে থেকেই পাঁউরুটি আর বিস্কুট দিয়ে যায় লোকটা আমাকে বাড়িতে এসে। এ বাড়িতেও আসে, একদিন পর একদিন।...কই বসো।'

বসল ওরা পৌরাণিক যুগের একটা সোফায়। কচমচ করে আপত্তি জানাল জীর্ণ স্প্রিংগুলো। সেই সাথে গর্‌র্ একটা আওয়াজ এল টেবিলের নিচ থেকে। একটা ঝুড়িতে বসে কটমট করে চেয়ে আছে ওদের দিকে বুড়ো এক অ্যালসেশিয়ান। 'চুপ করো টম!' আঙুল তুলে শাসন করল বৃদ্ধা কুকুরটাকে। 'অভদ্রতা কোরো না দুষ্টু। তোমার খেলনা চুরি করবে না এরা।' সোহানার দিকে ফিরে বলল, 'ভয় পেয়ো না মা। টম আমার খুবই ভাল মানুষ। বুড়ো হয়ে গেছে তো, দাঁত পড়ে গেছে সব। ডাক্তার সাহেব বলেছিলেন ওর দাঁত বাঁধিয়ে দেয়া যায় কিনা জিজ্ঞেস করবেন ডেন্টিস্টকে। খুব ভাল মানুষ। মেরে ফেলল ওরা গুলি করে। আমাদের দু'জনের আর কেউ থাকল না।'

'আপনার আত্মীয় স্বজন নিশ্চয়ই আছে?' বলল সোহানা।

'কেউ নেই। কেউ না। আমি আর টম শুধু আছি। একা।' উদাস শোনাল বৃদ্ধার কণ্ঠ। ঘরের কোণে একটা টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল বৃদ্ধা। একটা চায়ের পট তুলল কাঁপা হাতে। দু'হাতে পট ধরে কাপে ঢালল চা, তবু কিছুটা পড়ে গেল টেবিলের উপর। রানা বা সোহানাকে দিতে ভুলে গিয়ে নিজেই খেতে শুরু করল। মগ্ন কণ্ঠে বলে চলল, 'কথা বলার মত কেউ নেই। বুড়ো হয়ে গেলে কেউ কেয়ার করে না। একমাত্র ডাক্তার ভালবাসত আমাদের। এই বাড়িটাও খুঁজে দিয়েছিল ডাক্তারই। প্রত্যেক মঙ্গলবার এসে দেখে যেত কেমন আছি।'

'ডাক্তারকে কি আপনার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেছিলেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কথাটা খেয়াল করল না বৃদ্ধা। কুকুরটার দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসছে। একটা রবারের পুতুল চিবোচ্ছে কুকুরটা আর অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করছে রানা ও সোহানার দিকে। 'ডাক্তার ছাড়া কাউকে দেখতে পারে না টম। ওই পুতুলটা উপহার দিয়েছিল ডাক্তার ওকে ওর জন্মদিনে। সেই জন্যেই এত প্রিয় ওটা ওর। মান-অভিমানের খেলা চলত ওর ডাক্তারের সাথে। প্রায়ই কিছু না কিছু আনত ডাক্তার ওর জন্যে! মাঝে মাঝে ভান করত যে ভুলে গেছে। কিছুতেই আর বের করে না। আশায় আশায় থাকত ও। আমি ভাবতাম বুঝি সত্যিই ভুলে গেছে। কিন্তু

না, শেষ মুহূর্তে যাবার সময় বলত—এই দেখো, কি এনেছি তোমার জন্যে!' দুই ফোঁটা জল ঝরে পড়ল বৃদ্ধার ভাজ ভাজ গালের উপর। রুমাল দিয়ে মুছল সে চোখের জল।

'ডাক্তারকে আপনার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেছিলেন নিশ্চয়ই?' আবার প্রশ্ন করল রানা।

'না না। তা কি করে করব?'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে তিনি ছিলেন আপনার সন্তানের মত। আপনার আর কোন আত্মীয়স্বজন নেই যখন...'

'কিন্তু ব্যাঙ্কের টাকাগুলো তো আমার নয়। যতদিন বেঁচে আছি সুদের থেকে টাকা পাব। কিন্তু আমার মৃত্যুর পর টাকাগুলো পাবে সরোজিনী হাসপাতাল। উইলি, আমার স্বামী, সেই ব্যবস্থাই করে গেছে।'

রানা বুঝল ওদিক থেকে অগ্রসর হয়ে লাভ নেই। সম্পত্তি-লোভী ডক্টর রুহুল আমীনকে দাঁড় করানো যাচ্ছে না; বলল, 'অনেক ধন্যবাদ মিসেস জোন্‌স্‌। আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুবই খুশি হলাম। আমরা আসি এখন।'

বহুদিন পর কথা বলবার সুযোগ পেয়ে ওদের ছেড়ে দেবার বিশেষ ইচ্ছে দেখা গেল না বৃদ্ধার। কিন্তু উঠে দাঁড়াতে দেখে আপত্তি করল না। বলল, 'আবার এসো বাবা। তুমি ভাগ্যবান। খু-উ-ব সুন্দর বউ পেয়েছ। কক্ষোনো কষ্ট দিয়ো না ওর মনে।'

বেরিয়ে এল ওরা বাইরে। বাকি রইল দুটো ফ্ল্যাট। ইতিমধ্যেই সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দেরি হয়ে গেছে বুড়ির ওখানে। মিসেস জোন্‌সের ঠিক পাশের ফ্ল্যাটটায় থাকে কে. হক। দরজায় নেমপ্লেট লাগানো। বেল টিপে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। লেটার বক্সের ঠাসা চিঠি আর দরজার নিচে জমা খবরের কাগজ দেখে বোঝা গেল এ ফ্ল্যাটের ভাড়াটে গত কয়েকদিন ধরে অনুপস্থিত। বাকি রইল কামরুজ্জামান চৌধুরী: বার কয়েক বেল টিপতেই ভিতর থেকে চটুল পুরুষ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'আগে দেখো বাবা। সাহায্য হবে না।'

'দরজাটা খুলুন। কিছু কথা আছে।'

'বুঝতে পেরেছি বাবা। তোমার অনেক দুঃখ। তিন দিন তিনরাত না খেয়ে আছ। কিন্তু আমিও না খাওয়া। আমারও অনেক দুঃখ। এখানে সুবিধা হবে না, আগে দেখো।'

হাসল রানা ও সোহানা পরস্পরের দিকে চেয়ে। গলার স্বরটা আরেক পর্দা চড়িয়ে রানা বলল, 'ডক্টর রুহুল আমীনের মৃত্যুর ব্যাপারে তদন্ত করছি আমরা। আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।'

দরজা খুলল ফুলপ্যান্ট আর গেঞ্জি পরা হাসি মুখ এক অল্প বয়সী যুবক। বলল, 'খোদার কসম, বিশ্বাস করুন, আমি খুন করিনি।' সোহানাকে দেখেই সপ্রতিভ বিব্রত কণ্ঠে বলল, 'এক্সকিউজ মি ম্যাডাম। আসুন ভিতরে আসুন

'বিরক্ত করলাম আপনাকে…' ড্রইংরুমে ঢুকল ওরা যুবকের পিছন পিছন। বসল সোফায়।

'না না মোটেই না। রাত দশটা পর্যন্ত আমার অফ।' আলনা থেকে টান দিয়ে একটা হাওয়াই শার্ট নিয়ে পরে ফেলল কামরুজ্জামান চটপট 'বলুন, কি সাহায্য করতে পারি আপনাদের?'

'ডাক্তারের মৃত্যুর সময় আপনি কোথায় ছিলেন?' প্রশ্ন করল রানা।

'আকাশে।' ওদের দু'জনকে একটু অবাক হয়ে চাইতে দেখে বলল। 'খোদার কসম!'

'তারমানে আপনি একজন পাইলট?'

'শিশু, সুন্দরী মহিলা, আর আমার মার কাছে আমি পাইলট। আসলে আমি পি.আই.এ.,থুরি, বাংলাদেশ বিমানের একজন কো-পাইলট।' হাসল কামরুজ্জামান। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'আপনারা খুব সম্ভব সাব-ইন্সপেক্টর মাহবুবুল আলমের হয়ে তদন্ত করছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার পরিচয়টা জানতে পারি কি?'

'আমার নাম মাসুদ রানা। আর ইনি সোহানা চৌধুরী। আমাদের মনে হয় ঘটনার সবটা প্রকাশ পেলে হয়তো বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে মাহবুব।'

'আপনাদের সাহায্য করতে পারলে আমি খুবই সুখী হতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে রাত্রে আমি ঢাকাতেই ছিলাম না। লন্ডন থেকে আসছিলাম, কিন্তু ঝড় বৃষ্টির জন্যে গতি পরিবর্তন করে দমদমে জাহাজ নামাতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমার জীবনের ট্র্যাজেডিই হচ্ছে এটা। যেখানে জমজমাট চাঞ্চল্যকর কোন ঘটনা ঘটবে, আমাকে থাকতে হবে তার থেকে দূরে। কোনদিনই অন্ দ্য স্পট থাকার সুযোগ হয় না।'

'ডাক্তার রুহুল আমীনকে চিনতেন আপনি?'

'জীবনে কোনদিন দেখিনি। অন্যান্য ভাড়াটেদের সাথে আলাপ করলে…'

'সবার সাথেই আলাপ করেছি। আপনার পাশের ফ্ল্যাটের হক সাহেব ছাড়া। মনে হচ্ছে উনি ঢাকার বাইরে আছেন। ওঁর সম্পর্কে কিছু জানেন?'

মুচকি হাসল পাইলট। 'হক সাহেব নয়, হক মেম সাহেব! মিস কুমকুম হক। মডেল। ফটোগ্রাফারের জন্যে পোজ দেয়। ওর সৌন্দর্য সম্পর্কে অনেক কিছুই জানি। কিন্তু খাতির জমাতে পারিনি অনেক চেষ্টা করেও।'

কামরুজ্জামানকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। কুমকুম হকের দরজার কাছে জমে থাকা গত ক'দিনের পত্রিকাগুলো উল্টে পাল্টে দেখল রানা। লেটার বক্সের চিঠিগুলো উল্টে পাল্টে দেখল, তারপর সোজা গাড়িতে গিয়ে উঠল।

'যে তিমিরে সেই তিমিরেই। তাই না?' প্রশ্ন করল সোহানা।

জবাব দিল না রানা। কি যেন ভাবছে সে। গাড়িটা সোজা সোহানার বাড়ির

গেটে এসে থামল।

'শোনো, সোহানা। কাল আমরা দু'জন দু'দিক থেকে চেষ্টা করব। দুপুর ঠিক দুটোর সময় লাঞ্চ খাব আমরা একসাথে চাং ওয়া রেস্টুরেন্টে

'আমাকে কি করতে হবে?'

'তুমি কুমকুম হক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে মেয়েটা কোথায় গেল জানতে হবে আমাদের। মাহবুবের ব্যাপারের সাথে মেয়েটার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে অবশ্য নেহায়েত কোইনসিডেন্সও হতে পারে. কিন্তু দোরগোড়ায় পড়ে থাকা পত্রিকাগুলোতে লক্ষ করলাম. সবচেয়ে পুরানো কাগজটা গত বুধবারের অর্থাৎ ডক্টর রুহুল আমীনের মৃত্যুর পরদিন থেকে মেয়েটা অনুপস্থিত।'

চার

পরদিন সকালে ফোন করল সোহানা অফিসে। সোহেল ধরল টেলিফোন।

'আজকে অফিসে আসতে পারছি না। ভয়ানক…'

'শরীর খারাপ। মাথা ধরেছে। জানি আমি।' বলল সোহেল।

'কি করে জানলেন?'

'ফোন করেছিল রানা। ঠিক আছে, না এলেও চলবে! ছুটি মঞ্জুর।'

সোহানা ভাবল সোহেলকে চমকে দেয়ার জন্যে জিজ্ঞেস করবে লাল রিসিভারে ফোন এসেছিল কিনা। কিন্তু চেপে গিয়ে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।'

'অ্যাকসেপ্টেড।'

কুমকুম হকের খবর কোথায় পাওয়া যাবে ভাবল সোহানা কিছুক্ষণ। অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সীগুলোর নম্বর টুকে নিল ফোন গাইড থেকে। এক এক করে ফোন করতে শুরু করল সে। কুমকুমের বান্ধবী সে, কলকাতা থেকে এসেছে। ইস্টার্ন অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সীতে জানা গেল. কিছুদিন আগে তারা তিন দিনের জন্যে নিয়োগ করেছিল কুমকুম হককে। ফটোগ্রাফার শরীফ আহমেদের কাছে ওর খবর জানা যেতে পারে। শরীফ আহমেদের ঠিকানা লিখে নিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন ছেড়ে দিল সোহানা।

পুরানো পল্টনে শরীফ স্টুডিয়ো। সোজা গিয়ে হাজির হলো সোহানা। স্টুডিয়োটা দোতলায়। একটা সিঁড়ির দিকে তীর চিহ্ন দেয়া আছে। দোতলায় উঠে বারান্দা ধরে এগোচ্ছিল সোহানা, এমন সময় বজ্র গম্ভীর এক কণ্ঠস্বর শুনে থমকে দাঁড়াল। চিৎকার করে উঠল কে যেন, 'হল্ট!'

শব্দের উৎস খুঁজতে গিয়ে এদিক ওদিক চাইতেই গর্জন করে উঠল অদৃশ্য কণ্ঠস্বর, 'না না না। মাথা নাড়িয়ো না! আলোটা ডিসটার্বড হয়ে যাচ্ছে। নাকের

পাশে যে শেডটা পড়েছে, ওটা চাই। একটু ডানদিকে ঘোরাও মাথা। হ্যাঁ। ন্যাচারাল থাকার চেষ্টা করো বাহ্, সুন্দর! মিষ্টি করে একটু হাসো দেখি…' ব্যাপার বুঝতে পেরে হেসে ফেলল সোহানা। ক্লিক করে শব্দ হলো একটা। দরজার আড়াল থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল চকচকে টাকওয়ালা বেঁটে খাটো প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক। টাকের আশেপাশে সামান্য যা চুল আছে সেগুলো পাকা এবং উষ্কখুষ্ক। আস্ত একটা পাগল। হাতে একটা টু পয়েন্ট এইট লেন্সের রোলিফ্লেক্স ক্যামেরা।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখছে শরীফ আহমেদ সোহানার আপাদমস্তক। বলল, 'দারুণ ফটোজেনিক ফেস তো তোমার। কপাল ভাল সানশাইন অ্যাডভারটাইজারস্‌দের। লাখে একটা পাওয়া যায় এমন ফিগার আর ফেসের কমবিনেশন। কিন্তু সিনেমায় না নেমে মডেল হতে গেলে কেন তুমি? এসো, ভিতরে এসো। কি নাম তোমার?'

ঘরে ঢুকে একটা সোফায় বসল সোহানা। বলল, 'সোহানা চৌধুরী…'

'খুব ভাল নাম।' এক আঙুল তুলে চোখ পাকিয়ে যেন শাসন করছে এমনি ভাবে বলল শরীফ আহমেদ। যেন বলতে চায়—খবরদার, নামটা চেঞ্জ করে ফেলো না আবার। 'চেহারার সঙ্গে খুব মানিয়েছে নামটা। সোহানা মানে অবশ্য জানি না, কিন্তু যাই হোক, খুব ভাল, খুব ভাল। জানো, এফ. এইট আর স্পীড সিক্সটি দিয়ে তুললাম ছবিটা। ন্যাচারাল লাইট, কন্ট্রোল করা মুশকিল। কনট্রাস্ট রেশিও ওয়ান ইজটু ফোর না হলে ফেস স্টাডি ভাল আসে না। হাইলাইটে এক্সপোজ করলাম, ওদিকে নেগেটিভ ডেভেলপমেন্ট ফিফটি পারসেন্ট বাড়িয়ে নেব, ফলে চমৎকার টেক্সচার আসবে। এফ. এইট দেয়াতে ডেপথ অফ ফিল্ড পাচ্ছি বেশি…' উদভ্রান্ত সাধকের দৃষ্টিতে সোহানাকে এপাশ ওপাশ থেকে দেখছে শিল্পী।

'আমি এসেছি…'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আগে চা খেয়ে নাও, তারপর স্টুডিয়োর টাংস্টেন লাইটে দুটো ওয়ান টোয়েনটি আর একটা থারটি ফাইভ রোল তুলব বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে। তোমার সেমি ন্যুড যা আসবে না…দারুণ এরকম ফিগার না পেলে ছবি তুলে তৃপ্তি নেই।' হঠাৎ সচকিত হয়ে চাইল শিল্পী সোহানার দিকে। 'কস্টিউম কোথায়? কস্টিউম নিয়ে আসতে বলেছিলাম না? সুইমিং পুলের ছবি কি করে হবে কস্টিউম ছাড়া?'

এতক্ষণে একটু কথা বলার সুযোগ পেয়ে চট্ করে বলল সোহানা, 'আমি ছবি তুলতে আসিনি।'

'তবে?' যেন দুর্বোধ্য কোন বিদেশী ভাষা শুনছে শরীফ আহমেদ, কিন্তু বুঝতে পারছে না।

'আপনার এক মডেলের বন্ধু আমি। ওর খোঁজে এসেছি

হাঁ করে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ শিল্পী। তারপর বলল, 'সোহানাকে মানে

আপনাকে সানশাইন…'

'জ্বি না। আমি মডেল নই, কেউ পাঠায়নি আমাকে। আমি নিজে এসেছি আমার বান্ধবী কুমকুম হকের খোঁজে।'

'কুমকুম…হ্যাঁ…কুমকুম। বড় ভাল মেয়ে।' হঠাৎ কি মনে পড়ে যাওয়ায় রেগে গেল শরীফ আহমেদ। চোখ পাকাল। 'ওকে খুঁজে পেলে বোলো আমি খুব রেগে আছি ওর ওপর। ভয়ানক চটে গেছি। আশ্চর্য! পাজী মেয়ে, কথা দিয়ে কথা রাখল না। এবার এলে মার লাগাব আমি।'

'কথা রাখতে পারেনি বুঝি?'

'নাহ্ পাত্তাই নেই। সেই গত বুধবার আসার কথা ছিল, একটা ফোন করেও জানাতে পারত?'

'বাড়িতে নেই সে গত বুধবার থেকে। কোথায় যেতে পারে সে সম্পর্কে কিছু ধারণা দিতে পারেন?'

'বাড়িতে নেই?' চিন্তিত হয়ে পড়ল শিল্পী। হঠাৎ কি মনে পড়ায় চিন্তা দূর হলো। 'ওর এক প্রেমিক ছিল, কথায় কথায় বলেছিল একদিন আমাকে। নাম ধাম জিজ্ঞেস করিনি। খুব সম্ভব অবৈধ প্রেম। আচ্ছা…সাতদিন বলছ… কিছু হয়নি তো ওর?' বিচলিত মনে হলো শিল্পীকে।

'এরকম ধারণা হচ্ছে কেন আপনার?'

'শেষ যেদিন এল সেদিন কেমন যেন অস্বাভাবিক লেগেছিল আমার কাছে ওর ব্যবহার। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। আমাকে মামা বলে ডাকত, এত করে মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম—কি হয়েছে আমাকে বল্, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি, কিন্তু কিছুই বলল না। শরীর খারাপ করছে বলল শুধু। হাসিখুশি মানুষটার এরকম ব্যবহার দেখে আমার মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে সেই থেকে।'

সোহানা বুঝল, খেয়ালী লোক, যখন যা মনে আসছে, প্রাণ থেকে অনুভব করে বলছে কিন্তু মনে রাখছে না কোন কথা। একটু পরেই সানশাইন অ্যাডভারটাইজারস থেকে নিযুক্তা মেয়েটা সুইমিং কস্টিউম নিয়ে এসে পৌঁছলেই ভুলে যাবে শিল্পী সব কিছু। যা জানা গেল সোহানার ধারণা তা যথেষ্ট। রানার সাথে দেখা করে ওর বক্তব্য পেশ করার জন্যে ছটফট শুরু হয়ে গেছে ওর মনের মধ্যে।

'অনেক ধন্যবাদ, আমি উঠি এখন! উঠে দাঁড়াল সোহানা।

'আরে, তুমি…মানে…আপনি চা-টা খেয়ে যাও। আনতে পাঠিয়েছি একঘণ্টা আগে।' বজ্র গম্ভীর কণ্ঠে চিৎকার জুড়ল শিল্পী, 'ভোলা! ভোলা! চা আনতে গিয়ে তুই বিস্কুট হয়ে গেলি নাকিরে!' কণ্ঠস্বর নামিয়ে সোহানাকে বলল, 'একটু বসো ভালিয়া, রিকশা ডেকে দিচ্ছি ভোলাকে দিয়ে।'

ভোলার গুরু, ভোলা দি গ্রেট—ভাবল সোহানা। বলল, 'তার দরকার হবে না ধন্যবাদ চলি এখন তাহলে, আদাব।'

'ঠিক আছে, এসো। আর শোনো, যে কোন দিন সকাল দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে একবার এসো। তোমার মুখের বাম দিকটা বেস্ট আসবে। এমন একটা পোর্ট্রেট তুলে দেব না, দেখানোর সাথে সাথেই বিয়ে হয়ে যাবে। আর শোনো, পারলে কুমকুমকে ধরে নিয়ে এসো। পিটিয়ে লাশ করব ওকে আমি···'

সকাল ন'টা। নাস্তা সেরে নাস্তার টেবিলেই গত কয়েক দিনের খবরের কাগজ নিয়ে বসল রানা। কাল রাতেই সংগ্রহ করেছে সে এগুলো। মন দিয়ে পড়ল সে প্রতিটা কাগজে ডক্টর রুহুল আমীনের মৃত্যু সংক্রান্ত প্রত্যেকটি লেখা। পাল্লা দিয়ে লিখতে লিখতে ডাক্তারকে দেবতা বানিয়ে ফেলেছে কাগজগুলো, আর সেই সাথে ক্রমে ক্রমে নরকের কীটে পরিণত হয়েছে দায়িত্বজ্ঞানহীন সাব-ইন্সপেক্টর মাহবুবুল আলম। একে অপরকে টেক্কা দেবার জন্যে আরও তীক্ষ্ণ, আরও শানিত করেছে বক্তব্যের ভাষাকে। যেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্যে জেহাদ ঘোষণা করেছে কাগজগুলো।

পুরো একটি ঘন্টা এবং দুই কাপ চা ব্যয় করল রানা সবটা ব্যাপার সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করে নিতে। মোটামুটি সন্তুষ্ট হয়ে বেরিয়ে পড়ল ওর নতুন কেনা টয়োটা করোনা নিয়ে। মাহবুবের শেষ কথাগুলো যাচাই করে নিতে হবে। ইনস্যুরেন্স কোম্পানীতে প্রয়োজনীয় তথ্য বের করতে সময় লাগল দুই ঘন্টা আহমেদ আলী ইন্‌স্টিটিউটে গিয়ে দেখা করল পুরানো এক বন্ধুর সাথে। ঘন্টা দেড়েকের মধ্যেই প্রয়োজনীয় সন তারিখ টুকে নিয়ে বেরিয়ে এল সে বাইরে মাহবুবের তথ্য নির্ভুল। বছর তিনেক আগে হঠাৎ কপাল খুলে গিয়েছিল ডাক্তারের। চাং-ওয়ার দিকে রওনা হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই কেন যেন মনে হলো রানার. অনুসরণ করা হচ্ছে ওকে।

ঠিক দুটোর সময় পৌঁছল রানা চাং-ওয়া রেস্টুরেন্টে, দোতলায় একটা নিরিবিলি টেবিলে বসে আছে সোহানা। রানা গিয়ে পৌঁছতেই বলল, 'একটা সার্চ ওয়ারেন্ট দরকার। কুমকুম হকের অ্যাপার্টমেন্টটা সার্চ করার প্রয়োজন বোধ করছি।'

'ওরেবাব্বা!' চোখ বড় বড় করল রানা। 'তুমি দেখছি দিল্লী পর্যন্ত পৌঁছে গেছ' দাঁড়াও, দাঁড়াও, দারোগাকে ফোন করে ডেকে আনি আগে। এক সাথেই শোনা যাবে সব কথা।'

সোহানাকে আপত্তি করতে না দেখে একটু অবাক হলো রানা। নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানতে পেরেছে ও। ওয়ারেন্ট বের করতে হলে দারোগাকে ছাড়া হবে না। কাজেই নিচে নেমে এসে ফোন করল সে রমনা থানায়।

'জালাল সাহেব?···হ্যাঁ, মাসুদ রানা।···খাওয়া দাওয়া হয়েছে?···চলে আসুন চাং-ওয়া রেস্টুরেন্টে লাঞ্চের দাওয়াত আপনার।···এক্ষুণি। দশ মিনিটের মধ্যে।··· দোতলায়। আপনার জন্যে অর্ডার দিচ্ছি তাহলে। চলে আসুন।'

উপরে এসে বসল রানা। বেয়ারা লিখে নিল স্যুপ, ফ্রায়েড রাইস উইথ চিকেন, সুইট সাওয়ার প্রণ, ভেজিটেবলস উইথ চিলি, ইত্যাদি ইত্যাদি ছয় সাতটা ডিশের ফিরিস্তি। তিনজনের প্লেট সাজাতে বলল রানা পাশের টেবিলে।

'তুমি কি কি করলে?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'কাজ এগোতে পারিনি, কিন্তু মাহবুবের কিছু কথা কনফার্ম করেছি। ঈস্ট এশিয়া ইনস্যুরেন্স কোম্পানীতে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে গিয়েছিলাম আহমেদ আলী ইন্‌স্টিটিউটে। সত্যি পাঁচ লাখ টাকার লাইফ ইনস্যুরেন্স ছিল ডাক্তারের। অ্যাকসিডেন্টাল বেনিফিট তিন গুণ—অর্থাৎ দাঁড়াচ্ছে পনেরো লাখ। টাকাটা যতশীঘ্রি সম্ভব ডাক্তার-গিন্নীর হাতে তুলে দেয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কোম্পানী। কারণ টাকা যখন দিতেই হবে, ব্যাপারটা গরম থাকতে থাকতেই যদি পেমেন্ট করা যায়, তাহলে এফিশিয়েন্সীর চমৎকার বিজ্ঞাপন হয়ে যাবে এই সুযোগে।' সিগারেট ধরাল রানা একটা। 'আর আহমেদ আলী ইনস্টিটিউটের সিকিউরিটি-ইন-চার্জ মতিউর রহমান বলল, ওদের ওখান থেকে টাকা জিতে নিয়ে যাওয়ার সাধ্য নেই কারও। এটা এক কথায় অসম্ভব। অবশ্য কেউ যদি কাউকে জুয়ার মাধ্যমে ঘুষ বা যে কোন রকম বে-আইনী টাকা দিতে চায় তাহলে আলাদা কথা।'

'অর্থাৎ মতিউর রহমান বলতে চায় যে ডাক্তার জুয়ার মাধ্যমে ঘুষ বা বে-আইনী টাকা পেয়েছে?'

'সরাসরি বলেনি, তবে কথাটার মানে ব্যাখ্যা করলে এই রকমই দাঁড়ায়।'

'কিন্তু জুয়াতে ভাগ্য বলে একটা ব্যাপার রয়েছে। না জিতলে টাকা দেবে কি করে।'

'জেতার দরকার হয় না। মনে করো আমি তোমাকে একলাখ টাকা দিতে চাই। শুধু শুধু নিলে টাকাসহ ধরা পড়ে যেতে পারো, কোথায় পেলে সে জবাব দিতে পারবে না তুমি। কাজেই তোমাকে নিয়ে যাব আমি কোন জুয়ার অনুমোদিত আড্ডায়। টাকাটাকে সমান তিন ভাগে ভাগ করে নিলাম। প্রথম বার তুমি জিতলে, দিলাম এক ভাগ; দ্বিতীয়বার তুমি হারলে, তাও দিলাম আরেক ভাগ; তৃতীয়বারও হারলে, তবু দিলাম একভাগ। ব্যস চুকে গেল।'

'উহুঁ। তবু একটা পয়সা পাই,' হাসল সোহানা।

'কিভাবে? তিন ভাগই দিয়ে দিয়েছি।'

'এক লাখ টাকাকে সমান তিন ভাগে ভাগ করলে প্রতি ভাগে তেত্রিশ হাজার-তিনশো তেত্রিশ টাকা তেত্রিশ পয়সা। কিন্তু তিন ভাগ যোগ দিয়ে দেখো এক পয়সা কম পড়বে। ওটা না দিলে এক লাখ পুরো হবে না কিছুতেই।'

'ঠিক আছে বাবা, অত অঙ্ক বুঝি না।' পকেট থেকে একটা পয়সা বের করে রাখল রানা সোহানার হাতের তালুতে। 'হয়েছে এবার?'

'হয়েছে।' যেন পুরো টাকা বুঝে পেয়েছে এমনি ভাবে রেখে দিল সোহানা

পয়সাটা ব্যাগের ভিতর

ভারী পা ফেলে উপস্থিত হলো ইউনিফরম পরিহিত ও. সি. জালাল শিকদার দারোগাকে দেখেই বেয়ারাদের তৎপরতা দ্বিগুণ হয়ে গেল। খানা রেডি হতেই পাশের টেবিলে গিয়ে বসল ওরা ন্যাপকিনটা কোলের উপর বিছিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে ধরল দারোগা রানার মুখের দিকে। পাকানো গোঁফে তা দিল একবার

'কিছু বের করতে পারলেন?' এক চামচ স্যুপ মুখে তুলল দারোগা।

'মিস সোহানা কিছু বলতে চান আমাদের। নাও সোহানা, শুরু করো। কেন তোমার সার্চ ওয়ারেন্ট দরকার?'

ফটোগ্রাফারের কাছ থেকে যা জানা গেছে বলল সোহানা। সেখান থেকে গিয়েছিল সে নিউ সার্কুলার রোডের সেই তেরো নম্বর ফ্ল্যাট বাড়িতে লেটার বক্সের চিঠিগুলো চুরি করে গাড়িতে নিয়ে পড়েছে সে। একটা চিঠির বিশেষ তাৎপর্য আছে। কে এক শামসুল ইসলাম ভয় দেখিয়ে চিঠি লিখেছে কুমকুমকে। পূর্বতন প্রেমিক সে কুমকুমের। আগের চিঠির জের টেনে লিখেছে: অবৈধ প্রেম যদি বন্ধ না করে তাহলে ভয়ঙ্কর কাণ্ড বাধাবে সে। অ্যাসিড ছুঁড়ে নষ্ট করে দেবে কুমকুমের চেহারা, তারপর আত্মহত্যা করবে চিঠিটা পড়ল যথাক্রমে রানা ও দারোগা সাহেব।

'এ থেকে সার্চ ওয়ারেন্টের প্রশ্ন আসছে কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। ফ্রায়েড রাইস নিল সে প্লেটে।

'আমার যা ধারণা, সেটা বলি আগে। আমার ধারণা, পারিবারিক জীবনে অসুখী ডাক্তার রুহুল আমীনের প্রেমিকা ছিল কুমকুম। বুড়ি মিসেস জোনস্‌কে চিকিৎসা করতে যাওয়ার ছল করে ডাক্তার যেত আসলে কুমকুমের কাছে। বুড়িকে ওই ফ্ল্যাটটা সংগ্রহ করে দেয় এই ডাক্তারই। ক্যামোফ্লেজের জন্যে। কারও সন্দেহের কোন কারণ নেই। বিনা পয়সায় এক বৃদ্ধাকে চিকিৎসা করার জন্যে মহৎ এক ডাক্তার যাওয়া আসা করে তেরো নম্বর ফ্ল্যাট বাড়িতে—কার কি বলবার থাকতে পারে? সবই ঠিকঠাক, কিন্তু পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে সামসুল ইসলাম। হুমকি দিচ্ছে প্রেমের দোহাই দিয়ে, প্রেম আজ মৃত।'

'কিন্তু সে সবের সাথে আমাদের কি সম্পর্ক?' প্রশ্ন করল জালাল শিকদার।

'আমি আসছি সে প্রশ্নে। ধরা যাক, সে রাতে ডাক্তারকে সামসুল ইসলামের হুমকির কথা বলেছিল কুমকুম। হয়তো চিঠিও দেখিয়েছিল। ভয় পেয়েছিল ডাক্তার। সেজন্যেই বেশি রাত পর্যন্ত ছিল ডাক্তার মিসেস জোনসের ঘরে, জানালা দিয়ে বাইরে লক্ষ করছিল বারবার। যখন বুঝল বিপদের সম্ভাবনা নেই তখন গুটি গুটি বেরিয়ে এল সে বাইরে। এদিক ওদিক সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। যে কারণে সন্দেহ জন্মাল মাহবুবের মনে। হঠাৎ একটা লোককে লাফ দিয়ে টর্চ হাতে উঠে দাঁড়াতে দেখেই ডাক্তার ভাবল নিশ্চয়ই শামসুল ইসলামের খপ্পরে পড়েছে। দৌড় দিল আতঙ্কিত ডাক্তার। তারপর ঘটল যা ঘটবার। পালিয়েছে কুমকুম ঝামেলা ও

বদনামের ভয়ে।' খাওয়ায় মনোযোগ দিল সোহানা

'হতে পারে।' সামনে ঝুঁকে এল দারোগা সাহেব। খুবই পছন্দ হয়েছে ওর সোহানার গল্পটা।

'কিন্তু ছোট্ট একটা প্রশ্ন বাকি থেকে যায়।' বলল রানা। 'হারানো পিস্তলটা? সেটা কোথায় গেল?'

অসহিষ্ণু ভাবে হাত নাড়ল দারোগা। 'একবারেই সব উত্তর পাওয়া যাবে এমন আশা করছেন কেন? এইটুকু প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই অনেক কাজ এগিয়ে যাবে আমাদের। এতদিন পিস্তলের ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে সবাই। পিস্তলটা পাওয়া যায়নি, এজন্যেই কেবল নয়, ডাক্তারের কাছে পিস্তল থাকার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ ছিল না। যদি প্রমাণ করা যায় যে পিস্তল ক্যারি করার যথেষ্ট কারণ ছিল ডাক্তারের—অনেকটা এগিয়ে গেল। পিস্তলটা হয়তো কুমকুম হকের। হয়তো আত্ম-রক্ষার জন্যে দিয়েছিল সে ওটা ডাক্তারকে…'

হাসল রানা। 'এবং হয়তো একটা লম্বা রাবার বাঁধা ছিল পিস্তলটায়। হাত থেকে খসে পড়তেই ঝট্ করে ফিরে গেছে সেটা কুমকুমের ঘরে! যাই হোক সার্চ করে কুমকুমের ঘরে কি পাওয়ার আশা করো তুমি সোহানা?'

জবাব দিল জালাল শিকদার। 'ডাক্তার যদি সত্যি সত্যিই কুমকুমের প্রেমিক হয়ে থাকে, তাহলে কিছু না কিছু প্রমাণ আমরা পাবই ওর ঘরে। হয়তো কোন ছবি, কিংবা একটা লুঙ্গি, কিংবা একজোড়া স্লিপার। কিছু পাওয়া যাবেই। যদি প্রমাণ করা যায় যে যতটা মহাপুরুষ বলে মনে করা হচ্ছে আসলে ততটা ছিল না ডাক্তার, তাহলে অনেকটা হালকা হয়ে যাবে মাহবুবের কেসটা। আজকেই সার্চ করা উচিত।'

খাওয়া শেষ করে ন্যাপকিনে মুখ মুছে সিগারেট ধরাল রানা। পুডিং এল, এক চামচ খেয়ে সরিয়ে রাখল সেটা।

সোহানা জিজ্ঞেস করল, 'মাহবুব সাহেবের শেষের কথাগুলো তুমি বিশ্বাস করোনি রানা?'

'করেছিলাম।'

'তাহলে আজ আবার যাচাই করতে গিয়েছিলে কেন?'

'ওই লাইনে এগোতে গিয়ে বিপদে পড়েছিল মাহবুব। আমিও বিপদে পড়তে চাই।'

খাকি পোশাক দেখেই ছুটে এল ম্যানেজার মতলব আলী। ওই বাড়িরই চিলেকোঠায় থাকে সে। বারো, তেরো ও চোদ্দ—এই তিনটে ফ্ল্যাট-বাড়ির ম্যানেজার। চোখ দুটো বসা, বিরক্তি অভিব্যক্তি সারা মুখে, গালে একটা কাটা দাগ। লোকটাকে দেখে বোঝা যায় ভাড়াটেদের অভিযোগ শুনতে শুনতে জীবনটা অস্থির হয়ে আছে তার।

'কি ব্যাপার? আবার কি চান আপনারা?' বিরক্ত কণ্ঠস্বর। 'মিস কুমকুম হক আবার কি করলেন আপনাদের?'

বাঘের চোখে চেয়ে রইল জালাল শিকদার। ভ্রূক্ষেপও করল না মতলব আলী। রানা আশা করছিল খেপে উঠবে দারোগা। কিন্তু না। গোঁফে তা দিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'সার্চ ওয়ারেন্ট আছে। তালাটা ভাঙব, না তুমিই খুলে দেবে?'

'না না না। আমিই খুলে দিচ্ছি।' তালা ভাঙার কথা শুনে ব্যস্ত হয়ে উঠল মতলব আলী। 'নাহ্, মহা মুশকিলেই পড়া গেল। এ রকম শুরু করলে তো চাকরীটা রাখা যাবে না আর। তিন তিনটে ভাড়াটে বাড়ি ছেড়ে দেয়ার নোটিশ দিয়েছে…' ঘর খুলে দিল সে।

ঘরটায় বাসি একটা গন্ধ। ভয়ানক গরম! হাঁ হাঁ করে উঠল মতলব আলী।

'এই দেখেন, ইলেকট্রিক হিটারটা চালিয়ে রেখে দিয়েই তিনি চলে গেছেন কোন্ জাহান্নামে কে জানে! যখন একশো টাকা বিল আসবে তখন মারমুখো হয়ে ছুটে যাবে আমার কাছে। ওয়ায়েরিং-এ দোষ…'

'কবে ফিরবেন আপনাকে বলে যাননি মিস হক?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কোথাও যে গেছে তাই তো জানতাম না। আপনাদের কাছে শুনছি বাইরে গেছে।'

রানা লক্ষ করল, ঘরটা অগোছাল। একটা কাপে আধ খাওয়া কফি রয়েছে, একটা সাময়িক পত্রিকা খোলা পড়ে আছে সাইড টেবিলে; মনে হচ্ছে মেয়েটা ছোট্ট কোন কাজে পাঁচ মিনিটের জন্যে বাইরে গেছে, এক্ষুণি ফিরে আসবে। বেশিদিন বাইরে থাকতে হলে মানুষ যে সব জিনিস গুছিয়ে রেখে যায় সেগুলো অগোছাল।

'আপনি ওই ঘরটা দেখুন,' কাজের কথায় এল দারোগা। 'আমি এই ঘরটা দেখছি, আর মিস সোহানা রান্না ঘর, স্টোর ও গেস্টরুমটা কভার করুন।'

আদেশ অনুযায়ী বেডরুমের দিকে এগোল রানা। ধাক্কা দিতেই খুলে গেল ভিড়ানো দরজাটা। ভিতরটা অন্ধকার। বোঁটকা একটু গন্ধ। বাতি জ্বেলেই থমকে দাঁড়িয়ে রইল রানা কয়েক মুহূর্ত। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সে বিছানার দিকে, রুদ্ধশ্বাসে। তারপর ডাকল ওদের।

'এদিকে আসুন দারোগা সাহেব। তুমিও এসো সোহানা। পালায়নি কুমকুম, বাড়িতেই আছে।'

ডবল বেড খাটের ঠিক মাঝখানটায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে মিস কুমকুম হক। পরনে শুধু একটা সাদা পেটিকোট। রক্তে ভেজা পেটিকোট আর বিছানার চাদর খয়েরী রঙ ধারণ করেছে, শুকিয়ে কুঁচকে গেছে জায়গায় জায়গায়। বিকৃত ভয়ঙ্কর মুখের চেহারা।

পাঁচ

টেলিফোন পেয়ে ছুটাছুটি পড়ে গেল পুলিস বিভাগে। ক্যামেরা নিয়ে এসে ছবি তুলে নেয়া হলো ফিজিকাল এভিডেন্সের জন্যে। অ্যামবুলেন্স এল। পুলিস সার্জেন এল। দক্ষ, অভিজ্ঞ লোক এরা—আধ ঘণ্টার মধ্যেই কাজ শেষ করে স্ট্রেচারে করে তুলে নেয়া হলো কুমকুম হকের লাশ অ্যামবুলেন্সে। প্রবীণ সার্জেন ডক্টর ইয়াকুব চিনতে পারলেন রানাকে।

'কি খবর? বহুদিন পর দেখা। পাঁজরার হাড় কি ফ্র্যাকচার হয়েছিল সেবার?'

'না। এক্সরে করে দেখা গেল কিছুই হয়নি।'

'কপাল ভাল আপনার বলতে হবে।'

'এই মেয়েটার মৃত্যুর কারণ কি বুঝলেন? খুন?' শিকদার ও সোহানা এগিয়ে এল কাছে।

'ঠিক খুন বোধহয় একে বলা যায় না।'

'তার মানে অর্ধেক খুন আর বাকিটা স্বাভাবিক মৃত্যু?' বলল রানা।

হাসলেন ডাক্তার। 'মেয়েটি মারা গেছে সার্জিকাল অ্যাবরশন, অর্থাৎ অস্ত্রোপচারে গর্ভপাতের দরুন। হেমোরেজ এবং অত্যধিক রক্তপাতে ঘটেছে মৃত্যু।'

'এই অ্যাবরশন কি নিজে নিজে করা সম্ভব?'

'না। ইউটেরাসে কিছু ঢুকিয়ে যে অ্যাবরশন করা হয় সেটা অন্যরকম। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, এটা আমারই মত কোন ডাক্তারের কাজ।'

চকচক করে উঠল জালাল শিকদারের চোখ জোড়া। জিজ্ঞেস করল, 'ডাক্তারের হাতের কাজ যদি হয়, রুগীর অবস্থা খারাপ দেখে সে বুঝতে পারবে না? তাকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করবে না?'

'নিশ্চয়ই। যদি ডাক্তারের উপস্থিতিতে হেমোরেজের লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহলে রুগীকে বাঁচানো সহজ। কিন্তু এসব ব্যাপার যখন তখন সিরিয়াস হয়ে যেতে পারে। এই জন্যে মাইনর সার্জারি হলেও রুগীকে হাসপাতালে রাখার পক্ষপাতী আমি। যতদূর সম্ভব এটা অবৈধ গর্ভপাত। বাড়ি ফিরে ব্যথার জন্যে কোন সিডেটিভ খেয়ে শুয়ে পড়েছিল মেয়েটা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী। কিন্তু যখন সত্যি সত্যি গুরুতর হয়ে উঠল অবস্থা তখন কেউ ছিল না পাশে চিকিৎসার জন্যে। বড় দুঃখের বিষয়...জীবনের এমন অপচয়...'

* নীলাতঙ্ক-২ দ্রষ্টব্য

'কবে নাগাদ মারা গেছে আন্দাজ করতে পারেন?' আবার প্রশ্ন করল দারোগা।

'আন্দাজ করতে পারি, কিন্তু নিশ্চয় করে বলা যায় না। সপ্তাহখানেক হবে। ছয় থেকে দশের মধ্যে যে কোন দিন ধরে নিতে পারেন।'

'ধন্যবাদ। আমি ধরে নিলাম আটদিন।'

ডাক্তার চলে যেতেই সাবধান করল রানা জালাল শিকদারকে। 'বুঝতে পারছি আপনি কি ভাবছেন। কিন্তু খেয়াল রাখবেন, কোন প্রমাণ নেই আপনার হাতে। কুমকুম হকের সাথে ডক্টর রুহুল আমীনকে জড়াবার মত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। যাবার সময় সমস্ত প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে গেছে অপরাধী।' সোহানার দিকে ফিরল রানা। 'সোহানা এবার কেসটা কিভাবে সাজালে?'

'খুবই সহজ। কুমকুমের অবৈধ প্রেমিক ছিল ডাক্তার। গর্ভবতী হয়ে খুবই আপসেট হয়ে পড়েছিল সে। টের পেয়েছিল শরীফ আহমেদের মত আপন ভোলা শিল্পীও। এ নিয়ে হয়তো ঝগড়া ঝাঁটি চলছিল ওদের ভিতর। মেয়েটা হয়তো সন্তান নষ্ট করতে চায়নি, হয়তো ডাক্তার কিছুতেই কান দিচ্ছিল না। ইত্যাদি নানান ব্যাপার হতে পারে, যাই হোক, শেষ পর্যন্ত অস্ত্রোপচার করল ডাক্তার। কিন্তু গত মঙ্গলবার এসেই দেখল যে মারা গেছে মেয়েটা। ভয়ানক ভয় পেল ডাক্তার। সর্বনাশ হয়ে যাবে এ ব্যাপারটা প্রকাশ পেয়ে গেলে। মিসেস জোনসের ওখানে বসে বসে সবদিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে যখন সে বুঝল যে ওর ধরা পড়ার সম্ভাবনা নেই, কোন প্রমাণ ফেলে রাখেনি সে পিছনে, তখন চোরের মত বেরিয়ে এল সে বাইরে। এসেই পড়ল মাহবুবের খপ্পরে, স্বাভাবিক ভাবেই গুলিয়ে গেল ডাক্তারের মাথা। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল আতঙ্কিত ডাক্তার।'

'ভাঙা রেকর্ডের মত এক কথা বার বার বলতে বিরক্ত বোধ করছি।' বলল রানা. 'তবু বলতে হচ্ছে। পিস্তলের সমাধান কি?'

এবার জবাব দিল জালাল শিকদার।

'পিস্তল নিয়ে পরে মাথা ঘামালেও চলবে।'

'কেন? আপনি তো সেই সমস্যারই সমাধান খুঁজছেন। তাই না? নইলে উদ্ধার পাচ্ছে না মাহবুব।'

'মাহবুবের চিত্রটা অনেক বদলে যাচ্ছে—সেটা বুঝতে পারছেন না কেন? সবার ধারণা, ও একজন নিরীহ নিরপরাধ ফেরেস্তাকে হত্যা করেছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সে হত্যা করেছে একটা জঘন্য অপরাধীকে।'

'আইনের চোখে কোন তারতম্য হবে না এর ফলে।'

অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল দারোগা। 'পাবলিক ওপিনিয়ন চেঞ্জ হবে। কাগজওয়ালারাই তো বাড়িয়ে তুলেছে ব্যাপারটা এতদূর। সরকার তুষ্টি ছাড়া আর কোন সাবজেক্ট পাচ্ছিল না, তাই আদা-জল খেয়ে লেগেছে মাহবুবের পিছনে। এবার আবার লাগবে ডাক্তারের পিছনে। দেখবেন।'

'তার মানে এসব কথা বলছেন আপনি সাংবাদিকদের?'

একজন কনেস্টবল মাথা ঢোকাল দরজার ফাঁক দিয়ে।

'রিপোর্টাররা অস্থির হয়ে উঠেছে, স্যার।'

'ডেকে আনো।' যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল জালাল শিকদার।

'খেয়াল রাখবেন, কোন বেফাঁস কথা আবার বেরিয়ে না যায়।' সাবধান করল রানা। তারপর বেরিয়ে গেল সোহানাকে নিয়ে। ক্লিক ক্লিক ছবি তুলে নিল কয়েকজন ফটোগ্রাফার।

মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে রানা। সন্ধে সাতটা। স্থান: সোহানার বাড়ির দোতলায় ধানমণ্ডী লেকের দিকে মুখ করা বারান্দা। সামনে বসে আছে ধমক খাওয়া সোহানা ফ্যাকাসে মুখে। সামনের টেবিলে কয়েকটা পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা। এই কিছুক্ষণ আগে বেরিয়েছে।

কোনটার হেডিং 'ডাক্তার জেকিল এ্যান্ড মিস্টার হাইড!' কোনটায় 'বাংলাদেশের শার্লক হোমস: মাসুদ রানা।' 'কোথাও মডেলের মৃতদেহ—ডাক্তার রুহুল আমীন জড়িত?' কোনটায় আবার 'কুমকুম হকের গোপন প্রেমিক ডক্টর রুহুল আমীন?' দারোগা, কুমকুম, হক আর ডাক্তারের ছবির সাথে রানা ও সোহানারও ছবি ছাপা হয়েছে। হি হি করে হাসছে সোহানা ছবিতে। তাতেই আরও রেগে গেছে রানা।

ভদ্রতার খাতিরে সম্পূর্ণ কৃতিত্বের সম্মান চাপিয়েছে জালাল শিকদার রানা ও সোহানার ঘাড়ে। একদিনেই বিখ্যাত হয়ে গেছে মাসুদ রানা। ডাক্তার সম্পর্কিত চাঞ্চল্যকর তথ্য আবিষ্কার করে বাংলাদেশের শার্লক হোমস হয়ে গেছে। কোন কোন পত্রিকায় ওকে শার্লক হোমস ও জেমস বন্ডের অপূর্ব সার্থক সংমিশ্রণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সারা শহরে হুলুস্থুল। 'ভাল-মেয়ে-প্রেমে-পড়ে-বিপথে' এরকম সহানুভূতির ভঙ্গিতে মেয়েটির জীবনী ছাপা হয়েছে। অবৈধ সন্তানের জনক ডক্টর রুহুল আমীনকে বিনা দ্বিধায় সমাজের ঘৃণ্যতম কীটে পরিণত করা হয়েছে। মাহবুবকে শ্রেষ্ঠ পুলিস অফিসার হিসেবে পুরস্কৃত করার দাবি তোলা হয়েছে। 'দৈনিক নির্ভেজাল' আবার কুমকুমের প্রাক্তন প্রেমিক শামসুল ইসলামকে খুঁজে বের করে তার বিবৃতি ছেপেছে। বিবৃতিতে শামসুল ইসলাম এ ব্যাপারের জন্যে সম্পূর্ণ ভাবে দায়ী করেছে কুমকুমের সর্বশেষ প্রেমিককে। বলেছে, কুমকুম ছিল সরল হাসিখুশি বিশ্বাসপরায়ণা ও চরিত্রবতী মেয়ে, ইত্যাদি। শিল্পী শরীফ আহমেদ সাপ্লাই করেছে সোহানার হাস্যোজ্জ্বল ছবি।

টেলিফোনের পর টেলিফোন আসতে শুরু করেছে রানার অফিসে। কেউ অভিনন্দন জানাচ্ছে, কেউ আরও তথ্য জানতে চাইছে, কেউ জিজ্ঞেস করছে মিস্ সোহানা চৌধুরী ওর ভাবী স্ত্রী কি না। জটিল কয়েকটা কেসের ভার রানার যোগ্য হাতে তুলে দেবার জন্যে দেখা করবার অনুমতি ও সময় চেয়ে ফোন করেছে

বারো-চোদ্দজন। ব্যস, পালিয়েছে রানা অফিস বন্ধ করে দিয়ে।

'এত করে বারণ করলাম, ঠেকাতে পারলাম না তো দের।' ভুরু কুঁচকে চাইল রানা সোহানার দিকে। 'ছিট আছে তোমাদের মাথায়

'আমি কি করলাম! ও. সি. সাহেব...'

'তুমিই ওর মাথা খারাপ করেছ। নাহ্, তোমাকে নেয়াই ভুল হয়েছিল আমার।' বিরক্ত মুখে বার কয়েক পায়চারি করে থেমে দাঁড়াল রানা। 'আমি চললাম, কাল দেখা হবে।' লম্বা পা ফেলে ঝড়ের বেগে চলে গেল রানা।

রানার বিরক্তির কারণ টের পেল সোহানা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই

ভালই লাগছিল সোহানার। ভুল হোক আর যাই হোক বিখ্যাত করে দিয়েছে সে রানাকে। বিভিন্ন ধরনের কেস নিয়ে, ভিড় করেছে পঞ্চাশ-ষাট জন রানার অফিসে। রানার অনুপস্থিতিতে সাধাসাধি শুরু করেছে সালমা কবীরকে। টেলিফোনের পর টেলিফোন এসে পাগল করে তুলেছে সালমাকে। ক্ষতিটা কি হয়েছে তাতে? ওরকম মেজাজ দেখানোর কোন মানে হয় না। ভাবছিল, হয়তো খুশি ঢাকার জন্যেই মেজাজের ভান করেছিল রানা।

'টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম!' রাস্তা দিয়ে হকার যাচ্ছে আজকেও টেলিগ্রাম বের করেছে পত্রিকাগুলো। সকালের নিয়মিত সংখ্যায় বিস্তারিত বেরিয়েছে সমস্ত খবর, রানা ও সোহানার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে কাগজগুলো আরও। আবার টেলিগ্রাম কেন? 'ডাক্তারের নামে মিথ্যা প্রচার। টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম!'

ছ্যাঁৎ করে উঠল সোহানার কলজেটা। ছুটে গিয়ে ডাকল হকারকে।

ছি ছি ছি ছি! কান দুটো গরম হয়ে উঠল সোহানার। নতুন তথ্য বেরিয়েছে কাগজে। কুমকুমের লেখা কয়েকটা প্রেমপত্র থেকে জানা যাচ্ছে তার প্রেমিক ডাক্তার রুহুল আমীন নয়, নেহার মেটাল ইন্ডাস্ট্রির ম্যানেজিং ডাইরেক্টার সৈয়দ আবদুল হক। ভদ্রলোক বিবাহিত। তথ্য প্রমাণের মুখে স্বীকার গেছে, কিন্তু বলেছে, গর্ভপাত সম্পর্কে কিছুই জানে না সে। সমস্ত ব্যাপারটা বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা হয়েছে খবরে। প্রথমেই লিখেছে ডাক্তার রুহুল আমীনের পক্ষে অবৈধ সন্তানের জনক হওয়া সম্ভবই ছিল না। কারণ কয়েক বছর আগে শিকারে গিয়ে এক দুর্ঘটনায় একটা পয়েন্ট টু টু বুলেট ডাক্তারের তলপেটে ঢুকে কিডনী ভেদ করে বেরিয়ে গিয়েছিল। অস্ত্রোপচারের ফলে একটা কিডনী ও পাকস্থলীর বেশ কিছুটা অংশই কেবল নষ্ট হয়ে যায়নি, সন্তান জন্ম দেয়ার ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে যায় ডাক্তারের। উপযুক্ত প্রমাণ আছে। কাজেই সন্তানটি ডাক্তারের নয় এর পরেই প্রেম পত্রের অংশবিশেষ ছাপা হয়েছে, সেই সাথে সৈয়দ আবদুল হকের স্বীকৃতি। তারপর লিখেছে ডাক্তার রুহুল আমীন যে অবৈধ গর্ভপাতের ব্যাপারেও জড়িত ছিলেন না সেটা প্রমাণিত হয়েছে নকল এম. আর. সি. ও. জি. ডিগ্রিধারী এক গাইনোকলজিস্ট ধরা পড়ায়। সব কথা স্বীকার গেছে নকল ডাক্তার

এরপর মনের সুখে ধোলাই করা হয়েছে শখের-গোয়েন্দা মাসুদ রানা ও তার সহকারিণী মিস সোহানা চৌধুরীকে। পড়তে পড়তে চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল সোহানার। বার বার চোখে রুমাল চেপেও কিছুই হচ্ছে না—ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করছে সোহানার। এমন নির্মম সমালোচনা ও তির্যক বক্রোক্তির সম্মুখীন হয়নি সে জীবনে।

সবশেষে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে পূর্ব প্রকাশিত ভুল খবর ছাপার জন্যে। একজন সুবিখ্যাত ও সম্মানিত নাগরিকের সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার কারও নেই। সাব-ইন্সপেক্টর মাহবুবুল আলমকে রক্ষা করতে গিয়ে তার নিয়োজিত গোয়েন্দা সমস্ত দোষ ডাক্তার রুহুল আমীনের ঘাড়ে চাপাবার যে গর্হিত প্রয়াস পেয়েছেন সেটা নিন্দা করবার ভাষা আমাদের জানা নেই। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কাঁধের ওপর হাত রাখল কেউ। চমকে চেয়ে দেখল সোহানা মিটিমিটি হাসছে রানা। প্রথমেই চট্ করে চোখের পানি লুকোবার জন্যে মাথা সরিয়ে নিল সোহানা, পর মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার প্রশস্ত বুকে। ডুকরে ডুকরে কাঁদছে সে।

'সব ঠিক হয়ে যাবে সোহানা। কেঁদো না। ছি ছেলেমানুষ নাকি তুমি!'

কিন্তু কে শোনে কার কথা। রানার শার্ট ভিজে একাকার। মিনিট পাঁচেক কেঁদে অনেকটা হালকা হয়ে ত্রস্তপদে চলে গেল বাথরুমে, চোখে মুখে পানি ছিটিয়ে ফিরে এল লজ্জিত মুখে।

'তোমার মুখে চুনকালি মাখিয়ে ছেড়ে দিলাম আমি।' বলল সোহানা। 'খুব রাগ করেছ, না? যদি জানতাম...'

'তাহলে ও পথ মাড়াতে না, এই তো? কিন্তু জেনে রাখো, আসল ভুলটা তুমি করোনি, করেছে জালাল শিকদার। তুমি যেটুকু ভুল করেছ সেই ভুলে আমার অনেক উপকার হয়েছে আসলে। অনেক কিছু জানতে পেরেছি আমি।'

'উপকার হয়েছে!' অবাক হয়ে চাইল সোহানা রানার মুখের দিকে।

'হ্যাঁ। প্রথম উপকার, ডাক্তারের সুনাম রক্ষার উদ্দেশ্যে কারা কাজ করছে জানতে পেরেছি আমি। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এত চমৎকার দক্ষতার সাথে এত সব তথ্য কারা খুঁজে বের করল জেনেছি। অন্তর্নিহিত কারণ, অর্থাৎ কেন ওরা এত কষ্ট স্বীকার করতে গেল, জানতে পারিনি, কিন্তু জানব শীঘ্রি। দ্বিতীয় উপকার হচ্ছে, তোমার চিন্তার লাইনটা মোটামুটি অনুসরণ করে আমার মাথায় কয়েকটা নতুন আইডিয়া খেলতে শুরু করেছে। তৃতীয় উপকার, ক্লায়েন্টগুলোর হাত থেকে রক্ষা পাব এবার। ভাগবে সব। চতুর্থ, এবং এটাই আসল উপকার, ভেউ ভেউ করে কাঁদলে যে তোমাকে এত অপূর্ব সুন্দর দেখায় সে কথা জানা ছিল না আমার, জেনে নিলাম এই সুযোগে।'

'যাহ্ পাজী কোথাকার। শেষেরটা সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা, আর আগের তিনটে মিথ্যে সান্ত্বনা

'না, সত্যি। খোদার কসম।'

'তাহলে এখনও কাজে বহাল আছি আমি?'

'আছ। এখন প্রথম কাজ হচ্ছে তোমার দুই কাপ চায়ের অর্ডার দেয়া। দ্বিতীয় কাজ, বিস্কিটের টিন খুলে গোটাকতক ভাল জাতের বিস্কিট নিয়ে আসা। তৃতীয় কাজ, ঠিক দশ মিনিট পর একটা চুমু খেয়ে আমাকে বিদায় দেয়া।'

'অসভ্য! জানোয়ার।' চলে গেল সোহানা চায়ের কথা বলতে। হালকা হয়ে গেছে মনটা।

একটা ল্যাম্প পোস্টের আলো ঝিলমিল করছে লেকের পানিতে। সুন্দর একটা ঠাণ্ডা হাওয়া উঠেছে সন্ধে হতেই। মীরপুর রোডে ব্যস্ত ট্রাফিক। গভীর চিন্তায় ডুবে গেল রানা।

ছয়

জেড্ এ্যান্ড জেড্। ফাইন্যান্শিয়াল কন্সালট্যান্টস। দিলকুশা কমার্শিয়াল এরিয়ার চারতলা এক অফিস বিল্ডিং-এর সম্পূর্ণ তৃতল জুড়ে বিরাট অফিস। ওয়েটিং রুমে রানাকে বসিয়ে কার্ড নিয়ে ঢুকল সুন্দরী রিসেপশনিস্ট ম্যানেজিং ডাইরেক্টার খসরুজ্জামানের কামরায়। পরমুহূর্তে বেরিয়ে এসে ডাক দিল রানাকে।

'বসুন।' কিছু লিখছিল, মাথা না তুলেই বসতে বলল খসরুজ্জামান রানাকে।

পরিচ্ছন্ন আধুনিক রুচির পরিচয় কামরার সর্বত্র। পুরু কার্পেট। দামী আসবাব। দামী স্যুট খসরুজ্জামানের পরনে। গোল্ড ফ্রেমের চশমা। জুলফির কাছে কয়েকটা পাকা চুল আভিজাত্য বাড়িয়েছে। চমৎকার আকর্ষণীয় চেহারা। বয়সটা আন্দাজ করল রানা, বেয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ।

'বলুন, কি সাহায্য করতে পারি, মিস্টার মাসুদ রানা?' রানার চোখে চোখ রাখল ম্যানেজিং ডাইরেক্টার।

'আপনাদের এক ক্লায়েন্ট ডক্টর রুহুল আমীনের ব্যাপারে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। ইনস্যুরেন্স ক্লেইমের ব্যাপারটা সেটল্ করার জন্যেই এই এনকয়েরি। আপনারাই তো ডাক্তারের সমস্ত অ্যাকাউন্টস হ্যান্ডল করতেন?'

রানার ইঙ্গিতটা টের পেল খসরুজ্জামান। ভ্রূ জোড়া ঈষৎ কুঞ্চিত হলো। রানা একবার ভাবল গোড়াতেই মিথ্যা কথা দিয়ে শুরু করাটা ঠিক হলো কিনা। কিন্তু ব্যাপারটা একেবারে মিথ্যাও নয়। গত পরশু জালাল শিকদারের দৌলতে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যাওয়ার পর ঈস্ট-এশিয়া ইনস্যুরেন্স কোম্পানী থেকে রানাকে এ ব্যাপারে তদন্তের জন্যে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। রানাও গররাজি ছিল না। কিন্তু গত সন্ধ্যায় নতুন তথ্যের দাপটে রানার খ্যাতি হাওয়ায় মিলিয়ে

যেতেই তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে। আজ সকালে সরাসরি নিষেধই করে দিয়েছে, রানা যেন এসব ব্যাপারে নাক না গলায়। কিন্তু এই ঘুঘু লোকের কাছ থেকে কোন কথা বের করতে হলে বড় কোন প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে এসেছে এমন ভাব না দেখিয়ে উপায় ছিল না

'আপনি ঈস্ট এশিয়া ইনস্যুরেন্স থেকে এসেছেন?' সরাসরি প্রশ্ন।

'হ্যাঁ। তারাই আমাকে নিয়োগ করেছে।'

'ঠিক কি জানতে চান আপনি?'

'ডক্টর রুহুল আমীনের ফাইন্যানশিয়াল স্ট্যাটাস সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা দরকার টাকা পেমেন্টের আগে। অনেকগুলো টাকা যদি উনি ওভার ইনশিওরড় হয়ে থাকেন, যদি ওঁর আর্থিক অবস্থা আর ইনস্যুরেন্সের রেশিও গোলমেলে থাকে, তাহলে ঠকবাজি, ইত্যাদি নানারকম সন্দেহের অবকাশ আসে।'

'ডক্টর আমীনের আর্থিক সমস্ত বিষয় আমরা তদারক করতাম। কাজেই ইনস্যুরেন্সের ব্যাপারটাও আমাদেরই এক্তিয়ারে ছিল। যতদূর মনে পড়ছে, এসব প্রশ্ন উঠেছিল এবং এর নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছিল কয়েক বছর আগেই, পলিসি রিভাইভ করার সময়। কাজেই...'

'কিছু মনে করবেন না, আমি আদেশ পালন করছি মাত্র। গত তিন বছর ডক্টর আমীন কোথা থেকে কিভাবে কত টাকা উপার্জন করেছেন তার একটা রিপোর্ট আমার দরকার। ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নটাও লাগবে।'

মৃদু হাসল খসরুজ্জামান। চমৎকার দুই পাটি ঝকঝকে সাদা দাঁত।

'আপনার কথাগুলো হুকুমের মত শোনাচ্ছে। ধরুন, যদি আপনার আদেশ অমান্য করি, কি শাস্তি আমার জন্যে?'

'ভবিষ্যতে অসুবিধায় পড়বেন। কোর্টে যাবে কেসটা। নানান ঝামেলা হবে! তার চেয়ে সহযোগিতা করাই কি ভাল নয়?'

'না, ঝামেলা আমার খুব প্রিয় জিনিস। ঝামেলা ছাড়া জীবন অর্থহীন।'

'আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি খুব বিপজ্জনক জীবন যাপন করেন।'

'সবাই তাই করে। দুনিয়াটা ভয়ানক বিপজ্জনক জায়গা। প্রাণ নিয়ে পালাতে পারে না কেউ এখান থেকে। কাজেই এড়িয়ে যাবার বৃথা চেষ্টা না করে বিপদের মুখোমুখি বুক ফুলিয়ে দাঁড়ানোই ভাল।' আবার হাসল খসরুজ্জামান। 'এটা অবশ্য আমার ব্যক্তিগত দর্শন।'

'ডক্টর আমীন আপনার উপযুক্ত সার্থক শিষ্য।'

মিলিয়ে গেল হাসিটা। 'এ কথা বলছেন কেন?'

'তিনিও জুয়া এবং শেয়ার মার্কেটে ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নিয়ে প্রচুর উপার্জন করেছেন মাত্র তিন বছরে। কিংবা আপনি তাঁর হয়ে করে দিয়েছেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর ওপর ভাগ্য দেবীর এতটা প্রসন্ন হয়ে ওঠার কারণ বুঝতে পারছি না।'

'আপনি খুব অনুসন্ধিৎসু লোক, মিস্টার মাসুদ রানা।'

'যাই হোক, ডক্টর আমীনের উপার্জনের রিপোর্টটা কখন পাচ্ছি?'

'ওটা পাচ্ছেন না।'

'এর ফলে আপনি বিপদে পড়তে পারেন।'

উত্তর না দিয়ে রিসিভার তুলে নিল খসরুজ্জামান। ডায়াল করল দ্রুত।

ঈস্ট এশিয়া ইনস্যুরেন্স?...ম্যানেজিং ডাইরেক্টার আল্লা বকশকে দিন।...আমি খসরুজ্জামান।...কিহে, তুমি না বললে গোয়েন্দাটাকে বারণ করে দিয়েছ?...এই তো বসে আছে।...কি বললে?...সেক্ষেত্রে কান ধরে বের করে দেব, অথবা পুলিসে দেব।...তোমার বিচলিত হওয়ার কিছুই নেই...ঠিক আছে দেখা হবে সন্ধ্যায়, ক্লাবে।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে রানার দিকে ফিরল খসরুজ্জামান। 'কোন্‌টা চান?'

'এই দুটো ছাড়া আর কোন চয়েসের সুযোগ নেই?' মুচকি হাসল রানা।

'আছে। সেটা হচ্ছে সোজা এখান থেকে বেরিয়ে দূর হয়ে যাওয়া। দ্বিতীয়বার মিথ্যা পরিচয়ে আমার অফিসে ঢুকলে কপালে দুটোই জুটবে এক সাথে।'

'আপনি আগেই বুঝতে পেরেছিলেন মিথ্যে বলছি। এতক্ষণ না বোঝার ভান করেছিলেন কেন?'

'কৌতূহল। আপনাকে ওজন করে দেখার ইচ্ছে হয়েছিল। আমার কৌতূহল নিবৃত্ত হয়েছে। আপনি এবার আসতে পারেন।'

'কিছু শেয়ার কিনতে পারি আমি, আপনি বললে আহমেদ আলী ইনস্টিটিউটে জুয়াও খেলতে পারি। দিন না আমাকে ডক্টর আমীনের মত বড় লোক বানিয়ে।'

'ডক্টর আমীনকে কিভাবে আমরা বড়লোক বানিয়েছি বলে আপনার ধারণা?' ছোট হয়ে গেল চোখ দুটো।

'আমার ধারণা আমার কাছেই থাকুক। কিন্তু তিন বছরে ছেঁড়া কাঁথা থেকে একেবারে মিলিওনেয়ার! দিন না আমাকেও বানিয়ে?'

'সাবধান, মিস্টার মাসুদ রানা! ভিত্তিহীন অভিযোগ করেছেন আপনি। এটা আপনার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কিন্তু মনে রাখবেন ডক্টর রুহুল আমীনের মতই জেড এ্যান্ড জেডের সম্মান সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। মিথ্যা অভিযোগ এনে লাভ হবে না কিছুই। প্রমাণ কৈ আপনার?' হঠাৎ কাজে মন দিল খসরুজ্জামান। 'নাউ, প্লীজ গেট আউট।'

বেরিয়ে এল রানা ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের কামরা থেকে। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে কাজ করছে অফিসের পঞ্চাশ-ষাটজন বিভিন্ন পদের কর্মচারী। মোটা মোটা জার্নাল আর লেজার খুলে বসে আছে কয়েকজন, ইলেকট্রিক ক্যালকুলেটারের বোতামে আঙুল চলছে অনায়াস দক্ষতায়।

চলে আসছিল রানা, হঠাৎ লাস ভেগাস নামটা কানে আসতেই থমকে দাঁড়াল। সুন্দরী রিসেপশনিস্ট কথা বলছে টেলিফোন অপারেটারের সাথে। ট্রাংকল বুক করছে সে।

লাস ভেগাস! আমেরিকার জুয়ার শহর। অপরাধ জগতের স্বর্গ। পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম দস্যুদল মাফিয়ার রাজধানী। হেন বেআইনী কাজ নেই যা সেখানে সংঘটিত হয় না। সেখানে কার সাথে কথা বলতে চায় সম্মানিত প্রতিষ্ঠান জেড এ্যান্ড জেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার খসরুজ্জামান চৌধুরী? কেন? রিপোর্ট করছে? নির্দেশ চাইছে? বিপদ সঙ্কেত পাঠাচ্ছে?

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল রানা। ছেড়ে দিল গাড়ি। কিছুদূর গিয়েই আবার সেই সন্দেহটা জাগল রানার মনে। মনে হলো অনুসরণ করা হচ্ছে ওকে। একটা মোড়ে গাড়ি থামাল সে সিগারেট কেনার ভান করে। সাদা ফোক্স ওয়াগেনটা চলে গেল, থামল না। চারজন আরোহী। কেউ চাইল না রানার দিকে। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করল রানা। আর দেখা গেল না গাড়িটা।

সাত

রাত সাড়ে আটটার দিকে বায়তুল মোকাররমে গিয়ে হাজির হলো রানা। শনিবার। ওষুধের দোকান ছাড়া সব দোকান বন্ধ। জি. পি.ও-র সামনে না নেমে ঘুরে এসে মসজিদের পিছন দিকে রাদুর সামনে গাড়ি পার্ক করল সে। এদিকটা অন্ধকার। কয়েকটা কুকুর শুয়ে আছে দোকানের সামনে কুণ্ডলী পাকিয়ে।

নিচের কয়েকটা ওষুধের দোকানে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া গেল। মাহবুবের কথাই ঠিক। জানা গেল, খুব ভাল প্র্যাকটিস ছিল না ডাক্তারের। স্পেশালিস্টদের কাছে আসলে ভিড় করে রোগী। জেনারেল প্র্যাকটিশনারদের উপার্জন সাধারণত আসে ইমার্জেন্সী কল থেকে। কিন্তু ইমার্জেন্সী কল এড়িয়ে চলত ডাক্তার।

দোতলায় উঠে এল রানা। করিডরটা আবছা অন্ধকার। এমনিতেই দোতলায় বিশেষ লোকজনের চলাচল নেই, তার ওপর আজ শনিবার বলে প্রায় জনশূন্য। বেশির ভাগই সায়েন্টিফিক ইন্সট্রুমেন্ট বা ওই ধরনের হোলসেল দোকান, কিছু ইন্ডেন্টারের অফিস—সব বন্ধ। কয়েকজন ডাক্তারের চেম্বার আছে বাম ধারে, সেখানে কিছু লোকের আনাগোনা আছে, এদিকটা প্রায় জনশূন্য।

ডক্টর রুহুল আমীনের দরজাটা খোলা দেখে একটু অবাক হলো রানা। আর কেউ ভাড়া নিল নাকি চেম্বারটা? ঢুকে পড়ল রানা ভিতরে। পর্দা সরিয়ে দেখা গেল রোগীদের বসবার জন্যে সোফা পাতা আছে। পর্দার ওপাশে সেক্রেটারি বা নার্সের জন্যে একটা ডেস্ক। ছোট্ট একটা নেম প্লেট—অলোকা সেন। কেউ নেই সে ঘরে। এর পরে চেম্বার। টেবিলের উপর ডক্টর রুহুল আমীনের প্লাস্টিক নেম প্লেট। পাশের একটা ঘরে রোগী পরীক্ষা করে দেখার ব্যবস্থা। সেই ঘরে খুট খাট শব্দ হচ্ছে। রানার সাড়া পেয়ে মেয়েলী কণ্ঠে কেউ বলল, 'একটু বসুন, আমি আসছি এক্ষণি!'

ডাক্তারের চেম্বারটা লক্ষ করল রানা ঘুরে ফিরে। সুন্দর করে সাজানো। নানান ধরনের কারুকাজ করা দেশী খেলনা রয়েছে বেশ কয়েকটা, নক্‌সা আঁকা কুলো, মাটির পাত্র দেয়ালে টাঙানো। গ্রাম্য হস্তশিল্পের নমুনা। তবু ভুল হয় না যে এটা ডাক্তারের চেম্বার।

একজন নার্স বেরিয়ে এল পাশের ঘর থেকে। গায়ের রঙ শ্যামলা, কিন্তু দেখতে ভাল। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স হবে। বুদ্ধি দীপ্ত দুই চোখ। অ্যান্টি সেপটিক ইউনিফরমে মানিয়েছে চমৎকার!

'এই যে রহিম সাহেব, স্টক রিপোর্ট তৈরি করে ফেলেছি আপনার জন্যে।' একটা কাগজ বাড়িয়ে দিল মেয়েটা রানার দিকে। 'এটা নিয়ে যেতে পারেন, ডুপ্লিকেট কপি আছে আমার কাছে। কিংবা এখানে বসেও দেখতে পারেন, যদি চান।'

হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল রানা। দ্রুত চোখ বুলাল একবার। টেবিল, চেয়ার, খাটিয়া, সিরিঞ্জ, ওষুধ আর যন্ত্রপাতির লিস্ট। খুব সম্ভব অন্য কোন ডাক্তারের কাছে বিক্রি করে দেয়া হচ্ছে জিনিসপত্র।

'কিন্তু আপনার নামটা দেখছি না যে এর মধ্যে?' মিষ্টি করে হাসল রানা।

'কারণ আমি বিক্রয় যোগ্য পণ্য নই।' হাসল অলোকাও।

'তাহলে আমি এর মধ্যে নেই।' যেন দারুণ হতাশ হয়েছে এমনি ভাবে কাগজটা টেবিলের উপর রেখে দিল রানা।

'ব্যঙ্গ না সর্প—কিভাবে ধরব কথাটা?'

'আগে পরিচয়ের পালাটা চুকিয়ে নেয়া যাক। আপনি ভুল করেছেন। আমার নাম রহিম সাহেব নয়। আমি অন্য কাজে এসেছি। অবশ্য আপনার কাছেই। আমার নাম মাসুদ রানা। কয়েকটা কথা জানতে চাই আমি।'

'মাসুদ রানা।' একটু যেন থমকে গেল অলোকা। যেন কোথায় শুনেছে নামটা। পর মুহূর্তে মনে পড়ল। 'আপনি সেই লোকটা। খুনির সমর্থনে যা-তা বলে বেড়াচ্ছেন ডাক্তার সাহেবের নামে। কি চান আপনি আমার কাছে?'

'কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর।'

'আশ্চর্য! কোন্ সাহসে আপনি আমার কাছে এসেছেন আমি বুঝতে পারছি না। আমি দুঃখিত। আপনাকে কোন রকম সাহায্য করতে পারছি না। আপনি আসুন।'

'এই তো এসেছি। একটা চিঠিও এনেছি সাথে। আমাকে দেখে আপনার এ ধরনের মনোভাব হতে পারে আঁচ করে সলীল সেনের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এসেছি।'

'দাদা? ওকালতি করছে আপনার হয়ে? দেখি চিঠি?'

প্রথমেই সইটা পরীক্ষা করে দেখল অলোকা, তারপর পড়ল চিঠি। দু'একটা পারিবারিক সাঙ্কেতিক শব্দে মৃদু হাসি ফুটল ঠোঁটে। চিঠি শেষ করে সোজা চাইল

রানার চোখে।

'হ্যাঁ, এটা দাদারই চিঠি। বসুন। উফ্ আপনি মস্ত বাঁচা বাঁচালেন আমাকে। এক বছর পর খবর পেলাম দাদার। ভাল আছে তো? যুদ্ধে কোন...'

'পায়ে গুলি খেয়েছিল। সেরে গেছে। এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। কাজে যোগ দিয়েছে।'

হঠাৎ বাস্তবে ফিরে এল অলোকা।

'তা আপনি দাদার বন্ধু হয়ে অন্যায়ের সমর্থনে কাজ করছেন কেন?'

'কাজটা অন্যায় মনে করছি না বলেই।' মাথা নেড়ে অলোকাকে আপত্তি জানাতে দেখে চট্ করে যোগ করল, 'এ নিয়ে আপনার সাথে তর্ক না করাই ভাল আপনি ডক্টর রুহুল আমীনকে অনেক কাছে থেকে অনেক ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখেছেন, কাজেই অনেক কিছুই আপনার চোখে পড়ছে না। দূর থেকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে এতটা ভক্তি হয়তো থাকত না, এবং কেন উনি সন্দেহজনক ভাবে দৌড় দিলেন, এবং কেন দায়িত্বশীল একজন পুলিস অফিসার বাধ্য...'

'দায়িত্বশীল! একজন হত্যাকারীকে আপনি দায়িত্বশীল অফিসার বলছেন? নিরীহ ভাল মানুষটাকে খুন করেন আপনারা, তারওপর তার নামে কুৎসা রটনা করলেন একটা বাজে মেয়েলোকের সাথে জড়িয়ে। এ সব কাজকে আবার জাস্টিফাই করার কি আছে? চার বছর ধরে কাজ করছি আমি এখানে, আমি তাঁকে চিনি না, দূর থেকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখেই চিনে ফেললেন আপনারা তাঁকে একটা চরিত্রহীন লোক হিসেবে?

রানা বুঝল এ রকম আলোচনায় ফল হবে না। কৌশলের আশ্রয় নিল।

'ঠিক আছে। ধরা যাক, আমি আর আপনি দুই পক্ষের উকিল। তর্ক যখন করতে চান, তর্কই করা যাক। আপনি ডাক্তারের পক্ষ নিয়ে আমার অভিযোগ খণ্ডন করুন। রাজী?'

রাজী।'

'ডাক্তারের ব্যক্তিগত চরিত্রের ব্যাপারে আপনার মত আমি সম্পূর্ণ মেনে নিচ্ছি। কিন্তু টাকা? এত টাকা পেলেন কোথায় ডাক্তার এত অল্প সময়ে? এ ব্যাপারে সদুত্তর দিতে পারবেন আপনি?'

'পারব। চার বছর আগে দুশো টাকা বেতনে কাজে ঢুকেছিলাম আমি। এখন আমার বেতন সাড়ে পাঁচশো। এক বছর পরই আমার বেতন ডবল হয়ে গিয়েছিল। অথচ আমি জানি ডাক্তার সাহেবের প্র্যাকটিস আগে যা ছিল এখনও তাই আছে। তাই আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ওঁকে এ ব্যাপারে। শেয়ার মার্কেটে স্পেকুলেশন করে টাকা করেছেন উনি। প্রতি পনেরো দিন অন্তর বিরাট সব অঙ্কের চেক আসে জেড এ্যান্ড জেড, ফাইন্যান্শিয়াল কনসালট্যান্টসের কাছ থেকে, আমি নিজে হাতে জমা দিয়েছি সে সব চেক। শেয়ার মার্কেটে কপাল খুলে যাওয়া তো সাধারণ ব্যাপার, তাই না?'

রানা জানে পনেরো দিন অন্তর নিয়মিত শেয়ার মার্কেটের স্পেকুলেশনের টাকা আসতে পারে না। কিন্তু সে কথা বলল না। প্রবল যুক্তির মুখে যেন অনেকটা দুর্বল হয়ে এসেছে, এমনি ভাবে বলল, 'আমার ধারণা ছিল বার্মার বর্ডারে তিরমিজ দ্বীপে চিকিৎসা করেই এত টাকা করেছেন ডাক্তার। তিন বছর আগেই প্রথম সেখানে গিয়েছিলেন উনি?'

হেসে ফেলল অলোকা। 'মাথা খারাপ আপনার। আপনি হয়তো জানেন না, একটা পয়সা দেয়ারও ক্ষমতা নেই ওই দ্বীপের অর্ধ উলঙ্গ লোকগুলোর। এই দেখুন, আঙুল তুলে হস্তশিল্পের নমুনাগুলো দেখাল সে, 'ওদের ভিজিটের নমুনা। ওই যে পাটি, নক্সা করা পাখা, নারকেল খোলার পুতুল, কুলো, বেতের ঝুড়ি—এখানে, এই শহরে কয় পয়সা দাম ওগুলোর? কিন্তু এ সব ছাড়া ওরা দেবেই বা কি? ভালবাসার নিদর্শন ফিরিয়ে দিতেন না ডাক্তার সাহেব, নিয়ে আসতেন ঢাকায়, বেশ কিছু জমা হয়ে গেলে দান করে দিতেন একে ওকে। ওই দেখুন ঘরের কোণে জমে আছে একরাশ।' মাথা নাড়ল অলোকা। 'ভুল পথে ভাবছেন আপনি, মাসুদ সাহেব। আসলে প্রতি মাসের প্রথম ও তৃতীয় সোমবার তিরমিজ দ্বীপে যেতে প্রচুর পয়সা খরচ হত ডাক্তার সাহেবের। বিনিময়ে পেতেন না তিনি কিছুই। পাওয়ার আশাও করতেন না। অ্যামফিবিয়ান প্লেন চার্টার করে মাসে দু'বার করে তিরমিজ দ্বীপে যাওয়া যথেষ্ট খরচের ব্যাপার। সেই সাথে প্রচুর পরিমাণে জামা কাপড় আর ওষুধ নিয়ে যেতেন উনি ওদের মধ্যে বিনা পয়সায় বিতরণের জন্যে। এ ছাড়া গত তিন বছরে (বারো দুগুণে চব্বিশ, আর তিন চব্বিশং) বাহাত্তর দিন অনুপস্থিত থাকায় কত রুগীকে যে ফিরিয়ে দিতে হয়েছে সে আমিই জানি। সব টাকা যদি যোগ দেন, দেখবেন গরীব মানুষের জন্যে সব টাকা ব্যয় করেছেন তিনি।'

'আমি মনে করেছিলাম ওটা শখের ব্যাপার। নিজের পয়সা নষ্ট করে এবং এত টাকার ক্ষতি স্বীকার করে যে উনি কতগুলো জংলী লোকের উপকার করতেন···নাহ্,···শ্রদ্ধাই এসে যাচ্ছে ওঁর ওপর।'

বিজয়িনীর মত হাসল অলোকা সেন। 'এমন কি আবহাওয়ার দরুন যদি কোন সোমবার যেতে না পারতেন পরদিন যেতেই হবে ওঁকে। কারও কোন কথা শুনবেন না। ওঁর ওই এক কথা, আশা করে পথ চেয়ে বসে আছে ওরা।'

'জংলীদের প্রতি এত প্রেম ওঁর স্ত্রী কিভাবে গ্রহণ করতেন?

'ওহ্, ওঁর কথা বলবেন না। ডাক্তার সাহেবের জীবন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিয়েছিলেন ওঁর গিন্নী। ছেলেটাও হয়েছে একটা উচ্ছন্নে যাওয়া অমানুষ। আমার মনে হয় পারিবারিক অশান্তির কথা ভুলবার জন্যেই উনি বেছে নিয়েছিলেন সহজ, সরল, জংলী লোকগুলোর সঙ্গ। ওই যে দেখছেন কাপড়ের পোঁটলা, কিছু নিজে কিনতেন, আর কিছু সংগ্রহ করতেন বন্ধু-বান্ধবের কাছে চেয়ে চিন্তে—সব ওই জংলীদের জন্যে।'

টেলিফোন এল। রহিম সাহেব জানাল যে আজ আর আসতে পারবে না।

কাল আসবে।

'জিনিসপত্র বিক্রি করে দিচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। ডাক্তার গিন্নীর অনুরোধে সমস্ত ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমিই। কাল ছাড়া পাব। হপ্তাখানেক বিশ্রাম নিয়ে আবার বেরোব চাকরির খোঁজে।'

'নার্সের চাকরি তো প্রচুর খালি আছে শুনেছি।'

'আছে। কিন্তু এত বেতনের চাকরি পাওয়া মুশকিল।'

'আপনার খরিদ্দার তো আসছে না, চলুন তাহলে পৌঁছে দিই আপনাকে বাসায়?'

'না, অনেক ধন্যবাদ। আরও কিছু কাজ আছে, আধ ঘণ্টা পর যাব।'

বেরিয়ে এল রানা বাইরে। গাড়িটা পিছন দিকে পার্ক করা। লম্বা পা ফেলে এগোল রানা। কয়েকটা আপাত বিরোধী চিন্তা ঘুরছে ওর মাথায়। ডাক্তারের কথাই ভাবছে একজন লোক একদিকে পাক্কা জুয়াড়ী, অন্যদিকে পরোপকারী; একদিকে চরম অসুখী, সাংসারিক জীবনে স্ত্রী পুত্রকে সুখী করতে পারেনি, অন্যদিকে কোথাকার কোন্ এক জংলী দ্বীপে উজাড় করে দিয়েছে তার সমস্ত ভালবাসা; একদিকে দুই হাতে উড়াবার মত টাকা আছে তার, অন্যদিকে পেশাগত উপার্জন মাঝারি। অসঙ্গতি সবার মধ্যেই আছে, কিন্তু ডক্টর রুহুল আমীনকে এ ব্যাপারে ওয়ার্লড চাম্পিয়ান বলে মনে হচ্ছে।

গাড়ির কাছে এসেই মনটা খারাপ হয়ে গেল রানার। হেলে আছে একদিকে। পাংচার হয়ে গেছে একটা চাকা। বুট খুলে বের করল সে স্পেয়ার চাকাটা।

'টেরাবোল হোয়া গেল লাগে?'

খুব কাছে পিছনে থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠস্বর। ঝট্ করে পিছন ফিরল রানা। চারজন লোক। নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এসে ঘিরে ফেলেছে ওকে অর্ধচন্দ্রাকারে। চিনতে পারল রানা। সেই চারজন সাদা ফোক্সওয়াগেনের সেই অনুসরণকারীরা।

আট

একটা ছোট্ট অ্যামফিবিয়ান উড়ছে আকাশে। শুয়ে আছে রানা নিজের বিছানায়। প্রপেলারের গোঁ গোঁ শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রানা জানালা দিয়ে। ঘাড়ের কয়েকটা পেশী তীব্র আপত্তি জানাল। সারা শরীরে যে এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পেশী আছে জানা ছিল না ওর আগে। উপযুক্ত মর্যাদা দেয়নি সে এদের। রানার দুর্বলতার সুযোগ পেয়ে এখন সব কটা পেশী একসাথে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে ওর।

বেলা নয়টা! আধ ঘণ্টা আগেই ঘুম ভেঙেছে রানার, কিন্তু উঠতে সাহস হচ্ছে

না। আধঘণ্টা ধরে প্রতিটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একটু আধটু নেড়ে চেড়ে পরীক্ষা করছে সে। কেটে বা ছড়ে গেছে কয়েক জায়গা, কিন্তু হাড় যে ভাঙেনি একটাও তাতেই খুশিতে লাফাতে ইচ্ছে করছে ওর। কিন্তু পারছে না।

প্লেনটা দেখে হঠাৎ মনে পড়ল রানার, আজ রোববার। আগামীকাল এ মাসের প্রথম সোমবার। অর্থাৎ ডক্টর রুহুল আমীনের তিরমিজ দ্বীপে যাওয়ার তারিখ। দ্বীপবাসীরা জানেও না যে মারা গেছে ওদের প্রিয় ডাক্তার। ওরা হয়তো কাল শিশুর মত অবুঝ আশায় আকাশের দিকে চেয়ে থাকবে। শিশুর কথা ভাবতেই মিসেস জোনসের কথা মনে পড়ল। ভুরু কুঁচকে গেল রানার। সোমবার যেত ডাক্তার তিরমিজে, মঙ্গলবার যেত মিসেস জোন্সের কাছে। বাঁধা নিয়ম। ডাক্তারের রহস্যময় অনিয়মিত জীবনে এই দুটো নিয়ম বাঁধা। কোন সম্পর্ক আছে এ দুটোর মধ্যে?

তড়াক করে উঠে বসল রানা। হাউ মাউ করে একসাথে আপত্তি জানাল সর্বাঙ্গের সব কটা দুর্ব্যবহারপ্রাপ্ত পেশী। চোখ বন্ধ করে ঝিম ধরে বসে রইল সে আধ মিনিট। তারপর অতি সাবধানে যেন একটি পেশীও টের না পায় এমন ভাবে হাত বাড়াল ব্র্যান্ডির বোতলটার দিকে। আউন্স চারেক ঢালল একটা গ্লাসে। এবার সমপরিমাণ সাবধানে ড্রয়ার থেকে গোটাচারেক ডিসপ্রিন বের করল। একেকটা ডিসপ্রিন নেমে গেল একেক ঢোক ব্র্যান্ডির সাথে সাথে। গলার কাছে মিষ্টি একটা জ্বালা অনুভব করল রানা অ্যালকোহলের।

নাস্তার জন্যে বেল টিপে দিয়ে বাথরুমে ঢুকল রানা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। শেভ করে, দাঁত মাজতে মাজতেই অনুভব করল কমে যাচ্ছে শরীরের ব্যথাটা। উৎসাহিত হয়ে গোসলটাও সেরে নিল সে এই সাথে। চাঙ্গা হয়ে বেরিয়ে এল সে বাথরুম থেকে।

গাড়ির বনেটের উপর ওকে ঠেসে ধরে মনের সুখে মেরেছে ওরা কাল। চারজনের বিরুদ্ধে একজন হওয়ায় ও মেরেছে চার ভাগের একভাগ। জ্ঞান হারাবার আগে টের পেয়েছিল রানা সার্চ করা হচ্ছে ওকে। একজন বলল, 'নেই কিছু।' আরেকটা লাথি পড়ল পাঁজরে। আরেকজন বলল, 'হয়েছে থাক, এতেই তিনদিন বিছানায় শুয়ে থাকবে টিকটিকির বাচ্চা।' আপত্তি করল আরেকজন, 'হয়েছে থাক, মানে? নাকটা ভেঙে দিয়েছে শালা আমার।' আরেকটা লাথি পড়ল। নিশ্চিন্তে জ্ঞান হারাল রানা।

ঘণ্টাখানেক পর জ্ঞান ফিরতেই দেখল সে কালো মত কি যেন ওর মুখের কাছে। একটু নড়তেই তড়াক করে লাফিয়ে সরে গেল। কুকুর। আশেপাশে জন মানুষের চিহ্ন নেই। উঠে দাঁড়াল সে টলতে টলতে। বহু কষ্টে, এক যুগ ধরে চেষ্টা করার পর চাকাটা বদলে গাড়িতে উঠল। রক্তে ভেজা ছেঁড়া শার্টের বুক পকেটে পিন দিয়ে আঁটা এক টুকরো কাগজ। তাতে লেখা: সরে দাঁড়াও মাসুদ রানা। এখনও সময় আছে। এতে যদি শিক্ষা না হয়ে থাকে, মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থেকো। আগামী বার হত্যা করার জন্যে মারা হবে, শিক্ষা দেয়ার জন্যে নয়।

পরিচিত এক ডাক্তারের কাছে ফার্স্ট এইড নিয়ে বাসায় ফিরে ঘুম দিয়েছে রানা।

নাস্তা সাজিয়ে দিয়ে গেছে রাঙার মা। খেয়ে নিল রানা চটপট, তারপর বেরিয়ে গেল গাড়ি নিয়ে। সাত মিনিট পর হাজির হলো সে নিউ সার্কুলার রোডের তেরো নম্বর ফ্ল্যাট বাড়িতে। মিসেস জোন্সের ওখানে ডক্টর রুহুল আমীন প্রত্যেক মঙ্গলবার যেত, নাকি মাসের প্রথম ও তৃতীয় মঙ্গলবার যেত জানতে হবে ওর। যদি পরেরটা হয়, তাহলে এই সূত্র ধরে এগোনো যাবে। বিপদে পড়তে চেয়েছিল সে, বিপদে পড়েছে। অর্থাৎ ঠিক পথেই চলেছে ও। এবার বিপদ থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে হবে। সময় নেই হাতে, ঘনিয়ে এসেছে মাহবুবের বিচারের দিন।

অনেকক্ষণ বেল টিপেও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না বুড়ির। মরল নাকি? গেল কোথায়?

কি করবে ভাবছে রানা, এমন সময় পাইলটের দরজাটা খুলে গেল। তোয়ালেটা কাঁধে, খালি গা, ছোট্ট একটা সুইমিং কস্টিউম পরনে, পায়ে স্লিপার! রানাকে দেখে এক গাল হাসল। 'আবার এসেছেন? এবার ওই বুড়িকে আর আমাকে নিয়ে একটা গল্প ফাঁদবেন বলে মনে হচ্ছে? হঠাৎ দু'পা এগিয়ে এল পাইলট কামরুজ্জামান। কপালে তুলল দুই চোখ। 'ইয়া আল্লা! ছেলেটাকে মারল কে এভাবে?'

'খেলতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলাম।' বলল রানা।

'মিসেস জোনস গেল কোথায় বলতে পারেন?'

'উহুঁ। কিচ্ছু জানি না। কুমকুম হকের ব্যাপারটা জানতে পেরে প্রতিবেশিনীদের সম্পর্কে সব আগ্রহ নষ্ট হয়ে গেছে আমার। আমি তো প্রেমেই পড়ে গিয়েছিলাম, হয়তো বিয়ের প্রস্তাবও দিয়ে বসতে পারতাম—তার যে এত কাণ্ডকীর্তি! ওরেব্বাপ! কি ভুল যে করতে যাচ্ছিলাম! এখনও আঁতকে উঠি আমি ঘুমের ঘোরে। এইজন্যে খোঁজ রাখা ছেড়ে দিয়েছি।'

'না ঠাট্টা নয়। ওকে আমার ভীষণ দরকার।'

'যেখানেই যাক না কেন আসবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। এই ঘণ্টা দেড়েক আগেও খুটুর মুটুর আওয়াজ পেয়েছি দেয়ালের ওপাশ থেকে। অপেক্ষা করতে চাইলে আমার সাথে পুকুর পাড়ে গিয়ে বসতে পারেন। ফ্রী স্টাইল, বাটারফ্লাই, ব্রেস্ট স্ট্রোক আর ব্যাক স্ট্রোকের একদা-চাম্পিয়ানকে দেখতে পাবেন ইন অ্যাকশন। রোজ আধ ঘণ্টা সাঁতার না কাটলে ম্যাজ ম্যাজ করে গা-টা।'

পাইলটের পিছন পিছন পুকুরের দিকে চলল রানা। ছিপছিপে লম্বা সুন্দর ফিগার কামরুজ্জামানের।

'ছুটিতে আছেন না ছাঁটাই হয়েছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'জামানকে ছাঁটাই করা চাট্টিখানি কথা নয় স্যার।' হাসল পাইলট। 'একটা জাহাজও ক্র্যাশ ল্যান্ড করাইনি গত তিনটে মাস। খুশি হয়ে কর্তৃপক্ষ ছুটি দিয়েছে

তিন দিনের।'

পুকুর ঘাটে পৌঁছেই দেখতে পেল রানা একটা বেবীট্যাক্সী থেকে নামছে মিসেস জোন্‌স ধীরে সুস্থে সাবধানে। পাইলটকে 'আসছি' বলে এগিয়ে গেল রানা দ্রুত পদে। পিছন থেকে আক্ষেপ করল জামান, 'ইশ্‌-শ্‌...এত কষ্ট করে একজন দর্শক জোগাড় করেছিলাম, নিল কেড়ে।'

পা থেকে মাথা পর্যন্ত কালো কাপড়ে মোড়া মিসেস জোনসের। শোক-পোশাক। চোখ দুটো ভেজা। রানা বলল, 'কেমন আছেন মিসেস জোনস? আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

ভেজা চোখে রানাকে দেখল বুড়ি। 'আমি খুবই দুঃখিত। তুমি যে আসবে বলেছিলে সেকথা নিশ্চয়ই ভুলে গেছি।'

রানা বোঝাবার চেষ্টা করল যে ওর আসবার কথা ছিল না, কিন্তু নিজের চিন্তায় ডুবে গেছে ততক্ষণে বৃদ্ধা, শুনতে পেল না রানার কথা। 'গোরস্থানে গিয়েছিলাম। রোজই যাই।'

ডক্টর রুহুল আমীনের সৌভাগ্যে ঈর্ষা বোধ করল রানা। তার প্রতি কি অবিচল স্নেহ ছিল বৃদ্ধার, ভাবতে গিয়ে গুলিয়ে এল মাথাটা। একজন জুয়াড়ী কি এমন ভাবে জয় করতে পারে মানুষের হৃদয়? কথা বলে চলেছে বুড়ি, 'কিন্তু আজকে বড় খারাপ ব্যবহার করল ওরা আমার সাথে। একটা খেলনা পেয়ে গেলাম হঠাৎ কাল রাতে। লুকিয়ে রেখেছিল দুষ্টুটা। কাল রাতে ঘুমোতেই পারিনি একটুও। সকালে ওটা নিয়ে গেলাম। কিন্তু কোন কথা শুনতে চায় না ওরা। বলে যে কবর দেবার আগে দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু কি করে দেব, পেলাম তো কাল রাতে। বুঝতে চায় না।' রেগে গেল বৃদ্ধা। 'তোমার কি মনে হয়?'

বিপদে পড়ল রানা। কোন্ বিষয়ে কি বলছে বুড়ি বুঝতে পারেনি সে। অনিশ্চিত কণ্ঠে বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। কার কথা বলছেন?'

'টম্‌। তুমি জানো না? পরশুদিন ভোর রাত্রে মারা গেছে টম্‌। আমাদের নারিন্দা সেমিট্রির একপাশে একটা পেট সেমিট্রি আছে। ওখানে ওর জন্য জমি কিনে কবর দিয়েছি। পাকা করার জন্যে টাকা দিয়েছি—কিন্তু আমার অনুরোধ রাখল না ওরা কিছুতেই।' কাঁপা হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে হাড়ের মত দেখতে একটুকরো রবার বের করল বৃদ্ধা। 'এটা নিয়ে অবশ্য ও বেশি খেলত না। অন্যান্য সবগুলো দিয়ে দিয়েছি কফিনের ভিতর। তোমার কি মনে হয়? ওর কি খুব খারাপ লাগবে এটা ছাড়া?'

বুড়ির চিন্তা সূত্রটা পেয়ে গেছে রানা। 'নাহ্‌, মোটেও না। বরং খুব খুশি হবে।'

'কেন?' রানার মুখের দিকে চেয়ে উত্তর খুঁজছে বৃদ্ধা।

'এটা ওর বেশি প্রিয় খেলনা ছিল না। এটা ও ইচ্ছে করেই লুকিয়ে রেখে গেছে। খুঁজে পেয়ে এটা হাতে নিয়ে মাঝে মাঝেই আপনি ওর কথা ভাববেন, তাতেই ও খুশি হবে বেশি।'

'ঠিক বলেছ।' দরদর করে পানি বেরিয়ে এল বৃদ্ধার চোখ থেকে। 'তুমি ঠিক বলেছ কিন্তু।' রুমাল দিয়ে চোখ মুছল। 'এসো, এক কাপ চা খাবে আমার সাথে।' যত্নের সাথে রবারের টুকরোটা ভ্যানিটি ব্যাগে রেখে এগোল বৃদ্ধা। সেই সাথে বক বক করে চলেছে, 'ডাক্তারের মৃত্যুর পর বড় মনমরা হয়ে গিয়েছিল টম। একরাশ দুঃখ নিয়ে মারা গেছে বেচারা। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় টম স্বর্গে যাবে? কুকুর হলে কি, ওরও তো আত্মা আছে?'

এসব আধ্যাত্মিক প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে রানা বলল, 'ডাক্তার সাহেব প্রত্যেক মঙ্গলবারে আসতেন আপনার কাছে, না এক সপ্তাহ পর পর?'

'প্রত্যেক মঙ্গলবারে।'

একটু থমকে গেল রানা। মাসের প্রথম ও তৃতীয় মঙ্গলবার হলে ওর বড় উপকার হত। হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই জিজ্ঞেস করল, 'শেষ কবে এসেছিলেন ডাক্তার সাহেব?'

'কেন, গত মঙ্গলবার!'

রানা বুঝল বয়সের ভারে সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে বৃদ্ধা। কারণ গত মঙ্গলবার ভদ্রলোক গোরস্থানে। আসলে এসেছিল তার আগের মঙ্গলবার। অর্থাৎ তিরমিজের সাথে এর একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সম্ভব। মিসেস জোনসের পিছু পিছু ঘরে এসে বসল রানা। সত্যিই। টম নেই বলে কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে ঘরটা। আরও অগোছাল হয়ে গেছে সবকিছু। বিষাদ ছড়িয়ে আছে সারাটা ঘরে।

'আরেকটা প্রশ্ন। তিরমিজ দ্বীপের কথা বলেছিলেন ডাক্তার সাহেব আপনাকে? কখনও আলাপ হয়েছিল?'

'একবার।' কেমন একটু মনমরা হয়ে গেল বৃদ্ধা। 'মঙ্গলবার না এসে বুধবার এল ডাক্তার। আমি বলেছিলাম, কেন শুধু শুধু জংলী লোকগুলোর পিছনে এত সময় নষ্ট করো, এখানে তো তোমার অনেক কিছু করার আছে। কেন জানি রেগে গিয়েছিল, একটু দুর্ব্যবহারই করে ফেলেছিল আমার সাথে। বলেছিল—জংলীদের কাছে আপনার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। ওদের জন্যেই এরকম বেগার খাটতে পারছি আপনার পিছনে। অবশ্য পরে লজ্জা পেয়েছিল। আসলে খুবই ভাল মানুষ ছিল তো? আমাকে ভোলাবার জন্যে পরের বার আমার জন্যে একটা সুন্দর গরম শাল এনে দিয়েছিল।'

বিরাট একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। অন্ধকার হাতড়ে এতদিনে পথ পেয়েছে সে।

'অনেক ধন্যবাদ মিসেস জোন্‌স। আপনাকে ছোট্ট একটা বাচ্চা কুকুর এনে দিতে পারি। নেবেন?'

'না, না। তা করতে যেয়ো না। তোমরা ছেলেমানুষ, কিছু হারিয়ে গেলে সেটা পূরণ করে নেয়ার বয়স আছে। কিন্তু আমার এই বয়সে স্মৃতিটাই অমূল্য। সবটাই তো ক্ষতির খাতায়, ক্ষতি পূরণের তাড়া নেই।'

বেরিয়ে এল রানা। চমৎকার সহজ সচ্ছন্দ ভঙ্গিতে ফ্রী স্টাইল সাঁতার কাটছে পাইলট। পা দুটো চলছে দ্রুত প্রপেলারের মত, প্রতি স্ট্রোকে ছয়বার। হাত দুটো দেখে মনে হচ্ছে খুব আয়েস করে, খুব ধীরে ধীরে সাঁতার কাটছে। কিন্তু আসলে অত্যন্ত দ্রুত সাঁতার কাটছে সে। ডান হাতটা ছপাৎ করে পানিতে পড়ছে, সেই সাথে মুখটা ভেসে উঠছে পানির উপর, হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে, আবার চলে যাচ্ছে মুখটা পানির নিচে, ছপাৎ করে আলস্য ভরে পানিতে পড়ছে বাম হাত। গতি বোঝার উপায় নেই সাঁতার সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে।

ঘাটে এসে থামল পাইলট। কুলি করল বার তিনেক, ডুব দিল একটা, তারপর উঠে এল।

'কিছু বলবেন মনে হচ্ছে? আপনাকে দেখে উঠে এলাম; নইলে আরও বার দশেক এপার ওপার করতাম।' তোয়ালে দিয়ে মাথাটা মুছে নিয়ে সেটাকে আলোয়ানের মত গায়ে জড়াল। 'মিসেস জোন্স কি রাজী হয়েছে বিয়ে করতে?'

মৃদু হাসল রানা। 'আপনি সেদিন বলেছিলেন সাহায্য করতে পারলে সুখী হবেন। হঠাৎ আপনার সাহায্য দরকার হয়ে পড়েছে। করবেন?'

'মুখে বলা আর কাজে করা এক নয়। তাছাড়া কথা রাখা আমার স্বভাবে নেই। তবু শুনি, কি সাহায্য?'

'আমি আসলে জানতে চাই পুলিস দেখে ভয় পেয়ে দৌড় দিল কেন ডক্টর রুহুল আমীন। আমার স্থির বিশ্বাস, তিরমিজ দ্বীপ আর মিসেস জোনসের সাথে ব্যাপারটার কোন সম্পর্ক আছে। এদিকে চেষ্টা করে বিশেষ ফল পাওয়া গেল না। এবার তিরমিজ দ্বীপে যেতে চাই আমি। কালকেই। আগামীকাল ডাক্তারের ওই দ্বীপে যাওয়ার তারিখ।'

'খুব ভাল। পারলে যুবতী দেখে একটা জংলী মেয়ে নিয়ে আসবেন আমার জন্যে।'

'আমি প্লেন চার্টার করব। তিনদিনের ছুটি আছে বলছেন। আপনাকে ড্রাইভার হিসেবে পেতে পারি?'

'কত দিবেন হুজুর?' তড়াক তড়াক করে লাফিয়ে কানের পানি বের করছে জামান।

'আপনাকে পয়সা দিতে পারব না। প্লেন ভাড়া করতেই আমার সব টাকা খরচ হয়ে যাবে। সেদিন দুঃখ করছিলেন, জমজমাট চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটার সময় অন দ্য স্পট থাকার সুযোগ হয় না আপনার জীবনে—এবার সে সুযোগ হতে পারে।'

'বাহ্, চমৎকার অফার তো।'

'তার মানে রাজী?'

'উঁহুঁ। তার মানে ভেবে দেখব।'

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল মতলব আলী। 'এই যে, সাহেব!' রানাকে বলছে। 'আবার এখানে কি চান আপনি? মহা জ্বালার মধ্যে ফেললেন দেখছি। আপনাকে এই বাউন্ডারির মধ্যে ঢুকতে কে বলেছে? সেদিন না বলে দিয়েছি আর আসবেন না এখানে? তিন-তিনজন ভাড়াটে নোটিশ দিয়েছে আমাকে···যথেষ্ট হয়েছে। এবার দয়া করে···'' '

'যাচ্ছি আমি।' পাইলটের দিকে চাইল রানা। 'ভেবে বের করতে পারলেন কিছু?'

'কই সাহেব, গেলেন না? ভাড়াটেদের পিছনে এরকম জোঁকের মত লেগে থাকলে···'

'শাট্ আপ।' ধমক দিল পাইলট। ইনি আমার গেস্ট। আমার গেস্টকে তুমি এই ধরনের কথা বলতে পারো না বদ্-মতলব আলী। আমরা তিরমিজ দ্বীপে বেড়াতে যাব ভাবছি, আর তুমি সব ভণ্ডুল করে দিতে চাও? তোমার বদ্-মতলব নিয়ে অন্যখানে অন্যকিছুর চেষ্টা করোগে যাও।'

'ও।' চুপসে গেল যেন মতলব আলী। 'আপনার অতিথি হলে অবশ্য আমার বলার কিছুই নেই। পিছন ফিরল সে। কিন্তু যাওয়ার আগে শুনিয়ে দিল, কিন্তু বড় উদ্ভট সব অতিথি আসে আপনার কাছে জামান সাহেব।'

'হ্যাঁ। উদ্ভট লোক পছন্দ করি আমি। তোমারও আমন্ত্রণ রইল।' বিরক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল জামান অপসৃয়মান মতলব আলীর পিঠের দিকে। নিচু গলায় বলল, 'তোমার কি রে বাপু? তোর এত চিড়বিড়ানি কেন? তুই তো হুকুমের চাকর। ভাবটা যেন সে জেড্ এ্যান্ড জেডের ডাইরেক্টার! নাও চল, পেগ তিনেক হুইস্কি না খেলে কিছু ভাবতে পারব না আর। চলো, ঘরে গিয়ে আলাপ করা যাবে।'

জামানের আন্তরিকতা সহজভাবে গ্রহণ করল রানা। 'চলো। কিন্তু সাহায্য আমাকে করতেই হবে তোমার।'

নয়

নতুন তথ্য পাওয়া গেল।

বারো, তেরো, চোদ্দ—এই তিনটি ফ্ল্যাট বাড়ির ম্যানেজমেন্টের ভার জেড্ এ্যান্ড জেডের সুযোগ্য হাতে ন্যস্ত করে মালিক বিলেত বাস করেন। কয়েক জায়গায় টেলিফোন করেই জানা গেল খবরটা। আরেকটা খবর, আহমেদ আলী ইনস্টিটিউটের ম্যানেজমেন্টের ভারও ওই একই কোম্পানীর উপর ন্যস্ত আছে। বেশ ঘনিয়ে উঠছে ব্যাপারটা। জটিলতর হচ্ছে।

অলোকাকে ফোন করল রানা। 'আপনার ওখানে আসতে চাই একটু।'

'কেন?'

'আমি কাল সকালে তিরমিজ দ্বীপে যাচ্ছি। যে কাপড়ের পোঁটলাটার কথা বলছিলেন কাল, ওটা আমাকে দিলে আমি পৌঁছে দিতে পারি যথাস্থানে।'

'ঠিক আছে। ছ'টার দিকে আসুন। এক্ষুণি বেরিয়ে যাচ্ছি আমি একটা ইন্টারভিউ দিতে। ছ'টার সময় অফিসে আসব একবার। আজকেই চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় হয়ে যাচ্ছি আমি এখান থেকে।'

সোহানার বাসায় গেল রানা।

রানার বিধ্বস্ত চেহারা দেখে চমকে গেল সোহানা। সব শুনে বলল, 'কাপড়গুলো সাথে নিয়ে যাওয়ার কি উদ্দেশ্য?'

'প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য আর একবার অলোকার সাথে কথা বলে এবং ওকে দেখে শ্রবণ ও নয়নেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি। অপর উদ্দেশ্য হচ্ছে ড. রুহুল আমীনের তরফ থেকে যাচ্ছি আমি, জংলীদের মনে এরকম একটা ভাব সৃষ্টি করা। একই দিনে প্লেনে করে ওদের জন্যে সাহায্য সামগ্রী নিয়ে যাচ্ছি আমি।'

'তোমার ধারণা সব রহস্যের মূল ওখানেই?'

'মূলটা ঠিক কোথায় সে সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা করতে পারিনি এখনও। তবে আমার স্থির বিশ্বাস, কিছু একটা ব্যাপার আছে তিরমিজে। এমন কিছু আছে, যেটা আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে ডাক্তারের জীবন। ওর মৃত্যুর জন্যেও হয়তো জংলীরাই দায়ী।'

'বুঝলাম। কাল ওই দ্বীপে যাচ্ছ তাহলে। ইতিমধ্যে আমার কি কাজ?'

'তোমার কাজ হচ্ছে এই মুহূর্ত থেকে আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টা সদা সতর্ক এবং প্রস্তুত থাকা। হালকাভাবে নিয়ো না কথাটাকে। কেবল সতর্ক থাকলে চলবে না, সশস্ত্রও থাকতে হবে। আমরা একটা বিরাট দুর্ধর্ষ দলের বিরুদ্ধে কাজ করছি। যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ আসতে পারে যে কোন দিক থেকে।'

'কেবল সতর্ক থেকে প্রাণ বাঁচাতে হবে, নাকি কিছু কাজও আছে?'

'কাজ আছে। উপযুক্ত সময়ে কাজের ভার দেব। এখন শুধু সতর্ক থাকবে।'

ঠিক ছয়টা পাঁচে পৌঁছল রানা। দরজা বন্ধ। পিতলের নব ঘুরাবার চেষ্টা করল রানা। তালা দেয়া। টোকা দিয়ে সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না কোন। দাঁড়িয়ে রইল রানা খানিকক্ষণ, তারপর পায়চারি শুরু করল। আধ ঘণ্টা পর সন্দেহ এল মনে, ভুলে যায়নি তো? আরও পনেরো মিনিট কাটল। রানা বুঝতে পারল, এত দেরি হবার অন্য কোন কারণ থাকতে পারে না, হয় ভুলে গেছে, নয়তো মত পরিবর্তন করেছে।

আরও পাঁচটা মিনিট অপেক্ষা করল রানা শেষ বারের মত দরজার নবটা নাড়া দিল সে, টোকা দিল কয়েকবার। কোন সাড়াশব্দ নেই।

অনেকক্ষণ ধরেই দূর থেকে লক্ষ করছিল রানাকে আরেকজন ডাক্তারের চেম্বার-অ্যাসিস্ট্যান্ট। প্রতি বিশ মিনিট অন্তর বেরিয়ে আসছে লোকটা করিডরে বিড়ি ফোঁকার জন্যে। চতুর্থবার বেরিয়েও যখন দেখল দরজায় টোকা দিচ্ছে রানা তখন এগিয়ে এল কাছে।

'কাকে খুঁজছেন? চেম্বার তো বন্ধ। ডাক্তার সাহেব মারা গেছেন কয়েকদিন আগে।'

'আমি তাঁর নার্সকে খুঁজছি। দেখা করার কথা ছিল আজকে। দেখেছেন ওকে?'

'আপনি কি পেশেন্ট?'

'না, ইমপেশেন্ট। সেই ছ'টা থেকে দাঁড়িয়ে আছি।'

'আমাদের চেম্বারে বসতে পারেন।'

'অনেক ধন্যবাদ।' লোকটির সৌজন্যে একটু লজ্জিত হলো রানা। একটু আগেই তির্যক একটা ভঙ্গি নিয়েছিল সে। 'আমি বরং বাড়ি চলে যাই।' পকেট থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে দিল ওর হাতে। 'যদি দেখা পান ওর, দয়া করে বলবেন যেন ফোন করে।'

চিন্তিত মুখে বাসার দিকে রওনা হলো রানা। দুপুর বেলা গরম পানিতে গোসল করে এবং আরও দুটো ডিসপ্রিন খেয়ে শরীরের ব্যথাটা দাবিয়ে রেখেছিল সে এতক্ষণ, আবার চেগিয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। কেমন যেন ফাঁকা লাগছে সবকিছু। কাল সকালের আগে কাজ নেই তেমন কিছু। রাত্রিটা পুরোপুরি বিশ্রাম নিতে পারলে কাল অনেকটা সুস্থ বোধ করবে সে বুঝতে পারছে। আগামী পরশু মাহবুবকে হাজির করা হবে কোর্টে। কতদূর এগোতে পারল রানা এই কদিনে? এদিকে খবরের কাগজগুলো প্রায় দেবতা করে তুলেছে ডক্টর রুহুল আমীনকে। রীতিমত ক্যাম্পেইন চালিয়ে লাখ টাকার ওপর ফান্ড তোলা হয়েছে ডাক্তারের অর্ধসমাপ্ত কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। শুধু তিরমিজেই নয়, বাংলাদেশের দুইশো দুর্গম জনবসতির একটা লিস্ট তৈরি করা হয়েছে ডক্টর রুহুল আমীন মেমোরিয়াল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে—কয়েকজন ডাক্তার প্রতিমাসে অন্তত একবার করে চিকিৎসা করতে যাবে এইসব জায়গায়। প্রচার একেই বলে। প্রতিদিন দশ ডিগ্রি করে বেড়ে যাচ্ছে ডাক্তারের সুনাম, প্রতিদিন দুরূহতর হয়ে যাচ্ছে দেবতাটিকে ধূলির ধরাতলে নামিয়ে আনা।

বাসায় পৌঁছে মনটা খুশি হয়ে উঠল রানার। জামান এসেছিল, একটা সুপার গুজ সীপ্লেন চার্টার করেছে সে, কাগজ পত্র পৌঁছে দিয়ে গেছে বাসায়। কাজের লোক। অবশ্য নিজে পাইলট বলে ওর পক্ষে এসব কাজ সহজ। চেনা জানা আছে সবার সাথেই। জামান ছাড়াও একজন মহিলা নাকি এসেছিল, চেনে না তাকে রাঙার মা। শ্যামলা রঙ, নীল ছাপা শাড়ি—এর বেশি জানা গেল না।

খেয়ে নিল রানা ন'টার দিকে লম্বা একটা ঘুম না দিলে পেশীগুলোকে আয়ত্তে

আনা যাচ্ছে না।

শোবার ঘরে ঢুকেই কেন যেন সজাগ হয়ে উঠল রানার চোখ দুটো। খাটের তলা এবং ঘরের চারপাশে দেখে নিয়ে বাথরুমটা পরীক্ষা করল সে। দরজাগুলো দেখা দরকার। বাথরুমে দুটো দরজা—একটা ভিতর দিকে অপরটা সুইপারের জন্যে, বাইরের দিকে। তোয়ালেটা এমন ভাবে ঝোলানো যে বাইরের দরজার বল্টু দেখা যায় না। তোয়ালে সরিয়ে পরীক্ষা করে দেখল রানা বল্টুটা।

ঘরে এসে খাটের কিনারে বসল সে। দুটো ডিসপ্রিন হাতে নিল খোসা ছাড়িয়ে। ব্র্যান্ডির বোতলটা হাতে তুলেই আবার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল ওর চোখ। ভুরু জোড়া কুঁচকে গেছে। ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখল সেটা সাইড টেবিলে। উঠে গিয়ে ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা একগ্লাস পানি নিয়ে উদরস্থ করল সে ডিসপ্রিন দুটো।

ড্রয়ার টান দিয়ে ল্যুগারটা বের করল রানা। রিলিজ বাটন টিপে ম্যাগাজিন বের করে নিল। স্লাইড টেনে চেম্বারের গুলিটা বের করে নিয়ে পরীক্ষা করল পিস্তলটা। হ্যামার, ইজেক্টার স্প্রিং, ট্রিগার অ্যাকশন ঠিকই আছে। আবার লোড করল সে পিস্তলটা, তারপর সাইলেন্সার পাইপ লাগাল ওটার মুখে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে। উজ্জ্বল বাতিটা নিভিয়ে পাঁচ ওয়াটের নীল বাতি জ্বেলে দিয়ে বিছানায় এসে বসল সে আবার।

বালিশে হেলান দিয়ে আধ-শোয়া হয়ে বসে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল রানা। গোটা তিনেক সিগারেট ধ্বংস হলো কেবল। সমাধান পাওয়া গেল না সমস্যার। কিছুতেই খাপ খাওয়ানো যাচ্ছে না এক তথ্যের সাথে আরেকটাকে।

চমকে উঠল রানা হঠাৎ কানের পাশে টেলিফোনটা বেজে উঠতেই। বোধহয় অলোকা ফোন করেছে। ইনিয়ে বিনিয়ে বলবে কেন কথা রাখতে পারেনি। আমার না, ভী…ষ…ণ…

না। ফোন করেছে জামান।

'কি করছ গোয়েন্দা সাহেব?'

'বিছানায়।'

'কাগজপত্র পেয়েছ সব? উহ্, ঝামেলা পোহাতে হয়েছে অনেক। আমিও ঘুমিয়ে পড়ব ভাবছি, কিন্তু হয়ে উঠছে না। বোতলটায় আর মাত্র পেগ তিনেক আছে। আর একটা, আর একটা, করতে করতে ছয় পেগ হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। এবার বাকিটুকু ঢুক করে মেরে দিয়ে শুয়ে পড়ব।'

লোলুপ দৃষ্টিতে ব্র্যান্ডির বোতলটার দিকে চাইল রানা একবার। খুব মৌজে আছে ব্যাটা।

'আমিও ভাবছি আউন্স তিনেক খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ব। কিন্তু তুমি এত খাচ্ছ কেন, কাল আটটায় উঠতে পারবে তো!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক আটটায় এয়ারপোর্টে পাবে আমাকে। এক-আধ ঘণ্টা দেরি হলে তুমি উঠে পোড়ো আকাশে, আমি দৌড়ে ধরে নেব বাই বাই।'

বেড-সুইচ টিপে দিতেই নিভে গেল নীল বাতিটা। রানার ঘরটা অন্ধকার এখন।

রাত সাড়ে এগারোটা।

সাদা একটা ফোক্সওয়াগেন ছুটে আসছে ষাট মাইল বেগে। আরোহী চারজন। রানার বাসা থেকে দেড়শো দুশো গজ দূরে থাকতেই গিয়ার নিউট্রাল করে হেড-লাইট আর ইগনিশন সুইচ অফ করে দিল ড্রাইভার। বন্ধ হয়ে গেল এঞ্জিন। মসৃণ রাস্তার সাথে চলন্ত চাকার ঘর্ষণের ফলে মৃদু একটা চড় চড় শব্দ আসছে কেবল। বেশ কিছুদূর সমান গতিতে গিয়ে ধীরে ধীরে গতিবেগ কমে এল গাড়িটার। রানার বাসার সামনে এসে থেমে দাঁড়াল একটা কামিনী ঝোপের আড়ালে। নিঃশব্দে।

নিঃশব্দে নামল চারজন। দু'জনের হাতে পিস্তল, দু'জনের হাতে ছুরি। রানার শোবার ঘরের খাটের কাছে দুই জানালায় দাঁড়াল দু'জন পিস্তলধারী। খাটের উপর আবছা দেখা যাচ্ছে শুয়ে আছে একজন, গায়ে চাদর ঢাকা। ছুরি হাতে বাকি দু'জন পিছন দিকে চলে এল। বাথরুমের বাইরের দিকের দরজার কাছে। সিঁড়ি দিয়ে তিন ধাপ উঠে আস্তে সাবধানে ঠেলা দিল একজন দরজায়। খুলে গেল একপাট দরজা। এবার অপর পাটটা খুলে বিড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গেল ওরা বেডরুমের দিকে।

একজন হৃৎপিণ্ড আর একজন পেট সই করে ছুরি চালাল এক সাথে। ছুরি মেরেই হতভম্ব হয়ে গেল দু'জনই। কিন্তু সামলে ওঠার আগেই প্রচণ্ড বেগে কি যেন এসে লাগল ঘাড়ের পিছনে। ঘুপ্ ঘাপ্ করে দুটো আওয়াজ। পিস্তলের বাঁট দিয়ে মেরেছে কেউ। মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল দু'জন মেঝের উপর।

'কিরে, কি হলো?' ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে চাপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল খাটের মাথার কাছে জানালায় দাঁড়ানো লোকটা। 'ইদ্রিস! কি হলো?'

কোন জবাব নেই। বিচলিত হয়ে উঠল বাইরের দু'জন।

'কি হলো, ইদ্রিস?'

'চুপ।' চাপা কণ্ঠ শোনা গেল।

আশ্বস্ত হলো পিস্তলধারী। আধ মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে অস্থির হয়ে উঠল সে আবার। 'ইদ্রিস!'

ঠিক এমনি সময় পিছন থেকে একটা জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। রানার কণ্ঠস্বর।

'হ্যান্ডস্ আপ।'

টাশশ্! ঘুরেই গুলি করল লোকটা! খান খান হয়ে গেল রাত্রির নিস্তব্ধতা। দূরের একটা বাড়িতে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল গুলির প্রতিধ্বনি। টাশশ্! আবার গুলি। দৌড় দিল দু'জন দু'দিকে।

ঘাসের উপর শুয়ে ছিল রানা। তড়াক করে উঠে হাঁটু গেড়ে বসে গুলি ছুঁড়ল।

ছোট্ট একটা কাশির আওয়াজ তুলে লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল পিস্তলের মুখ থেকে একটা নাইন এম. এম. বুলেট। মাথার উপর হাত ছুঁড়ে হুড়মুড় করে পড়ল একজন লনের উপর। অপরজন ততক্ষণে গেটের কাছে। আবার গুলি করল রানা। ঠন্ করে ঢুকল গুলি ফোক্সওয়াগেনের বনেটে। টাশ্শ্! রানার হাতখানেক তফাতে মাটিতে লাগল গুলি। ছিটে এসে মাটির কণা লাগল নাকে মুখে। আবার গুলি করল রানা। কিন্তু ততক্ষণে গাড়িতে উঠে এঞ্জিন স্টার্ট দিয়েছে লোকটা। হুশ করে চলে গেল ফোক্সওয়াগেন নাগালের বাইরে।

লনের উপর পড়ে থাকা লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। বাম দিকের শোল্ডার ব্লেড ভেদ করে বেরিয়ে গেছে গুলিটা। জ্ঞান হারিয়েছে সাথে সাথেই। কিন্তু বাঁচবে।

পিস্তলটা কোমরে গুঁজে বাথরুমের পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকতে গিয়েই হোঁচট খেল রানা। হোঁচট খেয়েই টের পেল ওটা একটা জ্ঞানহীন দেহ। মুহূর্তে এক লাফে সরে গেল সে। কারণ নিমেষে বুঝে নিয়েছে সে যে ঘরের ভিতরের যে কোন একজন জ্ঞান ফিরে পেয়েছে কিছুক্ষণ আগেই, টেনে নিয়ে এসেছে সঙ্গীকে দরজা পর্যন্ত, অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছে না রানা ওকে, কিন্তু ও দেখতে পাচ্ছে রানার ছায়াটা পিছনে আকাশ থাকায়। এখুনি ছুরি চালাবে ও।

লাফ দিয়েই পা বেধে গেল রানার বাথটাবের কিনারে। পড়ে গেল সে। মাথাটা ঠুকে গেল মোজাইক করা দেয়ালে। ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর লোকটা। অন্ধের মত ঘুষি চালাল রানা। অনুভব করল খচ্ খচ্ করে বাম বাহুতে ঢুকল ছোরাটা দু'বার। অন্ধকারে টের পাচ্ছে না লোকটা কোথায় মারছে।

ঠিক এমনি সময়ে হুইস্‌ল্ শোনা গেল বাইরে। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল লোকটা। সাথে সাথেই লাথি চালাল রানা। তলপেটে লাথি খেয়ে ছিটকে চলে গেল লোকটা দরজার কাছে, সঙ্গীর গায়ে পা বেধে ডিগবাজি খেয়ে চলে গেল বাইরে। পিস্তলটা বের করে হাতে নিয়ে দরজার কাছে গিয়েই দেখতে পেল রানা প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে লোকটা বাড়ির পিছনের বাউন্ডারির দিকে।

জ্বলে উঠল একটা টর্চ। চোখ ধাঁধানো আলো পড়ল রানার মুখে। একটা অপরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল টর্চের পিছনের অন্ধকার থেকে।

'পিস্তল ফেলে দিন মিস্টার মাসুদ রানা। নইলে গুলি করব। ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।'

দশ

একটা ব্যাপারে নিঃসন্দেহ রানা, ঠিক পথেই এগোচ্ছে সে।

নইলে এরকম বেপরোয়া আক্রমণ আসত না। কারও পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে সে। কোন একটা স্পর্শ কাতর নার্ভ সেন্টারে হাত দিয়ে ফেলেছে ও এখনও মুখটা চেনা যাচ্ছে না শত্রুর, কিন্তু কাছে পিঠের পরিচিত কেউ হবে। মোটামুটি আঁচ পাওয়া যাচ্ছে। লোকটা এমন কেউ, যার সাথে ডাক্তারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে; এমন কেউ, যার সাথে আলাপ হয়েছে রানার; এমন কেউ, যে রানার বাসায় এসেছিল; এমন কেউ, যে রানার গতিবিধি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল; এমন কেউ, যে জানত রানা কখন বাসায় নেই। বৃত্তটা ছোট হয়ে আসছে। একটা বিন্দুতে এনে দাঁড় করাতে হবে। দরজার বল্টুটা খুলে রেখে গিয়েছে। ব্র্যান্ডির বোতলে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়ে গেছে। কে হতে পারে? খুব সহজে ঘুমের ওষুধ সংগ্রহের সুবিধা কার আছে?

অলোকা?

'এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত গুনব। তারপর পায়ে গুলি করব। পিস্তল ফেলে দিন মিস্টার মাসুদ রানা। এক···'

সংবিৎ ফিরে পেল রানা। পুলিসের সাড়া পেয়ে আশ্বস্ত বোধ করছিল সে, কিন্তু এ কী বিপদ। চট্ করে ছেড়ে দিল পিস্তলটা ক্ষত থেকে। খটাং করে মেঝেতে আওয়াজ হলো। হ্যাঁ, কি যেন বলেছিল টর্চধারী? ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট। কেন! সজাগ হয়ে উঠল রানার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। বিপদ!

'এবার মাথার উপর হাত তুলে ঘুরে দাঁড়ান। ধীরে ধীরে এগোন ওই ঘরের দিকে।'

আদেশ পালন করল রানা। টর্চ হাতে পিছু পিছু এল লোকটা। একজনকে অর্ডার দিল, 'এই বডিটা দেখো মারা গেছে কিনা। এটাকেও জীপের পিছনে তুলে তোমরা তিনজন পাহারায় থাকো। আমি আসছি। আর সিদ্দিক দৌড়েছে আরেকজনের পিছু পিছু। ফিরে এলে এখানে পাঠিয়ে দেবে।'

'ইয়েস স্যার।'

টর্চের আলোয় ঘরের সুইচ খুঁজে পেয়ে বাতি জেলে দিল লোকটা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রানা, অল্প বয়সী সাব-ইন্সপেক্টর একজন। কাছে এলে পিছন থেকে দক্ষ হাতে সার্চ করল রানাকে, কিছু না পেয়ে পিছিয়ে গেল কয়েক পা। 'এবার ঘুরে দাঁড়াতে পারেন আপনি। হাতের কাটা জায়গায় রুমাল চাপা দিতে পারেন ইচ্ছে করলে।'

'কি ব্যাপার মিস্টার রুস্তম আলী?' বাম হাতের ক্ষত দুটোর দিকে একবার চেয়ে প্রশ্ন করল রানা। রক্ত ঝরছে টপ টপ।

'আপনি আমাকে চেনেন?' অবাক হলো সাব ইন্সপেক্টর।

'নাম শুনেছি। আপনি মাহবুবের বন্ধু।'

'হ্যাঁ। অকৃত্রিম বন্ধু বলতে পারেন। আমি জানি, আপনি মাহবুবের হয়ে কাজ করছিলেন। ও. সি. সাহেবের বোকামিতে দুর্নামও সহ্য করেছেন মুখ বুজে।

আপনাকে অ্যারেস্ট করতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত। আমি অর্ডার প্ালন করছি মাত্র। কিন্তু এখানে এসে দেখছি কুরুক্ষেত্র বেধে গেছে। ব্যাপারটা কি?'

'আমাকে খুন করতে এসেছিল চারজন।'

'কেন?'

'সেটা আমারও প্রশ্ন।'

'এমনি হঠাৎ এসে হাজির হলো ওরা?'

'না। রীতিমত প্ল্যান করে এসেছে। আমি পৌনে ছ'টায় বেরিয়ে যাই বাসা থেকে। সেই ফাঁকে ওদের লোক এসেছিল আমার বাসায়। ওই বাথরুমের দরজার বল্টুটা খুলে রেখেছিল, ব্র্যান্ডির বোতলে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল। টের পেয়ে ওদের ফাঁদে পা না দিয়ে ঘর অন্ধকার করে অপেক্ষা করছিলাম আমি। ওই দেখুন আমাকে মনে করে বালিশ দুটোকে কি ভাবে স্ট্যাব করা হয়েছে।'

পরীক্ষা করল রুস্তম আলী বালিশগুলো। ব্র্যান্ডির বোতলটা তুলে বোতলের গায়ে সামান্য লেগে থাকা বারবিচুরেটের গুঁড়ো পরীক্ষা করল, চেটে দেখল তেতো কিনা। তারপর বলল, 'বসুন মিস্টার মাসুদ রানা। একটু ভাবতে হবে আমাকে। আমার প্রতি জালাল শিকদার সাহেবের ব্যক্তিগত অনুরোধ—মাসুদ রানাকে সব রকম সাহায্য করবে; আর অফিশিয়াল অর্ডার—মাসুদ রানাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসবে। কি করব বুঝতে পারছি না। গুলিয়ে আসছে মাথাটা। এদিকে নিজ চোখে স্পষ্ট প্রমাণ দেখতে পাচ্ছি, আপনাকে খুন করতে চাইছে একদল লোক; আবার ওদিকে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ...'

'কি অভিযোগ?'

'কড়া অভিযোগ। বলপূর্বক অনুপ্রবেশ, চুরি, ভয়ঙ্কর অস্ত্রের সাহায্যে আঘাত, এবং সম্ভাব্য খুন। আচ্ছা...পৌনে ছয়টায় বাসা থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন? আপনি?'

'ডক্টর রুহুল আমীনের চেম্বারে। বায়তুল মোকাররম। ওঁর নার্স অলোকা সেনের সাথে দেখা করতে। কেন?'

বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সাব-ইন্সপেক্টর রুস্তম আলী রানার মুখের দিকে। দশ সেকেন্ড পর মাথা নাড়ল সে। 'নাহ্। আপনি নিশ্চয়ই নন। মানুষ এতটা ভাল অভিনয় করতে পারে না।'

'কি বলছেন কিছু বুঝতে পারছি না। অলোকার কিছু হয়নি তো! একটু বুঝিয়ে বলুন, এবং তাড়াতাড়ি।'

'হয়েছে। সাড়ে সাতটার সময় চেম্বারের পজেশন অপর একজন ডাক্তারকে বুঝিয়ে দিতে লোক গিয়েছিল জেড এ্যান্ড জেড কোম্পানী থেকে। ঘরের সমস্ত জিনিস পাওয়া গেছে ভাঙাচোরা অবস্থায়, ওয়াশ-বেসিনের পাশে পাওয়া গেছে অলোকা সেনের জ্ঞানহীন দেহ, ছুরি দিয়ে কাচা হয়েছে ওকে মোরব্বার মত।'

'মারা গেছে?'

'এখনও যায়নি, কিন্তু অবস্থা খুবই খারাপ, যেকোন মুহূর্তে মারা যেতে পারে। একজন কেমিস্ট পৌনে ছ'টায় দেখেছে অলোকাকে চেম্বারে ঢুকতে, আরেকজন পৌনে সাতটায় আপনাকে ওখান থেকে চলে যেতে দেখেছে। দরজার নবের উপরে আপনার হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। ডক্টর আনিসের চেম্বার-অ্যাসিস্ট্যান্ট আপনাকে নবে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। হুলুস্থূল কাণ্ড বেধে গেছে। থানা যদি নন্-কোঅপারেশন করে সেই ভয়ে সমস্ত পত্রিকা অফিসে খবর দিয়ে দিয়েছে কেউ। সারাটা থানা এখন কিলবিল করছে রিপোর্টারে।'

'তারা এখান পর্যন্ত এল না কেন?'

'কেউ ভাবতেই পারেনি যে আপনাকে বাসায় পাওয়া যাবে।'

'যাক, একটাই মাত্র সুখবর আছে আমার জন্যে।' বলল রানা। 'মেয়েটা মারা যায়নি। ওই মেয়েই বলবে যে আমি করিনি কাজটা।'

'যদি বাঁচে তাহলে তো!'

'আশ্চর্য! আমার সাথে দেখা করার কথা ছিল ঠিক ছ'টায়। পাঁচ মিনিট দেরি করে ফেলেছিলাম। চল্লিশটা মিনিট আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম, করিডরে পায়চারি করলাম, অথচ টেরই পেলাম না কিছু। হয়তো তখন মুমূর্ষু অবস্থায় ধুঁকছে অলোকা ঘরের ভিতর। মেয়েটা আমার এক বিশিষ্ট বন্ধুর বোন।...আচ্ছা, আপনি নিজে দেখেছেন? চেম্বারের অবস্থাটা কি রকম? কি মনে হয়? মারামারি হয়েছিল ওখানে?'

'না। মারামারির মত নয়। মনে হয় কেউ তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে কিছু সারাটা ঘরে। ড্রয়ারগুলো টেনে সমস্ত জিনিস ফেলা হয়েছে মেঝেতে। যা হাতের সামনে পেয়েছে তাই চুরমার করেছে লোকটা। কিছুই আস্ত রাখেনি। ডক্টর আমীনের ব্যাগটা ফালি ফালি করে কেটেছে ছুরি দিয়ে। এমন কি পুতুলগুলো পর্যন্ত ভেঙে টুকরো টুকরো করেছে। মনে হয় উন্মাদের কাজ।'

'আপনার কি ধারণা কাজটা আমার হতে পারে?'

'না। সেইজন্যেই দ্বিধায় পড়েছি। একটা ব্যাপার ভাবছি—আমি শুনেছি মাহবুব আর জালাল সাহেবের মত আপনিও বিশ্বাস করেন যে ডাক্তারের কাছে পিস্তল ছিল। আমি অবশ্য একথা বিশ্বাস করি না, কারণ, থাকলে ওটা পাওয়া যেতই। ভাবছি—সেই পিস্তলটা খুঁজে পাওয়ার বৃথা চেষ্টা করতে গিয়ে আপনার পক্ষে ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকে...'

হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠল রানা। এক পা পিছিয়ে গেল রুস্তম আলী।

'ঠিক বলেছেন! আসলে পিস্তলটাই খোঁজা হয়েছিল ওখানে!' উত্তেজিত ভাবে বলল রানা।

'এটা স্বীকার করলে কিন্তু বিপদে পড়ছেন আপনি।' সাবধানে বলল রুস্তম আলী।

'কাজটা আমি করিনি।' মাথা চুলকাল রানা। 'আমারই মত হন্যে হয়ে পিস্তলটা খুঁজছে নিশ্চয়ই শত্রুপক্ষ। কাজটা তাদের। বুল্‌স্ আই হিট করেছেন

আপনি মিস্টার রুস্তম আলী। ইউ আর রাইট! পিস্তল খুঁজছিল।'

'বুঝলাম না।'

'বুঝতে হবে না। একঘণ্টা সময় পেলেই মাহবুবের সপক্ষে সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করে ফেলব আমি।'

'সময় পাচ্ছেন কি করে? আপনি নিজেই তো অ্যারেস্টেড। ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার চার্জের বেইল হয় না।'

'কেউ জানে না যে আপনি আমাকে বাসায় পেয়েছেন। একটা ঘণ্টা সময় পেলে আমার বা মাহবুবের বিরুদ্ধে সমস্ত চার্জ খণ্ডন করে দিতে পারব। শুধু একটা ঘণ্টা সময় দিন।'

'অফিশিয়াল ও আন-অফিশিয়াল অর্ডারের কোন্‌টা পালন করব বুঝতে পারছি না।'

'জালাল সাহেব ঠিক কি অর্ডার দিয়েছেন আপনাকে?'

'উনি বলেছেন, উনি বিশ্বাস করেন না যে ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে আপনি ওই কাজ করতে পারেন। নিশ্চয়ই কেউ আপনাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে নিজের কাজ উদ্ধার করতে চাইছে। উপযুক্ত প্রমাণের সাহায্যে আপনি পুলিসের হাত থেকে ছুটে বেরোতে বেরোতে নিজের কাজ গুছিয়ে নেবে সে। ওদিকে আপনাকে গ্রেফতার করার আদেশ না দিয়ে ওঁর উপায় নেই। আমাকে বলেছেন, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে।'

'অবস্থা কি বুঝলেন?'

'বুঝলাম দারোগা সাহেবের কথাই ঠিক। দ্বিমুখী আক্রমণ চালিয়েছে আপনার উপর কোন অজ্ঞাত শত্রুপক্ষ। আপনাকে খুন করে ফেলতে পারলে সব ঝামেলা শেষ হয়ে যায়, সেজন্যেই খুনের চেষ্টা। কিন্তু যদি কোনভাবে এদের হাত থেকে বেঁচে যান তাহলে পুলিস যেন আপনাকে জেলে পুরে আপনার সমস্ত তৎপরতা বন্ধ করে দেয়, সে ব্যবস্থাও করে রেখেছে। কিন্তু পুলিস সেটা করবে না।' ছুঁড়ে দিল রানার পিস্তলটা রুস্তম আলী। খপ্‌ করে ধরে ফেলল সেটা রানা শূন্যে। নিজের রিভলভারটাও বিছানার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'বেকায়দায় পেয়ে হঠাৎ ছিনিয়ে নিয়েছেন আপনি আমার পিস্তল। বেঁধে ফেলেছেন আমাকে খাটের সাথে। তারপর জীপে বসা সেপাইগুলোর চোখে ধুলো দিয়ে উধাও হয়ে গেছেন।'

'বুঝলাম। অনেক ধন্যবাদ। এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব আমি। অবশ্য যদি বেঁচে থাকি।' হাসল রানা।

'দয়া করে প্রমাণ সংগ্রহ করে আনবেন। নইলে আমি আর ও.সি. সাহেব দু'জনেই বিপদে পড়ব। চাকরি যাবে নির্ঘাত।'

'আপনার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে চেষ্টা করব। নাটকটার শেষ দৃশ্যে চলে এসেছি আমরা। যবনিকার বেশি দেরি নেই। আসুন বেঁধে ফেলি আপনাকে।'

হঠাৎ তৃতীয় একটি কণ্ঠস্বর শোনা গেল! 'আমাকেও বাঁধবেন নাকি সাহেব?'

চমকে চাইল ওরা দু'জন। দরজার দুই চৌকাঠে দুই হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে বিশালদেহী ও.সি. জালাল শিকদার। মুখে আকর্ণ বিস্তৃত হাসি। 'ওদের বসিয়ে রেখে ফাঁকি দিয়ে চলে এলাম। রুস্তমের বিবেক-বুদ্ধির ওপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে। তবু ভাবলাম, ছেলে মানুষ, যদি ভুল করে ধরে নিয়ে যায় আপনাকে! নাহ্, ছেলেটার মাথায় বুদ্ধি আছে।' গোঁফে তা দিল দারোগা।

কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রুস্তম আলী। রানা হাসল। 'সেক্ষেত্রে বাঁধাবাঁধির কোন প্রয়োজনই নেই। আমি এক্ষুণি আপনাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম। আপনার সাহায্য আমার দরকার।'

'বলুন, কি সাহায্য করতে পারি। একবার তো আপনাকে বেইজ্জতির মধ্যে ফেলে ভণ্ডুল করে দিয়েছি সব কুমকুম হকের সাথে ডাক্তারকে জড়াতে গিয়ে। আমার সাহায্য নিলে আবার গোলমাল না হয়ে যায়?'

'না। এবার আর গোলমাল হবে না। আপনারা একটু বসুন, আমি গোটা দুই টেলিফোন সেরে নিই।'

সোহানাকে ফোন করল রানা। জেগেই ছিল সে। কথাবার্তা শেষ করে ডায়াল করল জামানের নাম্বারে। বার দশেক রিং হবার পর ঘুম জড়িত কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'রং নাম্বার ভাই। ডায়ালের উপর চোখ রেখে ঠাণ্ডা মাথায় আবার রিং করো বাবা।'

'জামান, আমি মাসুদ রানা।'

'জ্বালাতন! তোমার কি ইন্সোমনিয়া আছে? নাকি মাথা খারাপ? সকাল আটটা বাজতে এখন তো অনেক দেরি!' বিস্মিত কণ্ঠস্বর পাইলটের।

'চাঞ্চল্যকর ঘটনার জন্যে আক্ষেপ করছিলে সেদিন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটতে চলেছে একটা ঘটনা। ইচ্ছে করলে আসতে পারো।'

'ইচ্ছে নেই। না ঘুমোতে পারলে কাল উঠতেই পারব না সকাল সকাল।'

'ওঠার দরকার হবে না। তিরমিজ দ্বীপে যাচ্ছি না আর। যেটা খুঁজছিলাম এতদিন হন্যে হয়ে, সেটা এই ঢাকাতেই আছে। এক্ষুণি যাচ্ছি আমি সেই প্রমাণ উদ্ধার করতে। আসছ তুমি?'

'কোন ইন্টারেস্টিং ঘটনা না ঘটলে কিন্তু তোমার মাথাটা ফাটিয়ে ঘটনা তৈরি করব আমি বলে দিচ্ছি। তখন আমার দোষ দিতে পারবে না। এত রাতে ঘুম থেকে তুলে...'

'প্রমিজ। ঘটনা ঘটবে। একটা কবর খুঁড়ব আমরা দু'জন।'

এগারো

রাত পৌনে একটা।

ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে শহরের বুকে। সারাদিনের প্রচণ্ড উত্তাপ উড়িয়ে নিয়ে গেছে এই হাওয়া। গভীর ঘুমে মগ্ন সারা শহর শীতল প্রশান্তির নরম স্পর্শ পেয়ে। রাস্তায় লোক নেই। আকাশে ছিটে ফোঁটা হালকা মেঘ ভেসে চলেছে উত্তর পশ্চিমে। কৃষ্ণপক্ষের আধখানা চাঁদ উঠেছে পুবের আকাশে।

নিউ সার্কুলার রোডের একটি মোড়ে থামল একখানা পুলিস-জীপ। ড্রাইভিং সীট থেকে রাস্তায় নামল রানা। এদিক ওদিক চাইল।

'ঘাবড়েই দিয়েছিলে একেবারে!' একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল জামান। 'পুলিসের জীপ দেখে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে গিয়েছিল।'

'জলদি উঠে পড়ো জামান। ব্যাপার সিরিয়াস। আমার এতক্ষণে গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ার কথা।'

উঠে পড়ল জামান পাশের সীটে। গাড়ি ছেড়ে দিল রানা।

'ব্যাপার কি বলো তো? কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'নারিন্দা গোরস্থানে।'

'আমাকে সাথে নেবার কারণ?'

'দুটো কারণ আছে। প্রথম কারণ, মারধোর খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছি আমি, কবর খোঁড়ার জন্যে একজন শক্তিশালী কর্মঠ সহকারী দরকার আমার। দ্বিতীয় কারণ, যখন কফিনটা খুলব তখন একজন স্বাক্ষী থাকা দরকার। একজন শক্তিশালী নির্বোধ লোক দরকার ছিল আমার—তোমার কথাই মনে পড়ল প্রথম।'

'কবর খুঁড়ে কফিন বের করে কি পাবে আশা করছ তুমি?'

'যা খুঁজছি।'

'আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়েছি তো!'

'এখন আর পিছু হটবার উপায় নেই।'

গোরস্থানের গেট থেকে বেশ কিছুটা দূরে গাড়ি রাখল রানা। গাড়ির পিছন থেকে একটা কোদাল বের করে দিল জামানের হাতে। টর্চ নিল একটা। তারপর গেটের তালাটা পরীক্ষা করল। সাধারণ তালা। আধমিনিট খোঁচাখুঁচি করতেই খুলে গেল। ক্যাঁ···চ্ করে শব্দ হলো গেটটা ঠেলা দিতেই। গা-টা ছম ছম করে ওঠে এত রাতে এরকম শব্দ শুনলে। ভিতরে ঢুকে পড়ল ওরা।

গেটটা আবার বন্ধ করে রেখে রওনা হলো ওরা। সারি সারি বাঁধানো কবর। ক্রুশ। লম্বা লম্বা ঘাস। মাঝে মাঝে যীশুর ক্রুশবিদ্ধ পাথরের মূর্তি। এক আধটা

শুকনো ফোয়ারা। হাজার হাজার কফিনের ভিতর হাজার হাজার নরকঙ্কাল চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। পাথরে খোদাই করা নাম ধাম পরিচয়। সব অর্থহীন মনে হলো রানার কাছে।

প্রায় তিনশো গজ গিয়ে শেষ হয়ে গেল মানুষের কবর। খানিকটা ফাঁকা জায়গার পর একটা তার কাঁটার বেড়া। ছোট্ট একটা গেট। ওপাশে পেট-সেমিট্রি। সাহেবদের কাছে কুকুর বিড়ালের কদর ছিল কালা আদমির চেয়ে অনেক বেশি। ছোট ছোট অসংখ্য বাঁধানো কবর। এগিয়ে চলল ওরা। বেশ কিছুদূর এগিয়ে টর্চ ফেলল রানা খোদাই করা পাথরের গায়ে। ১৯৩৬ সাল। আরও এগোতে হবে। এগিয়ে গেল ওরা আরও পঞ্চাশ গজ।

পাওয়া গেল। নতুন কবর। কয়েকটা শুকনো ফুল পড়ে আছে। মার্বেল পাথরের গায়ে শুধু নাম আর মৃত্যুর তারিখ লেখা। একটা সজনে গাছের নিচে কবরটা। আশে পাশে ঘন ঝোপ ঝাড়।

'বসে পড়ো।' বলল রানা। 'আমি কিছুক্ষণ কুপিয়ে নিই, তারপর তোমার শিফট।'

'উহুঁ। বসব না। দুই পায়ে খাড়া থাকতে চাই আমি। যদি ওপাশ থেকে একটা কঙ্কাল উঠে আসে, মুহূর্তে যেন পাঁই পাঁই ছুটতে পারি।'

কথাটা বলার সাথে বিকট একটা কান্নার আওয়াজ এল, ওঁয়া ওঁয়া! থমকে গেল ওরা একমুহূর্তের জন্যে, তারপর হেসে উঠল দু'জন একসাথে। বট গাছের মাথায় শকুনের বাচ্চা কাঁদছে।

মাটি খুঁড়তে শুরু করল রানা। ফসকা মাটি। সহজেই উঠে আসছে। পনেরো মিনিটের মধ্যেই ফুট দুয়েক খুঁড়ে ফেলল সে, তারপর কোদালটা দিল জামানের হাতে; 'নাও। শুরু করো।'

টুকরো টুকরো কথাবার্তা চলছে ওদের মধ্যে। বেশির ভাগ জামানই বলছে। বিশ মিনিটেই প্রায় বুক পর্যন্ত খুঁড়ে ফেলেছে সে। বলল, 'শালারা কয় হাত নিচে মাটি দিয়েছে আল্লাহ জানে।'

'তুমি একটু বিশ্রাম নাও। বাকিটা আমি খুঁড়ছি।' বলল রানা।

'এই-য়া! কি যেন ঠেকল কোদালের মুখে। টর্চটা জ্বালো দেখি?'

বেরিয়ে এল কফিনটা। আশ পাশ থেকে কিছুটা মাটি সরিয়ে হ্যান্ডেলটা ধরে টেনে তুলল ওটাকে জামান। কোদাল দিয়ে বার দুই টোকা দিল ঢাকনির উপর। 'খুলে যদি দেখা যায় কিচ্ছু নেই? নাও ধরো।'

দু'জন মিলে ধরে তুলে রাখল ওরা কফিনটা গর্তের পাশে। হাঁপাচ্ছে জামান। বলল, 'কবর চুরির কাজটা বড় খাটনির কাজ। বেতনটা বেশি না হলে কবে ছেড়ে দিতাম!'

'সরো, দেখি। খুলে ফেলি ডালাটা।'

ডালটা খুলতেই ভক্ করে বিচ্ছিরি একটা গন্ধ এল নাকে। চাঁদের আলো

পড়েছে অর্ধগলিত টমের মৃতদেহে। টর্চ জ্বেলে দেখল রানা টমের সারা শরীরে বিজ বিজ করছে দেড় ইঞ্চি লম্বা পোকা।

'ছ্যাঃ! গন্ধে টেকা যাচ্ছে না! কি ব্যাপার রানা? কি করতে চাও এখন মরা কুকুর নিয়ে?'

'কিচ্ছু না।'

'মাথাটা খারাপ নাকি তোমার? কুকুরটা মৃত—এছাড়া আর কি প্রমাণ হলো কবর খুঁড়ে?'

'প্রমাণ হলো যে ও একটা চোর ছিল।' সারা কফিন জুড়ে টমের খেলনা। নানান ধরনের। একটা রবারের ইঁদুর, একটা লোম উঠে যাওয়া টেনিস বল, একটা কালো গ্লোভ, এক পাটি স্যান্ডেল, ···আরও কত কি। একটা বড় সড় খেলনা ঘেঁটে বের করল রানা। তারপর কফিনের ডালাটা নামিয়ে বলল, 'এই হচ্ছে চোরাই মাল।'

'এটা একটা খেলনা পিস্তল। কি প্রমাণ হলো তাতে?'

'এটাই ডক্টর রুহুল আমীনের সেই পিস্তল। এটা পাওয়া যায়নি বলেই মাহবুবের এই দুর্দশা।'

'তুমি বলতে চাও এই পিস্তলটার জন্যেই মারা গেছিল ডাক্তার? সামান্য একটা খেলনা···'

'সামান্য নয়। সামান্য বললে ভুল হবে।' পিস্তলের মুখ থেকে এঁটে লাগানো একটা কর্ক খুলে ফেলল রানা। সাবধানে পিস্তলের মুখটা ডান হাতের তালুতে ঠেকিয়ে যেন কিছু ঢালছে এমনি ভাবে বাম হাতটা উপরে তুলল। 'দেখো। নয়ন সার্থক করে নাও।' চিনির মত দেখতে অসংখ্য সাদা দানা ঝরে পড়ল রানার হাতের তালুতে। একটা দানা জিভে ঠেকিয়ে পরীক্ষা করল রানা।

'চিনি মনে হচ্ছে?'

'এর আদি ও অকৃত্রিম নাম হেরোইন। এই জিনিসটুকুর দাম বিশ লক্ষ টাকা।'

বারো

'হেরোইন!' তাজ্জব হয়ে গেল জামান। 'নেশা করত তাহলে ডাক্তার?'

'না নেশার জোগান দিত। নেশার চেয়েও ভয়ঙ্কর কাজ। সব রহস্যের সমাধান পাওয়া যাচ্ছে এখন। জুয়াড়ী মানুষ, সর্বস্ব খোয়াল জুয়ার টেবিলে, একটা বছর কষ্ট করল খুব, হঠাৎ কপাল ফিরে গেল তার তিন বছর আগে। ডাক্তার হিসেবে পসার নেই, কিন্তু টাকা আসছে বাঁধ ভাঙা বন্যার পানির মত। আলাউদ্দিনের চেরাগ পেয়ে গিয়েছিল যেন লোকটা।'

প্রমাণ কই?

'খুব বড় লোকের ছেলে ছিল শুনেছিল্যম?'

'ছিল। কিন্তু দশ বছর ধরে জুয়ার টেবিলে হেরে সব শেষ করেছে। হঠাৎ টাকা কোথায় পেল? খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি একেকজনের ধারণা একেক রকম। কেউ মনে করে দারুণ পসার ডাক্তারের, কেউ মনে করে শেয়ার মার্কেটে কপাল ফিরছে, কেউ মনে করে জুয়ার টেবিলে টাকা করেছে, কেউ মনে করে বাপের টাকায় এত টাকা। আসল কথাটা জেড এ্যান্ড জেড ছাড়া কেউ জানে না। কিন্তু তারা বলবে না আমাকে কিছুতেই।'

'আসল ব্যাপার টের পাওয়া গেল এতক্ষণে?' পিস্তলটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল জামান।

'আমি জানতাম তিরমিজ দ্বীপের সাথে নিশ্চয়ই কোন সম্পর্ক আছে। কিন্তু কি সম্পর্ক সেটা বুঝতে পারিনি। সেটা বুঝলাম আজ ডাক্তারের চেম্বারটা তছনছ হওয়ায়। চেম্বারের খেলনাগুলো ভাঙা হলো কেন ভাবতে গিয়েই বুঝে ফেললাম ব্যাপারটা।'

'ডক্টর রুহুল আমীনের মত একজন লোককে হেরোইন চোরাচালানী দলের নেতা হিসেবে ভাবা যায় না।'

'সে নেতা ছিল না। নারকোটিক ট্রাফিক বিরাট ব্যাপার। দলপতির বাস আমেরিকার লাস ভেগাসে। ওদের নেটওয়ার্ক আছে এখানে। তারাই বড়শিতে গেঁথেছিল ডাক্তারকে। ডাক্তারও দেখল ভাঙাচোরা আর্থিক অবস্থাটা অক্লেশে জোড়াতালি লাগাতে হলে এবং ধার শোধ করতে হলে এটা উত্তম পন্থা। কেউ সন্দেহ করবে না।'

'কিন্তু অ্যামেচারের উপর এতটা দায়িত্ব দিল ওরা? শুনেছিলাম…'

'সাধারণত দেয় না। কিন্তু দিতে বাধ্য হয়েছিল। তৎকালীন পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চোখ ছিল ওদের উপর। একজন এজেন্ট বেশ কিছু দূর এগিয়েও গিয়েছিল। ভয় পেয়ে সমস্ত অপারেশন বন্ধ করে দিতে হয়েছিল ওদের ছয় মাস। প্রায় আড়াই কোটি টাকার ব্যাপার। কাজেই ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছিল ওরা। ওদেরই অনলস প্রচেষ্টায় মানবতার সেবক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ডাক্তার। কারও সন্দেহ করার কিছুই নেই। জংলীদের ভালবাসার দান গ্রহণ করত ডাক্তার। বেশির ভাগই আজেবাজে পুতুল ও খেলনা। কিন্তু প্রতিবারই এক আধটা খেলনা থাকত ওগুলোর মধ্যে যার দাম কমপক্ষে বিশ লক্ষ টাকা। বার্মা থেকে ঢুকে এই পথে চলে যেত হেরোইন গন্তব্যস্থলে।'

'বি…শ লাখ! তার মানে মাসে চল্লিশ লাখ! বছরে?'

'প্রায় পাঁচ কোটি। ডাক্তারের কমিশন যদি দুই পারসেন্টও ধরা যায় তাহলে দাঁড়ায় বছরে দশ লাখ।'

'ইশ্শ্! আমার মাথায় যে কেন এই বুদ্ধি এল না!' আক্ষেপ করল জামান।

'তোমার আমার কর্ম নয় ওটা। এজন্যে ডক্টর রুহুল আমীন, এম.বি.বি.এস,

এম.আর.সি.পি. দরকার। ওই রকম সামাজিক প্রতিষ্ঠা দরকার।' হাসল রানা।

'হেরোইন আসার পর ওটা পাচার করতে হলেও সন্দেহের উর্ধ্বের কোন লোক দরকার। ঘড়ির কাঁটার মত নিয়ম বেঁধে চললেও যাকে সন্দেহ করা যায় না।'

'হ্যাঁ। ঢাকায় নিয়ে এল বুঝলাম! কিন্তু আমেরিকা পর্যন্ত পৌছত কি ভাবে?'

'হাতে হাতে। প্রত্যেক মাসের প্রথম ও তৃতীয় সোমবার জিনিসটা ঢাকায় এনে পৌছে দিয়েই ডাক্তারের কাজ শেষ।'

'তুমি বলতে চাও জেড এ্যান্ড জেড এর সাথে জড়িত? সেখানে ডেলিভারি দিত ডাক্তার হেরোইন?'

'জেড এ্যান্ড জেড যে জড়িত তাতে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু মালটা সেখানে ডেলিভারি দিত না ডাক্তার। পারতপক্ষে জেড এ্যান্ড জেডের কাছে ভিড়ত না সে।'

'তাহলে?'

'সোমবার জিনিসটা নিয়ে এসে মঙ্গলবার তুলে দিত সে কারও হাতে। ঘড়ির কাঁটার মত নির্ভুল শিডিউল। মঙ্গলবার কোথায় যেত ডাক্তার নিয়মিত? মিসেস জোনসকে দেখতে, তেরো নম্বর নিউ সার্কুলার রোডে।'

'মিসেস জোনস! অসম্ভব! আমাকে কেটে ফেললেও এ আমি বিশ্বাস করতে পারব না।' মাথা নাড়ল জামান।

'মিসেস জোনস হচ্ছে ছুতো। ডক্টর রুহুল আমীনই তাকে ওই বাড়িতে নিয়ে উঠিয়েছিল। এ কাজের একটা অসুবিধা, নিয়ম বাঁধা পুনরাবৃত্তি। এর ফলে মানুষের সন্দেহের উদ্রেক হয়। মানুষ জানতে চায়, ব্যাপার কি, এই লোকটা নিয়মিত এখানে আসছে কেন? তাই মিসেস জোনসের প্রয়োজন ছিল। আসল কাজটা সারা হত মিসেস জোনসের অলক্ষ্যে, ঢুকবার বা বেরোবার সময়। বারো, তেরো বা চোদ্দ নম্বর ফ্ল্যাট বাড়ির কোন একজন ভাড়াটে ঠিক সময় মত উপস্থিত থাকত। তার হাতে দিত ডাক্তার হেরোইন ভরা খেলনা।' হাসল রানা। 'আমার সহকারী যে সুন্দরী মেয়েটা দেখেছিলে, সোহানা চৌধুরী, একেবারে গর্দভ। মাথা ভর্তি গোবর। দারোগা জালাল শিকদার হচ্ছে আরেকটা। ডাক্তারকে কুমকুম হকের সাথে জড়িয়ে চুনকালি মেখেছে আমার মুখে। কিন্তু একটা ব্যাপার ঠিকই ধরেছিল ওরা। মিসেস জোনসকে ক্যামোফ্লেজ হিসেবে ব্যবহার করে অন্য কিছু করত ডাক্তার। ব্যাপারটা অনেক আগেই বুঝেছি আমি।'

'মনে হচ্ছে আরেকটা ভুল করতে যাচ্ছ।' বলল জামান চিন্তিত মুখে। 'বারো, তেরো বা চোদ্দ নম্বর ফ্ল্যাট বাড়িতে যদি ডাক্তারের কাছ থেকে হেরোইন বুঝে নেবার লোক বাস করবে তাহলে সাব-ইন্সপেক্টর যখন গুলি করল তখনও মালটা ডেলিভারি দেয়া হয়নি কেন?'

'সহজ উত্তর। জিনিসটা যার বুঝে নেয়ার কথা ছিল, সেই লোকটা বাড়ি ছিল

না। মিসেস জোনসের ওখানে বহুক্ষণ অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছিল ডাক্তার হেরোইন সহ।'

'লেটার বক্সে রেখে গেলেই পারত?'

'বিশ লাখ টাকার জিনিস কেউ লেটার বক্সে রেখে চলে যেতে পারে না। হাতে হাতে পার করতে হবে জিনিসটা। কাজেই শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে বেরিয়ে পড়ল ডাক্তার। মনে ভয়, কিছু গোলমাল হয়ে যায়নি তো! যেই গাড়ির কাছাকাছি গেছে, ওমনি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে পুলিসের লোক। দিশে হারিয়ে দৌড় দিয়েছে ডাক্তার। পুকুরের পাড়ে এসেই ফেলে দেয়ার চেষ্টা করেছে সে খেলনাটা। খেলনাটার আকৃতি নিশ্চয়ই ভুলে গিয়েছিল ডাক্তার, কিংবা আশা করেছিল সে যখন ওটাকে খেলনা বলে জানে, তাড়া করে আসা পুলিসটাও ওটাকে খেলনাই মনে করবে। ওটা বের করতে দেখেই যে মাহবুব গুলি করবে তা ভাবতেও পারেনি বেচারা। ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে যদি দৌড় না দিত, যদি সরাসরি মাহবুবকে জিজ্ঞেস করত, কি ব্যাপার? তাহলে ক্ষমা প্রার্থনা করে ছেড়ে দিত ওকে মাহবুব, কল্পনাও করতে পারত না যে বিশ লক্ষ টাকার হেরোইন আছে ডাক্তারের কাছে। ভয় পেয়েই গুলি খেল বেচারা।'

'পিস্তলটা পাওয়া যায়নি কেন?'

'রুস্তম আলী আর মাহবুব যখন ডাক্তারকে পানি থেকে তুলতে ব্যস্ত সেই সময় টম ওটাকে খুঁজে পায়। ডাক্তারের গন্ধ পায় ও পিস্তলটায়। ওর জন্যে মাঝে মাঝেই কিছু না কিছু খেলনা আনত ডাক্তার, সেদিন বিদায়ের সময় দেখা হয়নি ওর ডাক্তারের সাথে, ও মনে করেছে আসলে ওটা ওরই জন্যে আনা খেলনা। মধ্যে পিস্তলটা খোঁজেনি কেউ। সহজ কারণ। টমের খেলনাগুলোর মধ্যে পিস্তল খুঁজেছে সবাই। খেলনা পিস্তলের সম্ভাব্যতা আমার মাথায় এল এই কিছুক্ষণ আগে, যখন জানতে পারলাম যে ডাক্তারের চেম্বারটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে কে যেন, পুতুলগুলো টুকরো টুকরো করেছে ভেঙে। শত্রু ও মিত্র দুই পক্ষই খুঁজছে একটা জিনিস, কিন্তু পাচ্ছে না। কোন্ জিনিসটা পাওয়া যাচ্ছে না? পিস্তল। ওটা কি খেলনা পিস্তল? সহজেই বুঝতে পারলাম, পিস্তলটা যদি খেলনা হয়ে থাকে, কোথায় পাওয়া যাবে ওটা।'

'ডাক্তারের চেম্বারে এই হেরোইনই খুঁজেছিল কেউ?'

'নিশ্চয়ই। নার্সটা হঠাৎ এসে পড়ায় তাকে ছুরি মেরেছে নির্মম ভাবে। কিন্তু এত করেও আসল জিনিস পায়নি সে। এদিকে হন্যে উঠেছে মাসুদ রানা। তিরমিজ দ্বীপ পর্যন্ত যেতে চাইছে। কাজেই ঠেকাও ওকে। ফাঁসিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হলো আমাকে, পুলিস যাতে গ্রেপ্তারে গাফিলতি না করে সেজন্যে সংবাদপত্রের রিপোর্টার ডাকা হলো। ওরা আশা করেছিল, আমাকে কয়েকদিন আটকে দিতে পারলেই মালটা উদ্ধার করে আপাতত কিছুদিনের জন্যে ঘাপটি মেরে থাকা যাবে।'

'অর্থাৎ এই খেলনাটা আবিষ্কার করে তুমি মাহবুবকে রক্ষা তো করলেই

নিজেও বাঁচলে। তোমার কাজ শেষ।'

'উঁহুঁ। ওই লোকটা রয়ে গেছে। ডাক্তার যার হাতে হেরোইন তুলে দিত।'

'ওকে ধরা মুশকিল হবে। ধরে নিলাম লোকটা ওই বাড়ি তিনটের যে কোন একটায় থাকে। কিন্তু ওখানে তো বহু লোকই থাকে।'

'থাকে। কিন্তু সন্দেহের বৃত্তটা ছোট করে আনতে পারি আমরা সহজেই। সহজেই ধরে নেয়া যায় যে লোকটা মিসেস জোন্স যে বাড়িটায় থাকে, অর্থাৎ তেরো নম্বর ফ্ল্যাট বাড়ি, সেখানেই থাকে।'

হালকা করে শিস দিল জামান। 'মিসেস জোন্সকে সন্দেহের বাইরে রাখা যায়, কুমকুম হকও তাই। তাহলে বাকি থাকে আরও সাতটি পরিবার। এ ছাড়াও আছে...'

'মতলব আলী। জেড এ্যান্ড জেডের নিয়োজিত ম্যানেজার।'

'ঠিক বলেছ। যদ্দূর মনে হচ্ছে ঠিক পথেই এগোচ্ছ তুমি। লোকটার চালচলন কেমন যেন সন্দেহজনক। বরাবরই দেখতে পারি না আমি ওকে।'

'দুঃখের বিষয় ওকেও সন্দেহের বাইরে রাখতে হচ্ছে।' বলল রানা। 'ডেলিভারি নেয়ার লোকটা অনুপস্থিত ছিল বলেই হেরোইন নিয়ে ফেরত যাচ্ছিল ডাক্তার। মতলব আলী সেই রাতে বাসায় ছিল। তেরো নম্বর ফ্ল্যাট বাড়ির প্রত্যেকটি বাসিন্দা বাসায় ছিল, কেবল তুমি ছাড়া। একমাত্র তুমিই সে রাতে বাসায় ছিলে না, জামান।'

তেরো

খলখল করে হেসে উঠল জামান।

'বুঝতে পারছিলাম, বেহুদা গল্প শোনাচ্ছ না তুমি আমাকে। একটা কিছু উদ্দেশ্য আছে তোমার। ঠিকই বলেছ, ঝড় বৃষ্টির জন্যে দমদম এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করতে বাধ্য হয়েছিলাম আমি সেদিন। কিন্তু তাতে কি প্রমাণ হয়? ফাঁদ পেতেছিলে, তোমার ধারণা ফাঁদে পড়ে গেছি আমি। কি করতে হবে এখন আমাকে? হাতে পায়ে ধরে কান্নাকাটি করব?'

'হাতে পায়ে ধরার লোক তুমি নও জামান। তুমি একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অতি-বিলাসী, স্বল্পবুদ্ধি ভয়ঙ্কর জানোয়ার।'

'পৃথিবীতে কোন্ লোকটা সবদিক থেকে ভাল?'

'কিন্তু তুমি যে সবদিক থেকেই খারাপ।'

'দুঃখের বিষয়, এর কোন প্রমাণ নেই।' একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জামান। 'কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না তুমি। আমি সে রাতে বাড়ি ছিলাম না, তাতেই প্রমাণ হয়ে

গেল যে আমি হেরোইন ডেলিভারি নেয়ার সেই লোক?'

'তোমার সাথে তর্ক করতে চাই না আমি, জামান। কিন্তু পাইলট হিসেবে তোমার পক্ষে যে জিনিসটা ডাক্তারের কাছ থেকে নিয়ে লন্ডনে উপযুক্ত লোকের হাতে তুলে দেয়া কতটা সহজ সেটুকু বোঝার ক্ষমতা আমার আছে। আজকে আমার বাসায় গিয়ে বাথরুমের বল্টু খুলে রেখে এসেছিলে তুমিই। তুমিই আমার ব্র্যান্ডির বোতলে বারবিচুরেটের গুঁড়ো মিশিয়ে দিয়ে এসেছিলে। তুমিই ফোন করে ইঙ্গিত দিয়েছিলে আমাকে, তুমি হুইস্কি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বে, যেন আমিও কিছু একটা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। তুমিই পাঠিয়েছিলে আমাকে খুন করার জন্যে চারজন মৃত্যু দূত।'

'তার মানে আমি শুধু হেরোইন ক্যারিয়ারই নই, তোমার কল্পিত দস্যুদলের নেতা গোছেরও কিছু?'

'খসরুজ্জামান চৌধুরী তোমার বড় ভাই, একথা অস্বীকার করতে পারবে তুমি কামরুজ্জামান চৌধুরী? তোমাদের দুই ভাইয়ের কোম্পানী হচ্ছে জামান এ্যান্ড জামান অর্থাৎ জেড় এ্যান্ড জেড—অস্বীকার করতে পারবে একথা?'

চুপ করে থাকল জামান কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'এতেও কিছুই প্রমাণ হয় না, গোয়েন্দা সাহেব। তোমার ভাবটা হচ্ছে, একটা দিয়াশলাই পেলে আরাম করে একটা সিগারেট খাওয়া যেত—যদি সিগারেট থাকত। সবটা মিলে মস্ত বড় একটা লাড্ডু।'

'ডাক্তারের চেম্বারে দরজার নবে আমার ছাড়াও আরেকটা অপরিচিত আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। আমার বিশ্বাস তোমার ছাপের সাথে মিলে যাবে সেটা। কি করতে গিয়েছিলে তুমি ওখানে, পাইলট?'

বেশ অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল জামান। তারপর হেসে উঠল অপ্রকৃতিস্থের মত। 'পাক্কা হারামী লোক তুমি মাসুদ রানা। আমি দাদাকে সাবধান করেছিলাম, ভয়ানক ধূর্ত ওই টিকটিকিটা, কিছু আঁচ করার আগেই শেষ করে দাও। নাহ, তিনি মনে করলেন তার চাইতে চতুর লোক থাকতেই পারে না দুনিয়ায়। তিনি কায়দা দেখাতে গেলেন।'

'আমি বুঝতে পারি আমাকে কেন খুন করতে চাও তোমরা। কিন্তু অলোকা? ওকে খুন করতে গেল কেন, জামান?'

'দোষ তোমার। তুমি ছয়টার সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছ তা জানব কি করে আমি? একটা মিথ্যা ইন্টারভিউয়ে ডেকে পাঠিয়ে আমি নিশ্চিন্ত মনে হেরোইনের কনসাইনমেন্টটা খুঁজছি। ওটা খোয়াতে রাজী ছিলাম আমরা, কিন্তু যেভাবে পিছু লেগে গেছ তুমি, তোমার হাতে পড়লে অসুবিধা আছে, তাই খুঁজছি। এমন সময় এসে ঢুকল মেয়েটা চেম্বারে। উপায় ছিল না। দোষটা তোমার।'

'আমি যতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম ততক্ষণ তুমি ভিতরেই ছিলে?'

'হ্যাঁ। মহা মুশকিলে পড়ে গিয়েছিলাম। জীবনে এমন ফাঁদে পড়িনি কোনদিন।'

'ভুল। এই মুহূর্তে তুমি সবচেয়ে বড় ফাঁদে পড়ে আছ।'

'সেটা নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গির উপর। অনেক দেরি করে ফেলেছ তুমি। আগেই বোঝা উচিত ছিল তোমার কাকে ডেকে আনছ এই গোরস্থানে কবর খুঁড়তে। আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি।'

'তুমি ভাবছ, বন্ধু ভেবে তোমাকে এখানে ডেকে এনে পিস্তলটা পাওয়ার পর আমি ভেবে বের করেছি যে তুমিই দোষী? ভুল, সবই ভুল। অনেক আগেই আমি জানি যে তুমিই সেই লোক। প্রমাণ ছিল না হাতে। পিস্তলটা খুঁজে না পেলে তোমার বিরুদ্ধে কিছুই হাজির করতে পারতাম না কোর্টে। তাছাড়া তোমাকে জ্যান্ত ধরতে চেয়েছিলাম আমি। তারজন্যে এরকম একটা নিরিবিলি ফাঁকা পরিবেশ দরকার ছিল।'

'তোমার ইচ্ছে পূরণ করতে পারছি না বলে আমি দুঃখিত। মানুষের বাঁচার তাগিদ বড় প্রবল।' এক লাফে উঠে দাঁড়াল জামান। চাঁদের আলোয় চকচক করে উঠল একটা পিস্তল। 'বেশি বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে একটা ব্যাপার ভুলেই গিয়েছ তুমি মাসুদ রানা। তোমাকে হত্যা করার সব প্রচেষ্টা বিফল করে দিয়ে তুমি যখন কবর খোঁড়ার প্রস্তাব দিয়েছ, আমি এসেছি। এবং প্রস্তুত হয়েই এসেছি।'

'পিস্তল দেখিয়ে বাঁচতে পারবে না তুমি জামান।'

'শুধু দেখাবার জন্যে আনিনি এটাকে। ব্যবহার করব। কেউ টের পাবে না। কবর খোঁড়াই আছে। কুকুরের সাথে তুমিও ঘুমিয়ে থাকবে ওর ভিতর। প্রতিদিন ফুল দিয়ে যাবে মিসেস জোনস।'

'দেখো জামান, তোমাকে জ্যান্ত ধরতে চাই আমি। কিন্তু যদি তোমার বোকামিতে এখানে আজ কেউ মারা যায়, সেই ব্যক্তি হবে তুমি।'

'তোমার হাতের ওই খেলনা পিস্তলটা দিয়ে মারবে বুঝি?'

'না।'

'আমি জানি তুমি নিরস্ত্র।'

'হ্যাঁ, আমি নিরস্ত্র, কিন্তু আমার সঙ্গীরা কেউ নিরস্ত্র নয়। চেয়ে দেখো, তোমার ঠিক পাঁচ হাত পিছনে দাঁড়িয়ে আছে নির্বোধ সুন্দরী সোহানা চৌধুরী। তোমার ডান দিকের ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে দারোগা জালাল শিকদার ও দুইজন সেপাই। তোমার বাম দিকের ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে সাব-ইন্সপেক্টর রুস্তম আলী ও দুইজন সেপাই। সবাই সশস্ত্র। পিস্তলটা আর এক ইঞ্চি উঁচু করলেই গুলি খাবে তুমি জামান।'

থমকে গেল জামান। ঝট করে পিছন দিকে দেখল সোহানাকে। ডান দিকে ফিরল, সত্যিই ছয় হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন। বাম দিকে ফিরল, সেখানেও তিনজন।

হঠাৎ পিস্তল তুলল জামান। 'তোকে শেষ করে তারপর মরব আমি শুয়োরের বাচ্চা।'

ঠা-ঠা-ঠা ঠা-ঠা-ঠা-ঠা-ঠা! গোরস্থানের নিঝুম নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল। কফিনের মধ্যে চমকে উঠল বুঝি নরকঙ্কালগুলো। গর্জে উঠেছে রুস্তমের চায়নিজ স্টেন। ব্রাশ করেছে সে নিচে থেকে উপরে। একটা গুলি লাগল জামানের কব্জিতে। ছিটকে পড়ে গেল পিস্তল। ঝাঁপিয়ে পড়ল জামান রানার উপর খালি হাতেই, ক্ষুধার্ত বাঘের মত।

প্রস্তুত ছিল রানা। মাথাটা সরিয়ে নিতেই ঘুসিটা পড়ল কাঁধের উপর। রানার ঘুসি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না। নাকমুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল জামানের, কিন্তু কিছু পরোয়া করছে না সে। শুয়ে পড়ল দু'জন মাটিতে। দুই হাতের কুনুই দিয়ে মেরে চলেছে জামান পাগলের মত। এগিয়ে এল সবাই, কিন্তু কি করবে বুঝতে পারছে না। মাটিতে হুটোপটি করছে দু'জন, একবার এ উপরে উঠছে, একবার ও। হঠাৎ শূন্যে উঠে গেল জামানের দেহটা। বুকের কাছে দুই পা বাধিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছে ওকে রানা। সোহানার মাথার তিন ফুট উপর দিয়ে বিশাল একটা বাদুড়ের মত উড়ে গেল জামানের দেহটা। ধপাস করে শব্দ হলো, যেন অনেক দূর থেকে। কেঁপে উঠল মাটি। কবরের ভিতর পড়েছে দেহটা।

সবাই এসে দাঁড়াল কবরের পাশে। নিশ্চিন্তে জ্ঞান হারিয়েছে পাইলট।

'ওয়েল ডান।' বলল জালাল শিকদার। সেপাইদের উদ্দেশে বলল, 'গাড়িতে তুলে ফেলো এটাকে। হ্যান্ডকাফ পরিয়ে রাখবে।' রানার হাত ধরল, 'আপনাকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা আমার নেই। আপনার সাহায্যের কথা ভুলব না আমি কোনদিন।'

'এই নিন আপনার সেই হারানো পিস্তল। সমস্ত কথাই নিজের কানে শুনেছেন, কাজেই ব্যাখ্যা করার কিছুই নেই। এখন আপনার কর্তব্য সারতে হবে আপনাকে দ্রুত। দেরি হয়ে গেলে বিগ ব্রাদার খসরুজ্জামানকে আর পাবেন না। রওনা হয়ে যান জলদি।'

গোরস্থানের সরু কাঁকর বিছানো রাস্তা দিয়ে চলল ওরা সারি বেঁধে।

একটু পিছিয়ে পড়ল রানা ও সোহানা।

'ক্লান্তি লাগছে বড়।' একটা হাত রাখল রানা সোহানার কাঁধে।

'আমার ভয় লাগছে।' রানার কোমর জড়িয়ে ধরল সোহানা।

'দেয়াল টপকে একা ঢুকেছিলে না তুমি গোরস্থানে?'

'হ্যাঁ।'

'এখন ভয় লাগছে কেন?'

'ভাবছি, কাজ ফুরোল। আবার হারিয়ে যাবে তুমি। এ কটা দিন বেশ কাটল একসাথে। তাই না?'

—————